ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মাতৃস্মৃতি

মুখবন্ধ

দু'বছর আগে আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধু শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মশায় বাংলা বারমাস্যা গীতের একটি সংগ্রহ আমার সামনে রেখে বললেন, বাংলা সাহিত্যে বারমাস্যা গীত নিয়ে উনি কিছু আলোচনা করতে চান। শিবপ্রসাদবাবু বহুদিন গবেষণা কার্যে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত; ওঁর শক্তির উপর আমার গভীর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে, এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললুম, 'নিশ্চয়ই, এ-সম্বন্ধে কাজ করবার ক্ষেত্র প্রশস্ত, নানা দিক থেকে এ-বিষয়ে আলোচনা হ'তে পারে।' তারপর সঙ্গে সঙ্গে কাঠামো তৈরী হ'লো, পাঠপঞ্জী তৈরী হ'লো, শিবপ্রসাদবাবুর কাজ আরম্ভ হ'লো, এবং কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে এর পরিধিও বিস্তার লাভ করতে লাগলো, বাংলা সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে ভারতীয় সাহিত্যে ও ঐতিহ্যে বিস্তৃত হ'লো, সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের সীমা স্পর্শ করলো। ধীরে ধীরে রচনা রূপ নিতে আরম্ভ করলো, রচনা কার্য শেষ হ'লো, বিচারালোচনা শেষ হ'লো, এখন বই ছাপা হয়ে বেরুলো। এ-বই দু'টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফল। শিবপ্রসাদবাবু কাজটি শেষ করেছেন, তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে; এর পর যা' তাতে তাঁর অধিকার নেই।

এই বই-এর প্রতিটি পৃষ্ঠার সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, এর সম্বন্ধে কোনো মতামত দেওয়া আমার পক্ষে শোভন নয়, উচিতও নয়। সে-মতামত ও পরিচয় শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় দিয়েছেন, অন্যান্য বিদগ্ধ ও বিশেষজ্ঞ জনেরা দেবেন। আমি শুধু সবিনয়ে এই বইটির প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি ছোট, কিন্তু শিবপ্রসাদবাবুর আলোচনাটি মূল্যবান। বারমাস্যার বিষয়বস্তুটিকে তিনি যে মর্যাদা দান করেছেন, এ-মর্যাদার কিছু অংশ শিবপ্রসাদ বাবুর প্রাপ্য বলে আমি মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. ১১. ৫৯

নীহাররঞ্জন রায়

গ্রন্থাভাষ

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরের গভীর মিল, বার মাস ও ছয় ঋতুর আবর্তনের ভিতর দিয়া প্রকৃতি কেবলই রূপ বদলায়—বাহিরের সেই রূপান্তর মানুষের চিত্তেও আনে রূপান্তর। অন্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ সকল সুখদুঃখের অনুভূতিতে, প্রকৃতিকেও মানুষ তাই অনেকখানি তাহার সুখদুঃখের ভাগী করিয়া লইয়াছে।

বার মাস ও ছয় ঋতুর আবর্তনের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের যে গভীর যোগ, আমাদের সাহিত্যে নানাভাবে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। মাস-ঋতুর সঙ্গে ব্যক্তিমনের যোগ ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া সামাজিক উৎসব-আনন্দের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত মাস ও ঋতুর এই প্রভাব নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে এই প্রভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে 'বারমাসী' রূপে। ভারতবর্ষের সব আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যেই আমরা নানাভাবে এই 'বারমাসী'র সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই ইহার অভিজাতরূপ, আধুনিক আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে ইহার লোকায়ত রূপ।

অধ্যাপক ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম্. এ. ডি-ফিল্ মহাশয় এই ভারতীয় সাহিত্যের বারমাসী লইয়াই বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। প্রথম চিন্তায় বারমাসীই কি করিয়া পূর্ণাবয়ব একখানি গ্রন্থের কলেবর ধারণ করিতে পারে এ-বিষয়ে কৌতূহল ও সংশয় দেখা দিতে পারে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এই বারমাসীগুলি কতগুলি প্রথাবদ্ধ উক্তিবিন্যাস মাত্র নহে, ইহার ভিতরে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের এবং কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যের একটি পরিচয় রহিয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্যটিই গ্রন্থমধ্যে তাঁহার সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু-স্বরূপ। আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও এইক্ষেত্রে ভারতীয় কবি-মানসের যে একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় এ-বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত

-প্রাকৃত সাহিত্য হইতে যেরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তেমনই আধুনিক ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি হইতেও প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙলা-সাহিত্য তাঁহার মুখ্য অবলম্বন হইলেও হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানী প্রভৃতি সাহিত্য হইতেও তিনি প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের আলোচনা সুপ্রণালীবদ্ধ। প্রথমে তিনি ঋতু ও মাসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে ঐতিহ্যের পৃষ্ঠভূমি রহিয়াছে তাহারই ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পরে দেখিতে পাই সংগৃহীত উপাদানের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ। তাহার পরে তিনি আলোচনা করিয়াছেন এই বারমাসী-জাতীয় কাব্যাংশের ভিতর দিয়া প্রকাশিত ভারতীয় কবি-মনের পরিচয়। এই পরিচয়দান প্রসঙ্গেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন, এইগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের নারীচরিত্র। শুধু আমাদের সমাজ-জীবনের বিশেষ একটি দিকের একটি সূক্ষ্ম সুকুমার পরিচয় বহন করে বলিয়াই নয়—এগুলির প্রকাশের মধ্যে একটা সাহিত্যিক উৎকর্ষও যে লক্ষণীয়, লেখক সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে লেখক ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্য হইতে বারমাসীর একটি সঙ্কলন দিয়া গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সাহিত্যে বহু-প্রচলিত এই বারমাসী সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সকল তথ্য একসঙ্গে করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ সহ এইরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ইহার পূর্বে আর হয় নাই, সেজন্য আমরা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার উভয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা
৪।১০।৫৯

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

অনেকদিন ধরে মঙ্গল সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও পল্লীগীতি সাহিত্য প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নানা শাখার অধ্যয়ন অধ্যাপনায় রত থেকে বারমাসীগীতির বিচিত্র রূপ স্বতঃই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জাতীয় গীতির আকার ও প্রকারের আপাতঃ একটানা একঘেঁয়ে সুরের আড়ালে যে সুর বৈচিত্র্য, ভাব ও ছন্দের যে অজস্রতা ও ঐশ্বর্য আছে, বারমাসীগীতি অবলম্বনে গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনার গোড়ার কথাই তাই।

বিচিত্র গীতির অন্তঃপুরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আমার মনে হয়েছে, এগুলো আমাদের সমাজ ও সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেকখানি উপকরণ উপাদান বহন করে চলেছে। যে লোকায়ত জীবন, যে লোক-সংস্কৃতি আমাদের উন্নত ও অভিজাত সাহিত্য, সমাজ ও সভ্যতার উৎস, বারমাসীগুলো সেই জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রকৃষ্ট আধার, আমি সবিনয়ে সহৃদয় পাঠকসমাজে সেই সত্যটি নিবেদনের চেষ্টা করেছি। বাংলা তথা ভারতের বার মাসে তের পার্বণের নানা রূপ নানা রহস্য যে এই আপাতঃ তুচ্ছ ও নগণ্য গীতিমালার মধ্যে নিহিত, জিজ্ঞাসু ও জীবনানুসন্ধী পাঠকসমাজের কাছে তারই কিছুটা আভাস দিতে প্রয়াস পেয়েছি। বিশেষ করে, খণ্ডিত ও বিভক্ত ভারতে অখণ্ড ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির রূপ নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন। অথচ ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সত্য ও যথার্থ পরিচয় সেই রূপের মধ্যেই বিধৃত। কাজেই আমাদের সামগ্রিক জীবনের সন্ধানে ও সম্ভোগে সেই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত-প্রায় বিষয় বস্তুটি অপরিহার্য। বারমাসী গীতিমালা সেই ফেলে-আসা, ভুলে-যাওয়া জীবনের অজস্র কথায় ভরা। তাই বারমাসী সংকলনকে এমনভাবে পঞ্চাধ্যায়ে মোটামুটি একখানি পূর্ণগ্রন্থের আকারে রসিক সমাজে পরিবেশন করছি। অবশ্য আমার 'বারমাসী-সংগ্রহ' এ জাতীয় সংকলনের কোন চূড়ান্তরূপ নয়। আমার এ সাহস কতখানি দুঃসাহস বা সৎসাহস, এ প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক বা অসার্থক সুধী-পাঠকচিত্তেই তার যথার্থ বিচার।

আমি শুধু সহানুভূতিশীল পাঠকসমাজে সবিনয়ে এই নিবেদন জানাই, আমার চলার পথটি একেবারে নতুন ও অচেনা। অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছে

অনেক স্থানেই। বিশেষ করে, যে বিচিত্র ভারতীয় ভাষা থেকে এই বারমাসীর সংগ্রহ, তার অনেকগুলির চরিত্র বা রহস্য আমার অজানা। আমি শুধু সেইসব অজানা ভাষার বাংলা বা ইংরাজী অনুবাদ মোটামুটি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেই আহৃত বিষয়বস্তু অবলম্বনে আমার সমগ্র আলোচনাটির রূপ দিয়েছি। এ অবস্থায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নিষ্ণাত পাঠকের সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তাঁদের বিচক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমার আলোচনার অংশ বিশেষে কিছু কিছু ত্রুটি ও চ্যুতি ধরা পড়লেও পড়তে পারে। বিজ্ঞ পাঠকসমাজ গ্রন্থের প্রতি মমতার দৃষ্টি নিয়ে এই জাতীয় ভ্রম প্রমাদ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকবো।

বারমাস্যার এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমার স্পষ্টই ধারণা ও বিশ্বাস হয়েছে, এ জাতীয় আলোচনাকে কেবল ভারতীয় সাহিত্যের পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করা চলে। সে কাজ ফেলা রইল আগামী দিনের গবেষকদের উপর। তাঁদের দুর্গম ও ঘনাচ্ছন্ন যাত্রাপথে আমার এ কাজ যদি একটি ক্ষীণ দীপশিখারূপেও ব্যবহৃত হয়, তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এর পর ঋণের কথা। আমার আলোচনার এই ক্রম বা রূপ সৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ইঙ্গিত উপদেশই আমার নির্ভর। কাজেই প্রথমেই জানাই তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও অধুনাতন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয় আমার আলোচনাটির উপর তাঁদের মূল্যবান অভিমত প্রদানে আমার প্রতি যে স্নেহ ও সহানুভূতি জানিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের কাছে আমি চির-ঋণী। শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মশায়ও মাঝে মাঝে নানা ইঙ্গিত আভাস দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের ঋণও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি। বিচিত্র বারমাসী ও কতকগুলির ভাবানুবাদ সংগ্রহে যাঁদের কাছে আমি ঋণী, তাঁদের মধ্যে আমার পরম প্রীতিভাজন সহকর্মী অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নাম সর্বাগ্রগণ্য। প্রধানতঃ তাঁরই আন্তরিকতায় এবং অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতায় বিচিত্র ভারতীয় বারমাসীর সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলেজের গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও ডক্টর রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা, কলেজের টোল বিভাগের স্মৃতির অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ—এঁদের সাহায্যও আমার কার্যসিদ্ধির পথে পরম পাথেয় বলে মনে করেছি। বিবেকানন্দ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর তারাচরণবাবুও আমায় কিছু কিছু বারমাসীর সন্ধান দিয়ে পরম উপকার করেছেন। এই সমস্ত জ্ঞানী, গুণী ও মনীষিবৃন্দের সাহায্য সহানুভূতির উপরে পেয়েছি আমার ছাত্রবৃন্দের অনেকেরই ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা। এঁদের মধ্যে জাতীয় পাঠাগারের কর্মী শ্রীমান্ অরুণকুমার দাস ও কার্তিকচন্দ্র সাহা—এই দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ রণেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী আমায় গ্রন্থপ্রস্তুতির কাজে যেভাবে সাহায্য করেছে, তা আমার পক্ষে কোনদিনই ভুলবার নয়।

শ্রীযুক্ত পদ্ম বরকটকী মহোদয় অসমীয়া বারমাসীর অনুবাদ করণে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন এবং জাতীয় পাঠাগারের তেলেগু ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী মিস্টার নাগরাজনের সাহায্যের কথাও আমার পক্ষে স্মরণীয়।

শেষে জানাই আমার সমস্ত অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা আমার সহকর্মী অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত হেরম্ব চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সাধন কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন কর, শ্রীযুক্ত ননীলাল সেন ও ডক্টর শিবেন ঘোষাল—এঁদের সকলকে। দিনের পর দিন এঁদের উৎসাহ প্রেরণাতেই এ কাজের সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ রূপ দান আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

মডার্ণ বুক এজেন্সীর কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু মশায় এবং আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ গ্রন্থের সুষ্ঠু মুদ্রণ ও প্রকাশনের দায়িত্ব-গ্রহণ ও পালনের দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে উঠেছেন।

গ্রন্থে মুদ্রণজনিত ভ্রম সহস্র সাবধানতা সত্ত্বেও এখানে ওখানে কিছু কিছু রয়ে গেছে। এ বিষয়ে ভ্রমসংশোধনের তালিকার আশ্রয়ের পরিবর্তে হৃদয়বান্ ও চেতনাবান্ পাঠকসমাজের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টির আশ্রয়ই আমার নির্ভর।

রাসপূর্ণিমা
১৩৬৬

বিনীত—
গ্রন্থকার

গ্রন্থসূচী

প্রথম অধ্যায়

		পৃষ্ঠা
	ঋতু-প্রকৃতি ও জীবন	১—২১
(ক)	ছয় ঋতু ও বারো মাস—মানবচিত্তের ঋতু পরিবর্তন···	১—১০
(খ)	কৃষিনির্ভর সমাজ ও ঋতু-উৎসব : প্রজননতন্ত্র ···	১০—১৫
(গ)	ঋতু ও ঋতু-উৎসবের ঐতিহ্য	১৬—২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক)	লোকগীতি ও বারমাস্যা ···	২২—৩৪
(খ)	অন্যান্য লোকগীতি ও বারমাস্যা ···	৩৪—৩৬
(গ)	ছড়া ও বারমাস্যা ···	৩৬—৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

	বারমাস্যার বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ ···	৩৮—৬৫
(ক)	বারমাস্যার আকৃতিগত বিভেদ ···	৩৮—৩৯
(খ)	বারমাস্যার প্রকৃতিগত বিভেদ ···	৪০—৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং বারমাস্যা ···	৬৬—৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

(ক)	বারমাস্যার সাহিত্যধর্ম ···	৯০—৯১
(খ)	বারমাস্যার নারীচরিত্র ও তার সাহিত্যিক মূল্য ···	৯১—৯৫
(গ)	বারমাস্যার ভাষা ও তার সাহিত্য-মূল্য ···	৯৫—১০০
(ঘ)	কথা-সাহিত্য ও বারমাস্যা ···	১০০—১০২
(ঙ)	ইতিহাস ও বারমাস্যা ···	১০২—১০৪
(চ)	বারমাস্যায় প্রকৃতির স্থান ও তার সাহিত্যিক মূল্য ···	১০৪—১০৯
	বারমাসী-সংগ্রহ ···	১১১—২৫২

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

প্রথম অধ্যায়

ঋতু-প্রকৃতি ও জীবন

ছয় ঋতু ও বারো মাস—মানবচিত্তের ঋতু-পরিবর্তন ঃ—

নিসর্গ রাজ্যের ঋতু-পরিবর্তনে মানস লোকের ঋতু-পরিবর্তন নিত্য ও শাশ্বত। মানবমনের প্রতিটি রূপ, রঙ ও রহস্য প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, রঙ ও রহস্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একের বর্ষা-বসন্তে অপরের বর্ষা ও বসন্ত আলোছায়ার মত আবির্ভূত হয় প্রতিনিয়তই। আমরা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের এই ঋতুবৈচিত্র্যগত সত্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন না থাকতে পারি, কিন্তু জগতে এর থেকে বড় সত্য আর নেই। যে মানুষের পরিচয় তার মনে, সেই মনের আসল পরিচয় নিসর্গ পটভূমিকায়। তারই জড়তায় ও উষ্ণতায়, শুষ্কতায় ও শ্যামলতায়, প্রাচুর্যে ও স্বল্পতায়, মনের অনুরূপ ভাবান্তর, সুরবৈচিত্র্য অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

নিসর্গের সঙ্গে মানবমনের এ সম্পর্ক এক সহজ প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক। এ সম্বন্ধ পাতানো বা মানানো নয়, এ একান্ত সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত। কোন্ অনাদিকাল থেকেই বিশ্বস্রষ্টা এই দুটো জীবনকে এমন এক কঠিন বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন। এর ধারা অনাদি ও অনন্ত। এর রূপ অবিমিশ্র ও অকৃত্রিম। যে ভালবাসা, যে প্রীতি ও অনুরাগ নিমিত্তমূল, তা ক্ষণিক ও কপট। তা বহুরূপীর মত ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রূপ ধারণ করে। তার দু-দিনের রূপ-সৌন্দর্য আছে, চিরদিনের বলে কিছু নেই, কিন্তু স্বভাব-প্রেম শাশ্বত, সহজ ও সুন্দর।—

> 'ব্যতিষজতি পদার্থান্ আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ
> ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
> বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং,
> দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ॥

(উত্তররামচরিত—ভবভূতি)

যথার্থ প্রেমের প্রকৃতি এমনি নির্বিকার, সহজ ও পূর্ণ। এক ও অদ্বয় রূপে সে অনাদিকাল থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপন মহিমা প্রকাশ করে চলেছে। প্রকৃতির সংগে মানবচিত্তের সম্পর্ক এই গাঢ় ও গূঢ় প্রেমেরই সম্পর্ক। এদের ভালবাসা চুম্বকের আকর্ষণের মত পরস্পরকে প্রতিনিয়ত টানতে থাকে। এই আকর্ষণেরই দুর্নিবার প্রভাবে যখন শ্রাবণ-ধারায় নদনদী, খালবিল ভরে ওঠে কানায় কানায়, তখন বিরহিণীর প্রেমসিন্ধু উদ্বেল হয়ে ওঠে। নিসর্গের ভরপুর স্ফূর্তি দীপ্তিতে সে আপন প্রেমের স্ফূর্তি প্রকাশে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কবিগুরুর অমর উক্তিতে পাই এরই স্পষ্ট সাক্ষ্য ও সমর্থন—"নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল স্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড় ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহা পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে ও সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন।"

মানুষের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র মনোহর, মনোজ্ঞ সাজে বেশে মানবমনে এমনি ভাবে কত ভাবাবেশ কত না পুলকউচ্ছ্বাস ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের হাসিকান্না, বিরহমিলন, শ্রান্তি-শান্তির পরতে পরতে মেশানো নিসর্গের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ স্পর্শ। সূর্য-চন্দ্রের উদয় অস্তে যেমন কমল কুমুদের জীবন-মরণ, প্রকৃতির রাজ্যের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও বসন্তের ছোঁয়ায় তেমনি চিত্ত-সিন্ধুর জোয়ার-ভাঁটা খেলে প্রতিনিয়ত। হয়তো সে জোয়ার বা ভাঁটার টান আমাদের সবারই মর্মমূল তেমন করে নাড়া দেয় না, অথবা হতে পারে সে টানে পারাপারের উদ্যোগ আয়োজন পড়ে না, প্রতিক্ষণে; কিন্তু প্রকৃতির আয়োজন যেখানে ষোল আনা, সেখানে আমাদের মনের দোটানার অবকাশ নেই। নিসর্গ রাজ্যের সব-ভোলানো মাতাল-করা সুরে নিত্যকার স্বস্তি ও শান্তি-সন্তোষের ঘর-সংসারের মধ্যে জাগে কত না অসন্তোষ ও অশান্তি! চিরদিনের বস্তু তখন হয়ে ওঠে দুদিনের, নিশ্চিন্ত সুখ-

নিদ্রা ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে যায় অনিশ্চিত অনাগতের উদ্দেশ্যে যাত্রার উদ্যোগ আয়োজনে। মনবিহঙ্গ গৃহগত শান্তির নীড় ছেড়ে পক্ষ মেলে উড়ে চলে অনন্ত আকাশে। তখন হাতে-গড়া, নিয়মের আটঘাটে-বাঁধা সংসার মনে হয় কারা, বন্দীশালা !

নিসর্গ রাজ্যে শরৎ বর্ষা বসন্তাদি বিভিন্ন ঋতুর অঙ্গরাগ ও সাজবেশ বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। এবং তাদের আকর্ষণও বিভিন্ন। বিভিন্ন ঋতুর আকাশ বাতাস তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। বনানী, অরণ্যানী ও উদ্যান কানন ঋতু বিশেষে বিচিত্র পত্রপুষ্প ও পল্লবসম্ভারে সজ্জিত। চিত্তবীণায় তাদের সৃষ্ট রাগরাগিণীর প্রকৃতিও বিভিন্ন। বর্ষাগমে মেঘ সন্দর্শনে মানবচিত্তের ভাবান্তরকে মহাকবি কালিদাস তাঁর মনোজ্ঞ শ্লোকে অমরত্ব দিয়ে গিয়েছেন।—

'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।'

'মেঘ আপনার নিত্য নূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে গর্জনে বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপরে একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে, তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন একথা আর মানিতে চাহে না।' কবিগুরুর এ কথা এ প্রসঙ্গে একান্ত স্মরণীয়। যুগে যুগে বর্ষার মেঘ এমনি করে হাতছানি দেয় জীবলোকের সুখী-অসুখী প্রতিটি নরনারীকে। মেঘের এ সঙ্কেত, এই হাতছানি এমনই দুর্বার, এমনই দুরন্ত যে, কবি অকবি নির্বিশেষে, মানুষ মাত্রেরই ভাবের ভাষা তখন একসূত্রে হয় গ্রথিত। সমস্বরে গেয়ে ওঠে সে,—

'ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন-ঘোর বরষায়।'

ভাসমান, নিয়ত প্রবহমান মেঘের গতি প্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতির মর্মমূল ধরে নাড়া দেয়। সাড়া পড়ে যায় তার শিরায় শিরায় ওঠার ও চলার—সীমা ছাড়িয়ে অসীমায়, জানা থেকে অজানায়। এই চলার মধ্যেই পায় সে তার সহজ-স্বভাবকে

ডিঙিয়ে সাধনার স্বভাবকে, তার অন্তর্নিহিত অমিত-মানবকে যা তার জীবন-সর্বস্ব। বর্ষাগমে জীবকুলের এই মানসযাত্রার রূপকেই ভাষা দিয়েছেন কবিগুরু তাঁর 'বর্ষার রূপে'—

'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে,
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা ;
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে॥'

বর্ষার মেঘগর্জন, তার দুরন্ত ঘনঘটা, তার 'ভিজে বনের ফুল', তার অবিশ্রান্ত ধারা-সার—এসব যেমন এমনি করে, মানুষের অন্তর্নিহিত চির-বিরহীমূর্তিটিকে জাগ্রত করে তোলে তার চিত্তবীণায় বেহাগ রাগিণী, তেমনি শরৎপ্রকৃতিও তার বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে, কলনাদী সহস্র তটিনী সংযোগে তার পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সংসার-মায়াবদ্ধ জীবচিত্তে আনে নব নব উন্মাদনা, নিত্য নতুন চেতনা। এর অমোঘ ইঙ্গিতে মানুষ প্রতিদিনের জীবনের ঘোমটা ফেলে খুলে, জীবন ও ভুবনকে দেখে সে নতুন রঙে, এক দিব্য রূপে। আপনার অবাধ ও অবারিত সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়ে জীবনের সমস্ত বাধাবিপত্তিকে সে কুড়িয়ে নেয়, 'অকারণ অবারণ চলার' পাথেয়রূপে। তার আপন মনের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে বিশ্বভুবন, আপন সুরে নন্দিত ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত। তখন আপন-ভোলা মানবচিত্ত গেয়ে ওঠে—

'এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥'

শরতের পদ্ম, শরৎ-শেফালি তাদের অপূর্ব সৌরভে মানুষকে দেয় তার অন্তর্লোকের সন্ধান। পাগলের মত ধেয়ে চলে সে দিক থেকে দিগন্তে, সেই আনন্দলোকের, অমৃতলোকের সন্ধানে। তুচ্ছ মনে হয়, তার সংসার-জীবন যাত্রা—এর সমস্ত আড়ম্বর আয়োজন। এ পারের সব কিছুই তখন নিতান্ত গন্ধহীন, বর্ণহীন,

স্বাদহীন। কারণ সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন।'

বর্ষা শরতের মত বসন্তও তার যূথিকা, মল্লিকা, ভুঁইচাপা, গোলাপ, অশোক, কর্ণিকা পুষ্পের অর্ঘ্য নিয়ে আমাদের এই রিক্ত ও নীরস মর্ত্যজীবনের উপর এক বর্ণাঢ্য, রসঘন দিব্যজীবন পেতে দিয়ে যায়। সহসা জীবননদীতে আসে প্রবল জোয়ার। কত রূপ, কত বিচিত্র ধ্বনি, কত মনোহর দৃশ্য, গন্ধ ও গানের ঐকতানে মন হয়ে ওঠে মাতাল। বাঁধনহারা জীবনের অশেষ ভাব রূপ ও ঐশ্বর্য মানবচিত্তে জাগায় নব নব সুর, বিচিত্র ছন্দ ও গান। কি যেন এক হারানোর করুণ সুর, না-পাওয়ার ব্যথা অনুক্ষণ এক অব্যক্ত অস্ফুট বেদনা দিতে থাকে। যে পূর্ণ ও সুন্দরের উপলব্ধিই জীবনের ধন ও ধ্যান, বসন্তের সমাগমে আকাশে, বাতাসে, পুষ্পে, পর্ণে, পল্লবে, সর্বত্রই ভেসে ওঠে সেই পূর্ণ ও সুন্দরের রূপ ও জ্যোতিঃ। সেই বিরাট ও নিঃসীমের কথঞ্চিৎ ধ্যানে ও ধারণায় মানুষ গেয়ে ওঠে গান—বিচিত্র ছন্দে ও সুরে। কারণ, কথায় যাকে সে এঁটে পায় না, তাকে ধরতে চায় ছন্দে ও গানে। কথার জগত একান্তই স্পষ্টতার জগৎ, প্রয়োজনের দ্বারা তা একান্ত সীমিত। তাই তা খণ্ড ও অপূর্ণ। 'গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত'। বসন্ত ঋতু তাই যখন তার সহস্র শ্রী ও সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে সেই পূর্ণ ও বিরাটের আরতিতে ব্রতী, তখন প্রাণের নতুন স্পন্দনে অভিনব উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মানুষ স্বতঃই গেয়ে ওঠে,—

'আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন পানের বাঁধন হ'তে
চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়,
ছড়িয়ে দেরে দিগন্তে।'

ঋতুর পরিবর্তনে মানবচিত্তের ভাবান্তরের অবিসংবাদিত সাক্ষ্য মানবজাতির উৎসব-অনুষ্ঠান। শুধু বাংলা বা ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার কথা নয়, যাবতীয় মানবজীবন ও মানবসভ্যতার ইতিহাসই এ বিষয়ে এক ও অভিন্ন। উৎসব মাত্রেরই মর্মকথা আপনার অন্তর্নিহিত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ। বর্ষা, বসন্ত ও শরৎ-আদি বিচিত্র ঋতুর বিভিন্ন সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও বিলাস-বিভ্রমময়

প্রকাশ মানুষ মাত্রেরই অন্তররাজ্যে নিয়ে আসে বিপুল বিপ্লব ও আলোড়ন; তাকে তার প্রতিদিনের ব্যক্তিগত ঘরসংসার থেকে টেনে আনে বিশ্বসংসারের দিকে ব্যক্তিমানবের সঙ্গে বিশ্বমানবের মিলন উদ্দেশে। উৎসব সেই মিলনের পুণ্যপীঠ। কালক্রমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকারের ফলে জীবনযাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে উৎসবের এই উৎসবার্তাটি আমরা একেবারেই হারাতে বসেছি। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে নিসর্গজীবন যে দিনে ধামা চাপা পড়ে গেছে, সে দিন উৎসবপালনের পিছনকার এই নৈসর্গিক প্রভাবের কথাটি যেন রূপকথার জগতের বিষয় হয়ে উঠেছে। এখন উৎসবের মধ্যে আদি পর্বের মৌল ভাবটি কেবল গুটিকতক পত্র-পুষ্প-পল্লবমালা আস্তরণের মধ্যেই নিঃশেষিত।

কিন্তু এ কথা আমরা ভুলতে পারি না যে, আমাদের দুর্গোৎসব, আমাদের দীপান্বিতা, আমাদের শ্রীপঞ্চমী বা আমাদের দোল, মূলতঃ শারদোৎসব, হেমন্তোৎসব অথবা বসন্তোৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। শরতের নদনদী, আকাশ, বাতাস, শ্যামল শস্য ও পুষ্প পল্লব আমাদের চিত্তে যে দোলা দিয়েছে সেই আন্দোলনের আনন্দই শারদোৎসবের মৌল উপাদান। শারদীয়া পূজা ও বাসন্তী পূজাব মর্মকথাও মানবচিত্তে শরৎ ও বসন্ত ঋতুর আন্তরিক স্পর্শপ্রভাবজনিত আনন্দময় সত্তার প্রকাশ। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়েব পূজাপার্বণ-গ্রন্থে উৎসবময় জীবনের এই সত্য, এই রহস্যই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। —'শারদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শারদোৎসব; শরৎ ঋতু প্রবেশ জনিত উৎসব।' স্থানান্তরে তিনি বলেছেন—'শীতঋতুর আরম্ভে লক্ষ্মী সরস্বতীর অর্চনা বৈদিক কালের স্মৃতি। আর আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অতি প্রাচীন বৈদিক কালের বর্ষা ঋতুর স্মৃতি।'

আমাদের বাৎসরিক উৎসবমালা, শৈব উৎসব, শাক্ত উৎসব ও বৈষ্ণব উৎসব ইত্যাদি নামে পরিচিত। বার মাসে তের পার্বণের কতকগুলো ব্যক্তিগত, কতকগুলো সামাজিক ও কিছু কিছু স্বজনোৎসব বা পারিবারিক উৎসব। এইভাবে ছোট-বড় বিচিত্র উৎসবের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিচয় চিরকাল সুনির্দিষ্ট। কোথাও দেবচরিত্রকে কেন্দ্র করে, কোথাও বা লোকচরিত্রকে মধ্যবিন্দু করে নানাভাবে বিচিত্র ভঙ্গিমায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু উৎসব মাত্রেরই অন্তঃপ্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণে এ কথা অতি সুস্পষ্ট যে বিভিন্ন কালে, বিচিত্র ঋতুতে উৎসব-পালনের সুকঠিন বিধিবিধানের মধ্যে ঋতুপ্রভাবজনিত

প্রাণহিল্লোল ও রসোচ্ছ্বাসই উৎসবের মৌল প্রেরণা। অধিকাংশ উৎসবই সেই আদিপর্বের কৃষিসভ্যতা, আরণ্যসভ্যতা সংস্কৃতিরই দান। যে জীবনে ঋতু বা প্রকৃতির স্থান ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ, ঋতুর আবির্ভাব, তিরোভাব যে জীবনে পরম আত্মীয়, একান্ত স্বজনের মিলনবিরহেরই সমপর্যায়ে ছিল, অধিকাংশ উৎসবেরই উৎস, সেই কৃষিসভ্যতা ও কৃষিনির্ভর জীবন। তাই ঋতুপ্রকৃতির মূল্য মর্যাদা, সম্মান সমাদর উৎসবের মূলে এত বেশী। আমাদের দৈব ও লৌকিক কৃত্যের অনেক ক্ষেত্রেই পৃথকভাবে ঋতুবন্দনা উৎসবের একটি অঙ্গরূপেই বিধৃত।—

'বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঃ ঋতবে চ নমঃ সদা।
হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ
মাস সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥'

উৎসবের মধ্যে ঋতুপ্রশস্তির এই সনাতন বিধি বাইরের ঋতু-পরিবর্তনে মানব-চিত্তের ঋতু পরিবর্তনের এক পরম সাক্ষ্য। সভ্যতার আদিপর্বে সব উৎসবই ছিল নৃত্য ও গীতময়। ঋতুর পরিবর্তনজনিত আনন্দে সে দিনের মানুষ গেয়ে উঠত গান, নেচে উঠত প্রাণের আবেগে, উচ্ছ্বাসে। ভারতীয় লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের প্রকৃতি-পরিচয়ে, এই সকল নৃত্য ও সংগীতের অন্তর্গত সত্য ও রহস্য উদ্ঘাটনে দেখা যায়, বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকৃতির নৃত্য ও গীতি বিহিত। প্রখ্যাত মনীষী আর্চার (W. G. Archer) ওরাঁওদের গীতি ও নৃত্যোৎসবের পরিচয়প্রদান-প্রসঙ্গে বলেছেন—

'The festival has for the Uraons the gladness of Easterday—an exultation in the brilliant weather and the flowering trees, and the sense of sprouting life.' (*The Blue Grove*)

শ্রাবণমাসে বর্ষার ঘনঘটায় উত্তরপ্রদেশের কাশী অঞ্চলে বিশেষ করে মিরজাপুর এলাকায় জনসাধারণ যেমন গেয়ে ওঠে কাজরী গান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমের সর্বত্রই লোকচিত্ত হোলী বা বসন্তোৎসবের সংগীতে তেমনি মাতোয়ারা। আবার শরতের শিউলি ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিরহবিধুরা বাৎসল্যময়ী

জননীর অফুরন্ত স্নেহধারা বিগলিত হতে থাকে। সে উদ্বেল স্নেহনির্ঝরিণীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—

'ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি ঘরে, শরদে শারদা বিনা,
হৃদয় বিদরে।
আন্‌চান করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী
যেন ব্যাকুলা অন্তরে॥

ইত্যাদি সংগীতে প্রমূর্ত।

প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টি পরম অদ্বৈতবাদী। ভারতবাসী অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ওষধি ও বনস্পতির ঋতুগত বিচিত্র সৌন্দর্য উপলব্ধির মাধ্যমে সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের উদ্দেশেই তাদের আন্তরিক প্রীতি ও প্রণতি নিবেদন করে এসেছে।—

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥'
(শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ—২।১৭)

ভারতীয় আত্মার সার্থক প্রতীক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের প্রতি পর্বে এই প্রাচীন ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দৃষ্টি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। কবি অনুভব করেছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, মানুষ ও প্রকৃতি একই সৃষ্টিকর্তার প্রতিরূপ। উভয়ের উৎস এক ও অভিন্ন বলেই এমন করে মানুষ চায় প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতিও মানুষকে কাছে টানে। তাই যদিও কাব্যসংগ্রহের বিচিত্র পর্বে বিভিন্ন অধ্যাত্মানুভূতি, জীবন ও বিশ্বানুভূতি প্রমূর্ত, তাঁর স্বদেশানুভূতি অথবা জীবন ও ভুবনানুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সক্রিয় এই নিসর্গানুভূতি। বর্ষা বসন্ত শরতাদির বিচিত্র রূপ ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কবির মানসাকাশ নব নব রঙে রঞ্জিত, বিচিত্র সুরে স্পন্দিত। কাল বৈশাখীর ঝড়ের বেগই আপাততঃ কবিচিত্তে জাগায়েছে মহাজীবনের আবেগ :—

'শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে।
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥'

আষাঢ় সন্ধ্যার বৃষ্টিধারা, যূথীবনের সজল হাওয়া কবিকে আনমনা করে তোলে ; তাঁর চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে :—

'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেলরে দিন বয়ে
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যে যায় কয়ে।'
(গীতাঞ্জলি—১৯)

মহুয়া গ্রন্থের 'পাঠপরিচয়'-সূচক পত্রে কবি স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন—'নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা'।

'যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বনজুড়ি।'

এ কবিতায় কবিচিত্তের বাসন্তী রঙ বসন্ত-ঋতুরই দান।

শান্তিনিকেতনের অধিবাসী কবিচিত্ত ঋতুপ্রকৃতির রঙ-বেরঙের রম্য আবেষ্টনীর মধ্যেই লালিত ও পরিবর্ধিত। কবির চিত্তভাবনায়, ধ্যানে, গানে এবং জীবনচর্যায় এই ঋতুপরিচয় কবির মুখেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

'আর কোনখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে।'

এই ঋতুর মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ এরই জন্যে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত-উৎসব, পৌষ-উৎসব ইত্যাদি ঋতু-উৎসবের পরম্পরা সাজিয়ে গিয়েছেন।

বারো মাসে ছয় ঋতুর পালাক্রমে আবির্ভাবের ফলে মানবমনের অপরূপ রূপ ও বিলাস-বিভ্রম এমনি করে সর্বকালীন বিশ্বমানবজীবনের মহাসত্য।

এই সত্যই অমর হয়ে আছে ঋতু-উৎসব নাট্যকাব্যের শারদোৎসব গ্রন্থের নান্দীতে—

'শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য-ধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়।
সেই অপরূপ, সেই অরূপ রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিল সবাকার মন॥
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি।
স্বর্ণদীপ্তি শারদরূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয়॥'

কৃষিনির্ভর সমাজ ও ঋতু-উৎসব ঃ প্রজননতন্ত্র

ঋতুর পরিবর্তনে মানবচিত্তের ভাবান্তরের যে রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো, তা কোন দেশ বিশেষের বা যুগবিশেষের সত্য নয়; সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় সত্য। তবে মানবসভ্যতার যত আদি পর্বের দিকে, লোকসংস্কৃতির যত প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, ততই দেখা যায়, সব সভ্যতা, সব সংস্কৃতি, সব পূজাপার্বণ বস্তুতঃ কৃষিমূল ও অন্নমূল। সে দিনের সমাজ নিতান্তই কৃষিনির্ভর এবং একান্তই অন্নময় সে প্রাণ। অন্নময় ও প্রাণময় কোষ ছাড়া, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ বা স্ফূর্তি তখনও তাদের মানবতার মধ্যে দেখা দেয়নি। তাই তাদের পূজা-অর্চনা, তাদের উৎসব-অনুষ্ঠান, তাদের কৃষিকে কেন্দ্র করে, অন্নকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। কৃষিই ছিল সে দিনে তাদের ধ্যান, কৃষিই ছিল তাদের জীবনসর্বস্ব।

সভ্যতার বিবর্তনে, প্রাণধারণের বিচিত্র পথের আবিষ্কারে কৃষি একালে অজস্র জীবিকার অন্যতমরূপেই পরিগণিত। সে দিনের অনন্যগতি মানুষের মত কৃষি আর জীবনের পরম নির্ভর নয়। আর এই কৃষিগত প্রাণের অভাবে বর্ষা-বসন্তাদি ঋতুর আগমন-নির্গমনেও এ দিনের মানুষের জীবনে আবাহন-বিসর্জনের দায়িত্ব অবসিত। কিন্তু সে দিনের মানবজীবনে ঋতুর আগমন-নির্গমন রবাহুতের মত ছিল না। তার আগমনেও যেমন ছিল প্রত্যুদ্গমন, নির্গমনেও ছিল বিরহ-ব্যথা, অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অন্তরঙ্গের সম্বন্ধ; দরদী আত্মীয়ের

সম্বন্ধ। প্রকৃতির সংগে এই অন্তরঙ্গতায় সে দিনের কৃষক মানুষ, ভূমিপ্রাণ মানুষের কাছে নিসর্গজগতের সমস্ত কিছু পরিবর্তন বিবর্তন ছিল পরম তাৎপর্যময়। মানুষের উৎসব-ব্যসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল প্রকৃতি—তার বিচিত্র রূপ ও অভিব্যক্তি। একালে মানুষের সমাজে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠান মানুষকে নিয়ে, দেবতাকে নিয়ে। কিন্তু সেকালের কৃষিসভ্যতার যুগে মানুষের উৎসব ছিল প্রকৃতিকে নিয়ে, ঋতুর বিচিত্র মূর্তিকে নিয়ে, কারণ অনন্যগতি মানবসমাজ অন্নের আশায় চাতকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো প্রকৃতির দিকে। মাটির ডাকে তারা সাড়া দিত। গাছের ফলপুষ্পের বিকাশে তারা মেতে উঠত, আর তারই সময়োচিত অপ্রকাশে তারা মর্মাহত হতো। ব্রত ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রতিকার প্রতিবিধানেও তৎপর হতো তারা। ঋতুতে ঋতুতে চাষবাসের বিচিত্র অবস্থা। তাই প্রাচুর্যের উল্লাসেই হোক ও একান্ত অপ্রাচুর্যের নৈরাশ্যেই হোক, সেকালের ব্রত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান ছিল মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে। ঋতু উৎসব বা শস্য উৎসবই উৎসবের মূল পরিচয় সে জীবনের। আর উৎসবের দেবদেবী মাত্রই কৃষির দেবতা, ক্ষেত্র দেবতা, প্রজননশক্তির প্রতীক। ঘরে বাইরে এই প্রজননশক্তির জয়গানই সে সময়ের পূজাপার্বণের মর্মকথা।

'At harvest time festivities were held in honour of the Gods with feasts, dance and music.

People of the Vedic age offered worship and hymns to Varuna, Indra, Mitra. They offered to these deities the delicious beverage known as Somarasa, and then they regaled themselves with this offered drink, men and women joined together in dancing and singing songs, selected from the Sama-veda in honour of these Gods and thus passed the day in great merriment.'[1]

কৃষিসমাজের উৎসব মুখ্যতঃ নৃত্য ও গীতি উৎসব।—একালের উৎসবের মত তন্ত্র মন্ত্র বা ধ্যান প্রধান না হয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাসপ্রধান। দ্রব্যময় যজ্ঞ

[1] B. K. Sarkar : *The Institution in the Vedas*—'The Folk Element in Hindu Culture'.

বা জ্ঞানযজ্ঞের রটাঘটা সে স্তরের জীবনে ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। সভ্যতার সেই আদিপর্বে ভূমিই ছিল মানুষের ইহকাল, ভূমিই ছিল মানুষের পরকাল। তাদের অর্থও ছিল ভূমি, পরমার্থও ছিল ভূমি। তাই সহৃদয় আত্মীয়ের মত অশ্রু দিয়ে বৃক্ষলতাদির শুষ্কতায়, নিষ্ফলতায় তারা সান্ত্বনা দিত। হাসি গান ও নৃত্য সহযোগে তাদের ঐশ্বর্যে, সফলতায় তারা আনন্দমেলা বসাত। এই সমপ্রাণতা, অভিন্নহৃদয়তাই সেদিনের ঋতু উৎসবের নাচে গানে ধ্বনিত হয়ে উঠত।[2]

ওরাঁও সম্প্রদায়ের গীতি ও নৃত্যোৎসবের বিচিত্র রূপরহস্য কৃষিপ্রধান সমাজের ঋতু উৎসবের অন্তর্গত এই প্রাণপরিচয়েরই উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এরা যে ভূমির কৃপায় জীবনধারণ করত, যার দানেই তাদের দেহপ্রাণের অস্তিত্ব ও বিকাশ, তাকে সত্য সত্যই তারা রক্তমাংসে-গড়া বিচিত্র অনুভূতি-পরায়ণ নারী চরিত্ররূপেই দেখত। বিভিন্ন ঋতুতে, দেহমনের বিচিত্র অবস্থায় নারীচরিত্র সম্পর্কে যে মমতা ও সহানুভূতি-সমবেদনা তার স্বজন আত্মীয়ের চিত্তে জেগে ওঠে, ভূমি প্রকৃতির প্রতি এখানকার মানুষের দৃষ্টি তা থেকে কোন অংশে বিষম নয়। ওরাঁওদের নৃত্যোৎসবের এক সুবিস্তৃত পরিচয়ের সূত্রে মনীষী আর্চার লিখেছেন—

"In one aspect Sarhul festival is a 'vegetation ceremony —an act of rejoicing in the jungle which has already come into flower. In the other it is a 'fecundity' ceremony—a marriage of the earth with the sun on the assumption that the soil is ready to be quickened. The fertility of the jungle is used, as it were, to stimulate the fertility of the fields."[3]

---

[2] "In the Mikal hills the mango season is a time of excitement and delight. Parties of young men and girls go out into the forest and spend days enjoying the most delightful of picnics, eating little except the fresh wild mangoes and drinking the water of the mountain streams."

—Verrier Elwin : *Folk-songs of the Maikal Hills.*

[3] W. G. Archer : *The Blue Grove*, 'Uraon Dances', p. 35.

নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচাবার জন্যে এদের যে যাবতীয় যত্ন প্রচেষ্টা তা ভূমির ক্ষেত্রেও, বৃক্ষলতাদির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযুক্ত হতো। কারণ নারী ও ভূমির অন্তরে একই প্রাণশক্তি একই অনুভূতি সক্রিয়, তাদের এই ছিল ধারণা। শুধু ধারণা নয়, এ তাদের বিশ্বাস ও সংস্কার। তাই নারীজীবনের সফলতায় আর ভূমি বা বৃক্ষাদির জীবনের সার্থকতায় তাদের মনোভাবের বা আচার-আচরণের কোন ইতরবিশেষই ছিল না।[4]

ওরাঁও সম্প্রদায়ের জীবনে সম্বৎসরের মধ্যে মাসে মাসে শস্য ও ফল-ফুলের বিচিত্র অবস্থায়, তাদের শুভ ও সমৃদ্ধি কামনায় এই রকম নৃত্যের মত ফগুয়া, যাত্রা, ধুরিয়া ইত্যাদি বিচিত্র বারমাসী-গীতি-নৃত্যের প্রথা লক্ষ্য করবার বিষয়।

এই কৃষিনির্ভর সমাজ ও সভ্যতা একান্তই মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ মাত্রই যেমন নানা যাদুশক্তি বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ, এখানকার সমাজজীবনেও সেই সত্য সমভাবে সক্রিয়। বাংলার মাসে মাসে অনুষ্ঠিত বিচিত্র ব্রতপার্বণ এই মাতৃতান্ত্রিক, কৃষিনির্ভর সমাজের প্রজননশক্তি ও যাদুশক্তির প্রতি প্রীতি আকর্ষণেরই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। 'বাংলার সেকালের ব্রতাচারময় জীবনের বিচিত্র প্রজননশক্তি ও গুহ্য যাদুশক্তির পূজাঅর্চনা এই অনার্য ওরাঁও সম্প্রদায়ের গীতনৃত্যময় ঋতুউৎসবের প্রতিরূপ বলেই মনে হয়। এখানকার বৈশাখে পুণ্যপুকুর ব্রত, শিবপূজা ব্রত বা বসুন্ধরা ব্রত, জ্যৈষ্ঠে জয়মংগলের ব্রত, ভাদ্রে ভাদুরি ব্রত, কার্তিকে কুলকুলটিব্রত, অগ্রহায়ণে যমপুকুর ব্রত বা সেঁজুতি ব্রত, মাঘে মাঘমণ্ডল ব্রত, ফাল্গুনে ইতুকুমার ব্রত,

[4] "The Karam festival occurs in August at the climax of the monsoon when the paddy is standing in the fields but has not yet come into ear. It makes a period of relaxation between the arduous work of transplanting the paddy, and rigours of the harvest ; and is possibly a 'fecundity' festival to help the ripening of the Crop.—W. G. Archer '*The Blue Grove*', p. 43.

চৈত্রে নখছুটের ব্রত ইত্যাদি সবই কৃষিগত জীবনের বিশিষ্ট পরিচায়ক।[5] এই সব ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রজননশক্তির প্রশস্তিই আসল বা একমাত্র কথা। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রাণের দায়ে, অন্নের দায়ে লোকে এই সব অনুষ্ঠান পালন করত। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশেই এইজাতীয় ব্রতাদির কিছুটা প্রাধান্য। আগেই উল্লেখ করেছি, সেদিনের লোকায়ত জীবন ও সমাজের পূজা-অনুষ্ঠানের গোড়ার কথাই ছিল নাচ ও গান এবং স্ত্রীপুরুষের মিলন ও আমোদ উৎসব। সে স্তরের জীবন মুখ্যতঃ প্রবৃত্তি-পরিচালিত ; নিবৃত্তিমার্গের কথা সে জীবনকে সে দিনও স্পর্শ করেনি। তাদের সহজ বোধবুদ্ধিতে মনে হতো, ভোগের সহজ পথেই যথার্থ জয় ও মঙ্গল। তাই তারা ব্যক্তিগত, অথবা গোষ্ঠীগত উন্নতি-অভ্যুদয়ের প্রেরণায়, কিংবা অশুভ, অমঙ্গল বিনাশের প্রত্যাশায় স্ত্রীপুরুষে সম্মিলিতভাবে আমোদ উৎসবে রত হতো। উৎসবে স্ত্রীপুরুষের অবাধ নাচগানের সঙ্গে মদ্যপানের আনন্দ ধারাটিও এসে যোগ দিত।

'তৈ স্তৈ র্জীবোপহারৈর্গিরি কুহর শিলা সংশ্রয়মর্চয়িত্বা দেবীং কান্তার দুর্গাং রুধির মুপ তরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা। তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নি জীর্ণে পুরানীং হালাং মালুর কোষৈর্ববতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি॥'

(সদুক্তি কর্ণামৃত)

আদিম সভ্যতার যুগে ভারতীয় জীবনের এই জাতীয় যাদুশক্তি বা প্রজনন-শক্তির পূজার পিছনে যে মনটি সক্রিয়, অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, বহির্ভারতে, সুদূর ইউরোপ, আফ্রিকা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও সভ্যতার এই পর্বে মানবমনের ধ্যানধারণা অবিকল এক ও অভিন্ন। যারা মাটির একান্ত কোল-ঘেঁষা, একান্ত প্রেম-প্রীতি দিয়ে মাটিকে যারা ভালবাসত, তারা মাটির অন্তরেও একই মানবিক স্পন্দন ও অনুভূতির পরিচয় পেত। এই ধারণারই আত্যন্তিকতায় গৃহমধ্যে সন্তানের জন্মকে শস্যোৎপাদনের হেতু বলে বিশ্বাস করত তারা। বন্ধ্যা নারী এইজন্যই তাদের চোখে ছিল মহা অমঙ্গলেরই প্রতীক আর বহু সন্তানবতী নারী গৃহস্বামীর বৈষয়িক জীবনের পরম সহায় বিবেচিত হতো। যদিও যুগ পরিবর্তিত হয়েছে এবং রুচি ও সভ্যতার আমূল

---

5 ডক্টর নীহার রায় : বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫৮৩-৮৪

পরিবর্তনই ঘটে গেছে, তবুও বন্ধ্যা নারীর অশুচিতা বা অলক্ষণাত্বের উৎস এই আদিম মানব মনোভাব বলেই মনে হয়। কালক্রমে অবশ্য এর পিছনে সংস্কৃত ও মার্জিত রুচির ভিন্ন ব্যাখ্যা এসে সংযুক্ত হয়েছে। যাহোক, লক্ষ্য করবার বিষয়, কোথায় বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ, আর কোথায় অষ্ট্রেলিয়া বা নিউগিনি! এখানকার ওরাঁও সম্প্রদায়ের জীবনে 'fecundity ceremony'র যে পরিচয় ওদের করম নৃত্যোৎসবের মধ্যে বিধৃত, তারই অবিকল প্রতিরূপ সেই সুদূর সমুদ্রপারের জীবনে সুস্পষ্ট। এখানকার কোম সমাজের দীপদান ব্রতের অভারতীয় সংস্করণটিও চরিত্রে বিষম নয়।[6]

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মানুষ যখন নিতান্তই প্রকৃতির আশ্রিত, অথবা প্রকৃতিই যখন মানবমনের বিচিত্র ধ্যান, জ্ঞান ও অনুভূতির একমাত্র উৎস, তখন বস্তু-বিশ্ব ও জীব-বিশ্ব একই প্রাণসূত্রে আবদ্ধ। একালের বস্তু বিজ্ঞান বা জড় বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ভেদবুদ্ধি যখন জাগেনি মানব-সমাজে, তখনকার সেই প্রকৃতির পাঠশালায় পড়া মানুষের দৃষ্টিতে জড় ও জীবজগতের যাবতীয় পদার্থই ছিল একই প্রাণশক্তির, বিভিন্ন বা বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-নির্বিশেষে কৃষিনির্ভর সমাজের ঋতু-উৎসবের অন্তরে এ সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, বলা চলে।

[6] 'In the Leti, Sarmata, and some other groups of islands which lie between the western end of New Guinea and the northern part of Australia, the heathen population regard the sun as the male principle by whom the earth or female principie is fertilised. They call him Upulera or Mr. sun, and represent him under the form of a lamp made of cocoanut leaves, which may be seen hanging everywhere in their houses and in the sacred fig-tree.'—Frazer: '*The Golden Bough*,.

ঋতু ও ঋতু-উৎসবের ঐতিহ্য

কৃষি ও প্রকৃতি নির্ভর সমাজের সঙ্গে ঋতুপ্রকৃতির সম্বন্ধ-সম্পর্কের কথা এইমাত্র কতকটা আলোচনা করেছি। এ জীবনের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, জয়-পরাজয় সবেরই মূলে যে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ বিকাশ, তার একটা স্থূল আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। কৃষকের কৃষিকার্য, রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধযাত্রা অথবা মৃগয়া-যাত্রা, দেবতাদেরও সমর-অভিযান—সবই ঋতুকে কেন্দ্র করেই চলত। তাই ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের বিবরণ বেদ-পুরাণ ও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির সর্বত্রই চিত্রিত।

বৈদিক যুগে চাতুর্মাস্য বা ঋতুযজ্ঞের ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। বসন্তের সূচনায় বৈশ্বদেব যাগ, বর্ষা প্রারম্ভে বরুণ প্রঘাস এবং শরতের আরম্ভে হতো শাকমেধযজ্ঞ। এ সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের মৌলিক প্রেরণা কৃষি বা শস্যসম্পদ এবং পশুসম্পদ লাভ। ব্যবহারিক জীবনের ভোগ-ঐশ্বর্যের বাসনাতেই ঋতু-অনুযায়ী বিচিত্র শস্যযজ্ঞ বা পশুযজ্ঞের আয়োজন ছিল বৈদিক জীবনে। সুনাশীর (Cunaseran) নামক কৃষি-দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদানও এই ঋতু উৎসবের অঙ্গ বিশেষ। এছাড়া 'আগ-লওয়া' বা 'আউনি বাউনি' বলে যে শস্যোৎসব একালেও প্রচলিত, বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে এর ধারা। সে দিনেও আগ্রয়ন ইষ্টি (Agryana Isti) নামক ঋতুযজ্ঞে লোকে বিশেষ বিশেষ ঋতুর ফসল দেবতার উদ্দেশ্যে আগে নিবেদন করে পরে নিজেরা ভোগ করত। এমনি ভাবে শরতে ধান্য, বসন্তে যব এবং বর্ষার তৃণধান্য বিশিষ্ট ঋতুফসল বলে লোকে এদের আগ নিয়ে যজ্ঞীয় উপহারস্বরূপ অর্পণ করত।[7]

[7] 'First-fruit Sacrifice' (Agrayana Isti) :—'Before partaking of any of the fruits of the fields it is necessary for a man who has established fires to make offerings. The normal offerings are those of rice in autumn and barley in spring, alternatives are bamboo-seeds in summer and millet in autumn or the rains.' A. B. Keith : '*The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, p. 323.

বৈদিকযুগের মত পৌরাণিক যুগেও বিচিত্র ঋতু-উৎসবের আয়োজন আমাদের চোখে পড়ে। একমাত্র ভবিষ্যপুরাণেই আন্দোলক বিধিবর্ণন, মদন-মহোৎসব বর্ণন, মহেন্দ্রধ্বজ-মহোৎসব বর্ণন প্রভৃতি বিচিত্র বর্ষা ও বসন্তানুষ্ঠানের নমুনা সমুজ্জ্বল। এখানেও দেখি ঋতুর বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যই দেবতাদের কার্যোদ্ধারে, তাঁদের অসুর-বিজয়সাধনে অনুপ্রেরিত করেছে। ধারণার স্পষ্টতা পরিচ্ছন্নতার অনুরোধে ভবিষ্যপুরাণের পূর্বোদ্ধৃত ঋতু-উৎসব মালার কিছু কিছু পরিচয় এখানে উদ্ধৃত করছি।—

'আন্দোলক বিধি-বর্ণনম্'

'প্রবৃত্ত নরনারীকং পঙ্কমোচ্চার সুন্দরম্ ॥
সানন্দং নন্দনবনে আর্দ্রয়া সহিতো যথা ॥
বিস্ময় স্মের নয়নো বভ্রামোদ্যাত সৌরভঃ ॥
উন্মাদয়ন্ বনে পুণ্যে বিদ্যাধর গণান্ বহূন্ ॥
বসন্তর্তৌ নৃত্যমানান্ সুরাসুর শতার্চিতঃ ॥
সন্তান পারিজাতোত্থাং বদ্ধা স মাধবীলতাম্ ॥
কশ্চিদাং দোলনং চক্রে সমালিঙ্গ্য ঘনস্তনীম্ ॥
গীতমাং দোলকারূঢ় স্তদ্‌গায়স্ত্যমরস্ত্রিয়ঃ ॥
যেন চোৎপাদয়ন্তি স্ম মন্মথস্যাপি মন্মথম্ ॥
তং দৃষ্ট্বাষ্টাপদ নিভা ভবানী প্রাহ শংকরম্ ॥
কৌতুকং মে সমুৎপন্নং পশ্যেমাঃ শংকর প্রভো ॥
আন্দোলকং মম কৃতে কারয়স্ব স্বলংকৃতম্ ॥
ত্বয়া সহান্দোলয়েয়ং যথা চৈতে ত্রিলোচন ॥
তদ্গৌরী বচনং রম্যং শ্রুত্বা গোবৃষধ্বজঃ ॥
সন্দোলাং কারয়ামাস সমাহূয় মহাসুরান্ ॥'

[ভবিষ্যপুরাণম্—১৩৩ অধ্যায়]

'মদন মহোৎসব বর্ণনম্'

'গৌরীং বিবাহ্য জগ্রাহ হরঃ পাশুপতং ব্রতম্ ॥
উমাপতিঃ পশুপতির্ধ্যানাসক্তো বভূব হ ॥
ব্রহ্মাদিভিঃ সমামন্ত্র্য বিবুধৈঃ পুত্রলব্ধয়ে ॥
গৌর্য্যা মনোভিলষিত পূরণায় প্রহর্ষিতৈঃ ॥

প্রহিতঃ ক্ষোভণার্থায় সমর্থ ইতি মন্মথঃ ॥
ততো মারঃ স্মরঃ কামোপ্যাজগাম তমাশ্রমম্ ॥
রতিপ্রীতি মদোন্মাদ বসন্তশ্রী সহায়বান্ ॥
নিধান বারুণীদর্প শৃঙ্গারৈঃ পরিবারিতঃ ॥
আম্রাশোকবনোত্তংসো মালতীকৃত শেখরঃ ॥
বীণা মৃদঙ্গ সংগীত কোকিলাশৃঙ্গ দূতকঃ ॥
ঝল্লরীবাদ্য সংঘুষ্টভাণ্ডাগারিক লেখকঃ ॥
পানমত্তাঙ্গনারূঢ়ো হিন্দোলাশ্চর্যমন্ত্রিমান্ ॥
দক্ষিণানিলগন্ধাঢ্যঃ কটাক্ষেক্ষিত বর্ষবান্ ॥
মহারাজাধিরাজো বা স্মরঃ প্রাপ্তো হরান্তিকম্ ॥
স পুষ্পচাপমাকৃষ্য মদনোন্মাদনং শরম্ ॥
চিক্ষেপ ত্রিপুরঘ্নায় সমাধের্ভঙ্গহেতবে ॥'……ইত্যাদি ।

[ভবিষ্যপুরাণম্—১৩৫ অধ্যায়]

'মহেন্দ্রধ্বজ মহোৎসব বর্ণনম্'

'পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মাদ্যৈরমরৈর্নৃপ ॥
বিজয়ার্থং মহেন্দ্রস্য ধ্বজযষ্টিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥
মেরোরুপরি সংস্থাপ্য সিদ্ধ বিদ্যাধরোরগৈঃ ॥
সা দেবী হর্চিতা নিত্যং ভূষণৈর্ভূষিতা স্বকৈঃ ॥
স্বচ্ছত্র ঘণ্টা পিটকৈঃ কিংকিণী বদ্ধ বুদ্বুদৈঃ ॥
তাং দৃষ্ট্বা দানবা নষ্টা ভয়াদেব রণে হতাঃ ॥
গতা রসাতলং দৈত্যা দেবাশ্চাপি দিবিস্থিতাঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি তাং দিব্যামিন্দ্রযষ্টিং যজন্তি তে ॥
দেবাঃ সর্বে গণাঃ সর্বে হৃষ্টাস্তুষ্টা যুধিষ্ঠির ॥
অতঃ স্বর্গং গতো রাজা ভূরিপুণ্যবশাদ্বসুঃ ॥
ইন্দ্রলোকে মহাভাগো বসুদেবৈঃ সুপূজিতঃ ॥
তস্মৈ দত্তা মহেন্দ্রেণ বসুযষ্টিঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥
পূজয়িত্বা মহাভাগ সর্বদৈত্যাপহৃত্তয়ে ॥
অবতার্য বর্ষাসময়ে সর্বৈর্নৃপতিভিঃ সহ ॥

মহ্যাং সম্পূজয়ামাস চক্রে চেন্দ্রমহং বসুঃ ॥
মহেন মঘবা প্রীতো দদৌ পুণ্যং বসোর্বরম্ ॥'

[ভবিষ্যপুরাণম্—১৩৯ অধ্যায়]

বেদ ও পুরাণের মধ্যে যেমন বর্ষাবসন্তাদি ঋতু-উৎসবের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমান, এবং এ উৎসবের অন্তরালে নরনারী বা দেবদেবীর নৃত্যগীতাদির মাধ্যমে জীবনে জয়প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিহিত, সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির বিচিত্র স্থলেও এই জাতীয় উৎসববৃত্তান্ত পরম সুলভ। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কবি কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখি রাজা দশরথ বসন্তঋতুর মনোজ্ঞ পরিবেশে 'বিলাসবতী' রমণী-পরিবেষ্টিত হয়ে দোলোৎসবে আত্মহারা। আবার সেদিনে মৃগয়াও রাজারাজড়াদের জীবনে বিলাসের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। রাজা দশরথ বসন্তসময়ে মৃগয়াযাত্রার জন্য সমুৎসুক। রাজার এই মৃগয়ারতির মূল প্রেরণা বসন্ত-প্রকৃতি।

'ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈ র্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥'
'অথ যথাসুখমার্তবমুৎসবং সমনুভূয় বিলাসবতী-সখঃ।
নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং স মধুমন্মধুমন্মথ সন্নিভঃ ॥'

[রঘুবংশম্,—নবম্ সর্গ, ৪৭-৪৮]

কবির শকুন্তলা নাটকেও বসন্তোৎসবের পরিচয় সুস্পষ্ট। সানুমতী—'কিং ণু কখু উদুচ্ছবে বি নিরুচ্ছবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই।'

স্থানান্তরে কঞ্চুকীর উক্তির মাধ্যমেও বসন্তোৎসবের নিদর্শন মিলছে।—

'কঞ্চুকী—মা তাবৎ, অনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্র-কলিকাভঙ্গং কিমারভসে।'

[অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—ষষ্ঠোঽঙ্কঃ]

অষ্টম শতকের কবি ভবভূতির 'মালতীমাধব', নাটকেও একাধিক স্থলে ঋতু-উৎসবের পরিচয় নিহিত।—

'মকরন্দ—বয়স্য! মাধব! অদ্যৈব তাবৎ সকল নগরাঙ্গনাজনপ্রবর্তিত মহোৎসবাভিরাম মদনোদ্যানযাত্রা প্রতিনিবৃত্তমন্যাদৃশং ভবন্তমবধারয়ামি।'

[মালতীমাধব—প্রথমোঽঙ্কঃ]

আবার স্থানান্তরে,

'অয়ং চ নববধূ গৃহপ্রবেশবিরচিতাকালকৌমুদী মহোৎসবপ্রবৃত্তিপর্যাকুলাশেষ পরিজনঃ প্রদোষোঽনুকূলয়িষ্যতি।'......ইত্যাদি।

[ঐ, সপ্তমোঽঙ্কঃ]

আনুমানিক দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতকে বিশাখদত্ত-বিরচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকেও 'কৌমুদী মহোৎসব' নামক ঋতু-উৎসবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।—

'রাজা—তৎ কথমপ্রবৃত্ত কৌমুদী মহোৎসবমদ্যাপি কুসুমপুরম্।—

ধূর্তৈরন্বীয়মানা রতিচতুরকথা কোবিদৈর্বেশনার্যো
নালং কুর্বন্তি রথ্যাঃ পৃথুজঘনভরাক্রান্তি মন্দৈঃ প্রযাতৈঃ।
অন্যোন্যং স্পর্ধমানা ন চ গৃহবিভবৈঃ স্বামিনো মুক্তশংকাঃ
সাকং স্ত্রীভির্ভজন্তে বিধিমভিলষিতং পার্বণং পৌরমুখ্যাঃ॥'

[মুদ্রারাক্ষসম্—কৃতককলহোনাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ, শ্লোক নং ১০]

শ্রীহর্ষদেবের আনুমানিক দ্বাদশ শতকের রচনা 'রত্নাবলী' নাটিকাখানিও এই জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের উজ্জ্বল সাক্ষ্য—

'কীর্ণৈঃ পিষ্টাত কৌ ঘৈঃ কৃতদিবসমুখৈঃ কুঙ্কুমক্ষোদগৌরৈ-
র্হেমালংকার ভাভির্ভরনমিত শিরঃ শেখরৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ।
এষা বেষাভিলক্ষ্যস্ববিভববিজিতাশেষ বিত্তেশকোশা
কৌশাম্বী শাতকুম্ভদ্রবখচিতজনেবৈকপীতা বিভাতি॥'

[রত্নাবলী—১ম অঙ্ক, শ্লোক নং ১০]

অপিচ

ধারাযন্ত্র বিমুক্ত সংততপয়ঃ পূরপ্লুতে সর্বতঃ
সদ্যঃ সান্দ্রবিমর্দকর্দমকৃতক্রীড়ে ক্ষণং প্রাঙ্গণে।
উদ্দাম প্রমদা কপোলনিপতৎ সিন্দুররাগারুণৈঃ
সৈন্দুরী ক্রিয়তে জনেন চরণন্যাসৈঃ পুরঃ কুট্টিমম্॥

[ঐ—শ্লোক নং ১১]

বেদ, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির অন্তরালে যেমন আর্য ও অভিজাত জীবনের নানা স্তরে বিচিত্র ঋতু-উৎসবের এমন অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, তেমনি অনার্য জীবনের পরতে পরতে এইজাতীয় নৃত্যগীতিময় উৎসবের ছড়াছড়ি। এ জীবনের ঋতু-উৎসবের পরিচয় আগেই আমরা মোটামুটি দিয়ে

এসেছি। মানবজীবনের যে স্তরে ঋতুর প্রকৃতিবিকৃতির মধ্যেই ছিল জীবনের সম্পদ ও বিপদ, বর্ষা-বসন্ত ও শরতাদির বিচিত্র রূপ ও লীলাকে নিয়ে যারা ঘরকন্না করত, সূর্য-চন্দ্র-মেঘ-বিদ্যুৎ ও আকাশ-বাতাস যাদের কাছে সহজ নরনারীর পরিচয়ে অবতীর্ণ হতো, তাদের জীবনে উৎসবের উৎসই ছিল প্রকৃতির চির-পরিবর্তনশীল রূপ ও লীলা। এ দিনের মত প্রকৃতি তখন শুধু উৎসবের ঠাটভাব বা বিলাস-ঐশ্বর্যের উপকরণ হয়েই ছিল না। এ দিনের উৎসবে ঋতু বা প্রকৃতির পালা পরম গৌণ, তার কোন প্রত্যক্ষ কথা নেই, সক্রিয় অংশ গ্রহণ নেই, সে যেন কতকটা উৎসবের বাড়তি অংশ।

কিন্তু সে দিনের উৎসব ছিল তাকে নিয়েই, তারই জন্যে। কারণ সে ছিল মানুষের আত্মার আত্মীয়। নিত্যকার ঘর-সংসারের মধ্যে সেকালে বর্ষাবসন্তাদির বিচিত্র মূর্তি ও স্ফূর্তির একটা বিশিষ্ট স্থানই ছিল। বর্ষার মেঘ, শরতের সূর্য, বসন্তের মলয় বাতাস, এ সবের মধ্যেই তারা আত্মীয়তার স্পর্শ খুঁজে পেত। সহজ কথায় মানুষের গৃহ-সংসারের আয়তন, আত্মীয়স্বজনের গণ্ডিটা ছিল কিছুটা সুবিস্তৃত। বৃক্ষলতা ও পুষ্পপল্লবের বিকাশ স্ফূর্তির সঙ্গে তাদের মানসস্ফূর্তির সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। 'আগ্নে বঃ কুসুম প্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ' কালিদাসের এ উক্তি সে দিনের মানুষের নিসর্গ দৃষ্টি সম্বন্ধে পরম সত্য ও যথার্থই বটে। বৃক্ষলতাদির পুষ্পফলপ্রসবে সত্যই মানুষ আপনার বিজয়-উৎসবের নৃত্যগীতে মেতে উঠত। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন শস্য ও ফলমূল কৃষিদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার আনন্দযজ্ঞ তাই ঋতুতে ঋতুতে, মাসে মাসে অনুষ্ঠিত হতো। আর উৎসবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতো নাচে ও গানে। তাই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে সেই অনার্য ও কৃষিসভ্যতার যুগ থেকে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের পর্বে পর্বে নৃত্য ও গানের মাধ্যমে ঋতু-উৎসব সংঘটিত হয়ে আসছে। ষড়ঋতু বা বারমাসীর গীতি ভারতীয় জীবনের সেই সনাতন ধারার ধারক ও বাহক, এ কথা অস্বীকার করবার নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকগীতি ও বারমাস্যা

গীতি মানবচিত্তের আদি ও সহজ ধর্ম। সৃষ্টির আদি কাল থেকেই পৃথিবীর সব দেশের মানুষই তার সুখদুঃখের সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটিয়েছে গানে। মানুষের আদি ভাষাই গান। 'The unlettered and untravelled people have both the desire and power to express themselves musically.'[1] মানবমনের সহজ ও সম্পূর্ণ প্রকাশ গানে। কথার মানুষ খণ্ডিত ও সীমিত। গানের মানুষ অখণ্ড ও সমগ্র।

সেই কৃষিসভ্যতার, নিসর্গলালনার যুগে প্রকৃতি রাজ্যের নিত্য নূতন বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য মানবপ্রাণে যোগাত নব নব ভাব, সুর ও ছন্দ। প্রকৃতি-ঘেঁষা মানুষের জীবনে নিত্য উৎসব, বার মাসে তের পার্বণের রটা-ঘটা ছিল বিপুল। আর নৃত্য ও গানই ছিল তার প্রকাশের অব্যর্থ মাধ্যম। প্রাণের মুক্তি ও স্ফূর্তি যেখানে যত অকপট ও অপর্যাপ্ত, সেখানে তার প্রকাশও তত গীতিময়। তাই সেই লোকায়ত জীবনে কথার চেয়ে গানেরই ছিল প্রাধান্য; সে যুগ ও জীবন একান্তই লোকসংগীতের যুগ ও জীবন।

লোকগীতি এই লোকজীবনের ভাব ও ভাষা, ছন্দ ও বন্ধের, ধর্ম ও কর্মের অদ্বিতীয় সাক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে এ গীতি সে দিনের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের বিচিত্র অভ্যাস-আচরণের একটি কাব্যময়, সুর ও ছন্দময় প্রকাশ।[2] এ গানের ছত্রে ছত্রে প্রাকৃত মানুষের নগ্ন মূর্তি প্রমূর্ত। এর সব কথাই সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। মার্গ সংগীতের সঙ্গে লোকগীতির এইখানেই পার্থক্য। মার্গ সংগীতের ভাষা যেমন মার্জিত, ভাবও তেমন সংস্কৃত; তার সুর ও ছন্দের শিল্পায়নও পরম আভিজাত্যপূর্ণ।

Encyclopædia Britannica.

'This is only an extension into verse of the habits of ordinary life.'—Verrier Elwin. *Folk-songs of Chhattisgarh* (Introduction).

মার্গ সংগীতের মূল্য মুখ্যতঃ শিল্পের বাজারে, লোকগীতির মূল্য প্রাকৃত চিত্তের দুয়ারে। মার্গ সংগীত মানুষের সংস্কৃত রুচির, সৌখীন মনের পরম সম্পদ। লোকগীতি প্রাকৃত মানুষের জীবনসঙ্গী। মার্গ সংগীত মানুষের সৃষ্টি, লোকগীতি যথার্থতঃ অবস্থার সৃষ্টি বা স্বয়ংসৃষ্ট। মনের হাটে বা অন্দরমহলে যার ক্রিয়া-কলাপ যতটা, লোকগীতির সমাদর তার কাছে ততটা।

ভারতীয় লোকগীতির অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য এর রূপক বা সঙ্কেত ধর্ম। আগেই উল্লেখ করেছি, সেই প্রকৃতিনির্ভর কৃষিসভ্যতার যুগে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প-পল্লব, মেঘ, বিজলী—এসবই ছিল মানুষের জীবনসাথী। এদের গতিবিধি, এদের বিচিত্র রূপ ও লীলা সে দিনের মানুষের জীবনে ছিল পরম অর্থবহ, একান্ত ব্যঞ্জনাময়। একালের মত এরা কেবল কবিকল্পনার উৎসই ছিল না; এরা ছিল পল্লীমানুষের নিত্যসহচর, প্রতিক্ষণের সঙ্গী—যেন পরস্পরের মধ্যে চোখাচোখি, কানাকানি এবং কত না ভাবের আদানপ্রদান চলত। প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতার ফলে সেই আদি পর্বের মানুষ কৃষি বা উদ্ভিদ জগতের, তথা আকাশ জগতের নানা মূর্তি, নানা লীলাবিকাশকে নরনারীর আসনে অভিষিক্ত করত। একান্ত মমত্ববোধ ও আন্তরিকতার ফলে মনুষ্যেতর জগতের এক অপূর্ব রহস্য ও ব্যঞ্জনা তাদের কাছে ধরা দিত, এবং তাদের নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবনের আলাপে-আলোচনায়, পারস্পরিক ব্যবহার-বিনিময়ে সেইগুলোই ছিল সহজ ও সার্থক মাধ্যম। ভারতের আদিবাসীদের সমস্ত লোকসাহিত্য ও সংগীতে এ পরিচয় আগাগোড়াই ছড়ান। মুণ্ডা জাতির সাহিত্যসম্পর্কে মনীষী হফ্‌ম্যানের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'The Mundas exhibit a marked predilection for clothing their ideas so completely in similies and symbols always taken from nature as it surrounds them, that an alien might understand every word of a song without as much as guessing what idea the song is meant to convey.'[3]

ভারতের সব অঞ্চলের আদিবাসীর জীবন প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত, তাই সে-জীবন-উদ্ভূত সাহিত্যও প্রতিপদে বিচিত্র রূপকে ও ইঙ্গিত সঙ্কেতে ভরা। এ রূপক এ কালের অলংকারশাস্ত্রাশ্রিত রূপক নয়। এর পিছনে

J. Hoffmann : *Mundari Poetry.*

বুদ্ধির ছলাকলাও নেই, পাণ্ডিত্য বা আলংকারিকতার ছোঁয়াও নেই। এ রূপকবোধ ও ব্যবহার, সে জীবনের সহজাত সম্পদ—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই এগুলোর ব্যবহার সহজ হয়ে উঠেছিল তাদের জীবনে ও সাহিত্যে। ভারতীয় লোকসাহিত্য বা সংগীতের পাঞ্জাব সংস্করণের কিছুটা নমুনা এ বিষয়ের স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুরোধে এখানে তুলে ধরছি—

'My youth was flourishing as flourish
the clouds in July.
Blooming youth encompassed me as a
garden encompasseth the gardener.
Now my youth is declining as a wall of sand
The millet is drying in the yard ; hear,
Raja Dhol,
The millet is drying up in the earth,
The princess is pining for her love, the wife
of Dhol for her husband.'[4]

আর্চার-বর্ণিত পাটনা জিলার চৌমাসী ঋতুসংগীতমালাও ভারতীয় লোকসংগীতের এই বিশিষ্ট ধর্মে পরম সমৃদ্ধ।—

'June is the month of parting, friend
The sky glowers with gloom
Leaping and reeling the god rains
And my sweet budding breasts are wet
All my friends sleep with their husbands
But my own husband is a cloud in another land.'[5]

লোকগীতির অপর বৈশিষ্ট্য, এ সাহিত্য জাতীয় জীবনের বিচিত্র স্তর, তাদের বিচিত্র বৃত্তি, ধর্ম ও কর্ম, তাদের নানা ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির

[4] R. C. Temple : *The Legends of the Punjab.*

[5] *Seasonal Songs of Patna District*, 'Man in India,' Vol. XXII (1942,-p. 233-37).

যথার্থ ধারক ও বাহক। কালের গতিকে সমাজের পরিবর্তন চলেছে প্রতিনিয়ত। কত ধর্ম, কত কর্ম, কত আচার, কত অনুষ্ঠান, কত বৃত্তি ও নীতিনিয়মের ভাঙনগড়ন চলেছে সর্বদাই। আর এই অনিবার্য রীতিনিয়মের চক্রে পড়ে কত জাতি, কত বৃত্তি, কত ধর্ম ও প্রথাপদ্ধতি আজ নিষ্পেষিত ও নিশ্চিহ্ন। লোকসাহিত্য লোকসঙ্গীতের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে জাতীয় জীবনের সেই অবলুপ্ত বা চিরম্লান রূপবৈচিত্র্য গাঁথা রয়েছে অক্ষয় অব্যয় হয়ে।

এ সঙ্গীতের অন্যতম উল্লেখ্য ধারা, এখানকার একই পদের, একই বাক্য বা বাক্যাংশের বারংবার আবৃত্তি। শুধু বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্য বলে নয়, তাবৎ লোকগীতিরই এ এক অন্যতম বিশেষ-লক্ষণ।

লোকসংগীতের এইজাতীয় আরও অন্যান্য যত লক্ষণ, একে একে প্রায় সবই ভারতীয় বারমাসী সাহিত্যে লক্ষণীয়। বারমাসী বলতে বোঝায়, ছয় ঋতু বা বার মাসের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে মানবমানবীর বিচিত্র ও বিশিষ্ট মানস স্ফূর্তি। পৃথিবীর সব দেশীয় সাহিত্যেরই এ এক আদি সাহিত্যিক ধারা। অন্যান্য লোকসাহিত্য ও সংগীতের মত বারমাস্যারও মূল পরিচয় একান্ত সহজ, সরল ও স্বভাবসঙ্গত। 'A Folk-song composes itself'—এ কথা আদি পর্বের বারমাস্যার ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও সুরে পরম সত্য ও সার্থক, প্রকৃতি ও মানুষে মেশামিশি হয়ে মানবমনের যেখানে সহজ মুক্তি, অবাধ স্ফুরণ, বারমাস্যা সেই অবারিত, মুক্ত মানবমনের সঙ্গীত। এখন যে রূপক বা প্রতীক ধর্ম লোকসংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, বারমাসী গীতে তার পরিচয় সন্ধান করছি।—

বারমাস্যা বা লোকগীতি যে সমাজ বা সভ্যতার সৃষ্টি, আগেই বলেছি, সে সমাজ বা সভ্যতা কৃষিনির্ভর। এ স্তরের মানুষকে উদরান্নের জন্য যেমন সর্বপ্রকারেই প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো, তাদের মানসরূপ বা পরিচয়ের মূলেও ছিল, প্রকৃতিরই নানা মূর্তি, নানা চিত্র এবং ভাব ও সুরেরই দান। তারা সূর্যচন্দ্রে কেবল জ্যোতি-জ্যোৎস্নাই দেখত না। তাদের দৈব মহিমাও তাদের দৃষ্টির মুখ্য আকর্ষণ ছিল না। মাটির মানুষ তারা। মাটিকে কেন্দ্র করেই আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্বরূপ ও স্বধর্ম নির্ণয় করত সেই মেঠো মানুষ। যে মাটি তাদের খাওয়াত পরাত, যে মাটিই ছিল তাদের ভাত-ভিত্তি, সেই মাটির অন্তরে স্ত্রীধর্ম, নারীবৃত্তির প্রকাশ তারা যেন প্রত্যক্ষই

করত। এ তাদের কল্পনা নয়, আজন্ম সংস্কার। তাই যে মেঘ ও বৃষ্টিধারার প্রভাবে মাটির মা তাদের যোগাত ফলমূল, বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সেই মেঘের মধ্যে পুংস্বের বা পুরুষত্বের ধর্মসম্পর্কে তাদের সংস্কার ছিল বদ্ধমূল। বারমাস্যা গীতির সর্বত্রই দেখা যায় মেঘসন্দর্শনে বা বর্ষাধারার আবির্ভাবে নারীচিত্তে জাগে বিরহবেদনা। বাইরে মেঘ ও মৃত্তিকার দাম্পত্য জীবনের লীলাসন্দর্শনে সমপ্রাণতার প্রভাবে গৃহমধ্যে নারীহৃদয়েও স্বামিসংসর্গের বাসনা স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠত। মাটির সঙ্গে মানুষের, মেঘ ও বর্ষার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-সম্পর্কের এই মানবিকতার জন্যই বারমাস্যার সর্বত্রই মেঘ অথবা বারিধারা পতিত্বের প্রতীক রূপে বিধৃত।—

'সাবন বরস মেহ অতি পানী। ভরণি পরী, হোঁ বিরহ ঝুরাণী॥
লাগ পুনরবসু পীউ ন দেখা। ভই বাউরি, কহঁ কন্ত সরেখা॥
রকত কৈ আঁসু পরহিঁ ভুই টুটী। রেঙ্গি চলীঁ জস বীর বহুটী॥
সখিন্হ রচা পিউ সঙ্গ হিণ্ডোলা। হরিয়ারি ভূমি, কুসুম্ভী চোলা॥
হিয় হিণ্ডোল অস ডোলৈ মোরা। বিরহ ঝুলাই দেই ঝকঝোরা॥
বাট অসুঝ অথাহ গম্ভীরী। জিউ বাউর, ভা ফিরৈ ভঁভীরী॥
জগ জল বুড় জহাঁ লগি তাকী। মোরি নাব খেরক বিনু থাকী॥
পরবত সমুদ অগম বিচ, বীহড় ঘন বনঢাঁখ।
কিমি কৈ ভেঁ টৌঁ কন্ত তুম্হ? না মোহি পাঁব ন পাঁখ॥'[6]

এখানে দেখছি, মেঘরূপ স্বামীর সাহচর্যে শুষ্ক ও রুক্ষ ধরিত্রীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচে ধরিত্রী ফলপ্রসূ বা উর্বরা হয়ে উঠেছে। কিন্তু নায়িকা নাগমতী আপন বিরহ-জ্বালায় ব্যাকুল।—

'শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা'

[গৌরাঙ্গ বারমাসী]

অথবা, 'দেখ ভেল শাওন মাস।
অব নাহিঁ জীবন আশ॥
ঘন গগনে গরজে গভীর।
হিয়ে হোয়ত যেও চৌচীর॥

[6] রামচন্দ্র শুক্ল-সম্পাদিত, জায়সী গ্রন্থাবলী (নাগমতী বিয়োগ খণ্ড) পৃঃ ১৫২।

হিয়ে হোয়ত যেও চৌচীর থির না বান্ধে মত্ত দাদুরী-রবে।
ঝলকে দামিনী খনে খনে যনু মদনশর বরখবে॥'

[ঘনশ্যামদাস—বিরহ বারমাসী]

আবার,

'আষাঢ়ে মেঘ ঘড় ঘড়ি
কেমন্তে বঞ্চিবি মুঁ ছার নারী গো
জীবন যাউছি ছাড়ি।'

[কুঞ্জবিহারী দাস—
বারমাসী, পল্লীগীতি সঞ্চয়ন,]

বারমাস্যার এই বর্ষার জীবনবর্ণন-প্রসঙ্গে সর্বত্রই কবিরা মেঘের এই পুরুষ-প্রকৃতি বা পতিধর্মটিকে সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে

'কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।'

'গর্ভাধানক্ষণ পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।'

কিংবা,

কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥

[মেঘদূত]

ইত্যাদি মেঘচরিত্রে লোকসাহিত্যের এই স্বরূপই পরিস্ফুট।

মেঘের এই পতি বা পুরুষ ধর্ম অনুভব, উপলব্ধির অন্তরালে সেই আদি সভ্যতা ও সমাজের পুরুষচরিত্রের চটুলতা ও যথেচ্ছাচারের ইঙ্গিত-সঙ্কেতটিও স্পষ্ট বলেই মনে হয়। আকাশের মেঘ নিয়ত চলমান, সদা গতিশীল। মেঘের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই নির্ভর ছিল তাদের জীবনের ভালমন্দ, উন্নতি-অনুন্নতি। তাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের স্বরূপ এই মেঘপ্রকৃতির রূপকেই তারা আপন স্বামীর পরিচয় খুঁজে পেত। মেঘের ভাসমানতাই তাদের স্বামিচরিত্রের ঔদাসীন্য বা চটুলতা-জনিত বিরহবেদনার উদ্রেক করত।—

'You are like a cloud
That wanders in the sky.
If you really loved me
You would sleep close beside my heart.'

W. G. Archer, *Seasonal songs of Patna Dist.* (Introduction) 'Man in India'.

লোকসংগীতের এই চিত্র বারমাস্যার বর্ষাবর্ণনার অন্তরে অন্তরে গ্রথিত—

'আসাঢ়ই ধুরি বাহুড়িয়া মেহ।
খলহলিয়া খাল নই বহ গঈ খেহ।
জইয়ি আসাঢ় ন আবই
মাতারে মইগল জেউঁ পগ দেই।
সদা মত্ওয়ালা জেউঁ ঢুলই
তিহি ঘরি উলগ কাই করেই॥'

[বীসল দেও রাসো—নায়িকা রাজমতীর বারমাস্যা।]

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, সেই আদিম সভ্যতার যুগে অথবা কৃষিসভ্যতার যুগে fertility-cult এবং sex-cult ছিল অভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ। মেঘের চরিত্রে এই উর্বরতাশক্তি নিহিত বলেই মেঘের সঙ্গে পুরুষধর্মের যোগ সহজ ও স্বাভাবিক। তাছাড়া, সেদিনের মানুষ প্রকৃতির অন্তর্জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল বলেই প্রকৃতির নানা রূপ, নানা মূর্তিকে তাদের স্বরূপ বা স্বধর্ম অনুসারে নারী বা পুরুষ রূপে চিন্তা করত। পুরুষপ্রকৃতির দৃঢ়তা, পরুষতা ও স্বাধীনতা বা স্বচ্ছন্দগতির দৃষ্টিতেও মেঘকে সে দিনের মানুষ পুরুষরূপেই চিন্তা করত, মনে করা যেতে পারে। কালো মেঘের অঙ্গে বিজড়িত ক্ষীণ অথচ শ্রীসৌন্দর্যমণ্ডিত বিজলীকে মেঘের বনিতার দৃষ্টিতেই দেখত তারা। আর বিদ্যুৎ-বিজড়িত মেঘের যুগ্মমূর্তি সন্দর্শনে বর্ষায় প্রোষিতভর্তৃকা স্বামিসমাগমের চিন্তায় আকুল হয়ে উঠত। বারমাস্যার প্রায় সর্বত্রই মেঘদম্পতীর আলেখ্য পরম উদ্ভাসিত।—

মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥

[কঙ্ক ও লীলা—ময়মনসিংহ গীতিকা]

শাওনে সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন-কণ্ঠ-বিলোল॥

[গোবিন্দদাস—বারমাসী]

আগিআ ভাদোঁ মহীনা
রাতাঁ কালীআঁ অন্হিআঁ,
উঠদে বদল বী কালে,
কড়কাঁ বিজলী দীআঁ পলআঁ।
আয়ন্ সাঁঈ দীআঁ রথাঁ
জিথে হোবেঁ তু কন্তা।
হুন পর মোড় মুহাড়াঁ
মার দরদাঁ নে লঙ্গআঁ।

[ভাই বীরসিংহ—পাঞ্জাবী বারমাস্যা]

কালিদাসের 'বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ' অথবা 'নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ' ইত্যাদি ছত্রে আদিপর্বের মানুষের ধ্যানকল্পনাই প্রমূর্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মানবসভ্যতার সেই আদিপর্বে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের নিত্যসহচর এই মেঘসম্পর্কে কল্পনা অবিকল এক ও অভিন্ন না হলেও কতকটা অনুরূপ কল্পনা অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যেও সক্রিয়। চীন দেশের আদি কবিতায় বহুত্ব বা অজস্রতা বুঝাতে মেঘের কল্পনা অত্যন্ত সুলভ।—

'Out side the Eastern Gate
Are girls many as the clouds ;
But though they are many as clouds.
There is none on whom my heart dwells
White jacket and grey scarf,
Alone could cure my woe.'

[Arthur Waley : *The Book of Songs*]

সেই কৃষি ও আরণ্য সভ্যতার যুগে কৃষিবৃত্তির সূত্রে মেঘ, বৃষ্টি ও আকাশ-বাতাস যেমন তাদের নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবনের আলাপ-আলোচনার, ভাববিনিময়ের রূপক বা সঙ্কেত রূপে ব্যবহৃত হতো, তাদের বন্য জীবনের সূত্রে বিচিত্র বন্য,

পশুপাখীও স্বভাবের সঙ্গেই এমনি রূপক সঙ্কেতের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছিল। কারণ প্রতিনিয়ত এদের সাহচর্যে থেকে এদের জীবনের ভালমন্দ, সুখদুঃখের সঙ্গে সেই অরণ্যচারী মানুষ নিজেদের জীবনকে জড়িত করেছিল একান্ত। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষা তাদের অজানা ছিল না। তাই বিভিন্ন লোকসংগীতের অনুরূপ ভারতীয় বারমাস্যারও নানা অংশে নারীজীবনের বিরহমিলনের ব্যথাবেদনা ও হর্ষ-স্ফূর্তি-প্রকাশের মাধ্যমরূপে তোতা, শারী অথবা পাপিয়া বা ডাহুক পাখীর চিত্র সন্নিবেশিত দেখা যায়। সমস্ত বারমাস্যাতেই আষাঢ়-শ্রাবণই বিরহজনিত পরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালরূপে চিত্রিত। বর্ষাগমে বা মেঘোদয়েই বিরহিণীর বিরহব্যথার উদ্রেক ঘটে, যেকথা—

'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনি জনে কিং পুন দূরসংস্থে।'

মহাকবির এই অমরবাণীতে অক্ষয় হয়ে আছে। আদিবাসীদের লোকসংগীতে শুক বা তোতা পাখীই বিরহিণী নারীর আসনে অধিষ্ঠিত, এবং বর্ষার বিরহবেদনায় পরম উৎকণ্ঠিত ও আত্মহারা।—

'O my love is on his way to the Honey City
He is flying to the Honey City.
Asadh has come covering the four quarters with
clouds
The lightning flashes in the clouds
The rains have filled the lakes and turned
The country into Brindaban.
How happily
We drink together the rainy water !'

[Verrier Elwin : Folk-songs of the
Maikal hills Song No.—76 Page 85]

বারমাস্যার কবিসমাজ বর্ষায় নারীচিত্তের বিরহজ্বালা-বর্ণনায় নানা ভাবে এই পক্ষীজীবনের রূপক বা সঙ্কেতটি ব্যবহার করেছেন।—

'পাপীয়া পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া ॥'

[গোবিন্দ চক্রবর্তী—বারমাসী]

Asin

'He sends me not a word
With my husband far from me
I moan on my bed
When the papiha cries
Absence burns me
When I fancy I hear my husband
My breast is split and I feel on fire.'

[W. G. Archer : *Seasonal songs of Patna District*, 'Man in India'.]

'আমি চাতকিনী-নারীর জন্মিছে পিপাসা।
কাদম্বিনী রূপে মোর পূর্ণ কর আশা ॥'

[ভবানীশঙ্কর দাস—সুশীলার বারমাসী, চণ্ডীকাব্য]

'চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥'

[রাধিকার বারমাস্যা]

'রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর ॥'

[কঙ্ক ও লীলা—ময়মনসিংহ গীতিকা]

'বৈহাগর মাহত ডাউকী কান্দয়।
ডাউকীর কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয় ॥
বৈহাগর মাহত কুলিয়ে করে বার।
কুলির কান্দন শুনি হুজুরাই গার ॥'

[মধুমতীর গীত—Asamiya Sahityar Chanaki, Vol. I]

'আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিস্‌সানে কাটে ধান।
কোড়া পাখীর কান্দনেতে শরীর কম্পমান॥
হেঁওয়া পাখীর কান্দনেতে পাঁজর কৈল শেষ॥
ডউকির কান্দনেতে মুঞ্‌এ ছাড়িনু বাপের দেশ॥'

[রংপুর জিলার কৃষকের বারমাসী]

খাঁটি বা আদি বারমাস্যার জগতের মানুষ এমনিভাবে অরণ্যের পশুপাখীর সমাজকে আপন সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছিল যে, তাদের সুখদুঃখ, বিচ্ছেদ-মিলনের কাল, ভাব ও ভাষা তখনকার মানুষের কাছে সহজেই ধরা পড়ত; আর সহানুভূতি পরবশ হয়ে তাদের সুখদুঃখের কালকে তারা নিজেদের জীবনেরও অনুরূপ হর্ষবিষাদ, বিরহমিলনের কাল বলেই মনে করত। নিজেদের জীবনের বিচিত্র অনুভূতিকেও এমন করে তাদেরই জীবনের রূপকে ব্যক্ত করত। প্রসঙ্গতঃ এই পক্ষিসমাজের জীবন থেকে বর্ষার সঙ্গে বিরহজ্বালার ঐকান্তিক সম্বন্ধের অন্যতম রহস্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি।—

'Of the relation between the male and the female birds it is said that the male only comes to the wife in Asadh and can only drink rain water. For the rest of the year the female bird is lonely and sings her song in tears. In Chait and Baisakh she cries "More Pihu" and in Jeth she says "Mai piasi hu" I am thirsty. Then with the coming of the rains comes the male bird and their happiness is fulfilled.' [Elwin : *Folk-songs of the Maikal Hills.*]

লক্ষ্য করবার বিষয়, এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার বহরটি। শুধু বিচিত্র পশুপক্ষী, মেঘবৃষ্টি, বা চন্দ্রসূর্যই যে সেকালের মানুষের কাছে নরনারীর বা নায়কনায়িকার প্রতীক ছিল, তা নয়; মানুষের এই আত্মীয়তা সামাজিকতার অনুভূতি বিচিত্র বৃক্ষলতা, ফল, পুষ্প ও মৎস্যাদি জলজীবের মধ্যেও প্রসারিত ছিল সমভাবে। নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নারীর চলন-বলন, বা বিচিত্র ভাবভঙ্গী ও বিলাস-বিভ্রম তারা অনায়াসেই সেই স্বভাবলালিত

দৃষ্টিতে নিসর্গ জগতের জীব ও জড় নির্বিশেষে নানাপদার্থ বা চরিত্রের মধ্যে অনুভব উপলব্ধি করতো। এই অনুভূতির বলেই তারা কপোতী, চাতকী অথবা রাজহংসীর মধ্যে যেমন রমণীধর্ম প্রত্যক্ষ করতো এবং রমণীর মনোভাব প্রকাশের সূত্রে এদেরই রূপকে তা ব্যক্ত করতো; আম, জাম বা কমলাদি ফল অথবা বিচিত্র পুষ্পের মধ্যেও তেমন উর্বরতাবাদের সূত্রে নারীচিত্তের চাঞ্চল্যকর বা কামোদ্দীপক প্রভাব খুঁজে পেতো।

Aghan

'When I am like a pomegranate
My husband is a cloud in another land
Now when the lemons and oranges are ready
My husband forgets me.'

(Seasonal Songs of
Patna Dist.)

আদিবাসীদের কোন কোন লোক-সংগীতের সঙ্গে পাটনা জেলার এই বারমাস্যা জাতীয় ঋতু-সঙ্গীতের অন্তর্গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়।—

'He saw ripe lemons on her tree
How could he control his hunger ?'

(Folk-songs of Maikal Hills
Song No—162)

সে জীবনে বৃক্ষলতাদির ফল পুষ্পোদ্‌গমে গৃহস্থের আভ্যন্তরীণ জীবনে নানা সম্ভোগময় আমোদ উৎসবের আয়োজন হতো, এবং নর-নারীর ভোগময় পারিবারিক জীবনের সঙ্গে বৃক্ষলতাদির জীবনের সফলতার এক আত্যন্তিক সংযোগ ছিল। বারমাস্যার নানা অংশে কখন রূপক বা সঙ্কেতের আকারে কখনও স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে সেদিনের এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নিহিত। উদ্ভিদ রাজ্যে অথবা পতঙ্গ-সমাজে যখন ভোগ-বিলাসের আয়োজন অপর্যাপ্ত,, তখন সে জীবনের দৃষ্টিতে বিরহী মানবচিত্তের ব্যথা বিড়ম্বনা কি নিদারুণ, বারমাস্যার বিচিত্র অংশ তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া'

একথা একালের মত শুধু সাহিত্যের কথা, গানের কথা ছিল না, এ জীবনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত আর্তনাদ।

বারমাস্যার মধ্যে এরই নমুনা দেখি এখানে-ওখানে-সেখানে—

নীরস সকল রামা মঞ্জরীত শাখী।
চূত পূগ পনসস্থত সম্ভ্রমে লোক সুখী॥
(মনসার বারমাস্যা—মনসা বিজয়, বিপ্র

নব মঞ্জু রঞ্জন পুঞ্জ রঞ্জিত চূত-কানন শোহই।
রস-লোল কোকিলা—কোকিল কুল কাকলী মন মোহই॥
*　　　*　　　*　　　*
মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল সুখ-পরবঞ্চিতা॥
(বারমাসী—গোবিন্দ চক্রবর্তী

আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাতুরীর নাদ।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ॥
মেঘের শব্দ শুনি ময়ূরের নাট।
কেমনে বঞ্চিব আমি নদী আর বাট॥
(বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ)

বারমাস্যা রূপ লোকগীতির পদে পদে এই জাতীয় রূপক বা সঙ্কেতময় বিচিত্র ভাবের ব্যবহার কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফল নয়। এর যাবতীয় ভাব ও রূপ, চিত্র ও চরিত্রের উৎস সেই জীবন।

অন্যান্য লোকগীতি ও বারমাস্যা

লোকগীতিকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন—কর্মগীতি, ধর্মগীতি, আনুষ্ঠানিকগীতি, ব্যবহারিকগীতি, প্রেমগীতি ইত্যাদি। সারি গান, বাইচের গান, ছাত পেটানোর গান এগুলো কর্মগীতি সংজ্ঞক। কারণ বিচিত্র কর্মসাধন উপলক্ষ্যে এগুলো গীত হয় এবং কর্মের সূত্রেই এদের জন্ম।

অনুষ্ঠানগীতি সম্বৎসরের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান (ritual) উপলক্ষ্যে রচিত এবং গীত হয়ে থাকে। যেমন, শিবের গাজন, ধর্মের গাজন ইত্যাদি।

ইংরাজীতে যাকে বলে professional song, ব্যবহারিক সঙ্গীত তারই প্রতিশব্দ।

বিচিত্র লোকগীতির এ জাতীয় পরিচয় ছাড়া আঞ্চলিকগীতি বলে এই সমস্ত লোকগীতির একটি বিশেষ পরিচয় আছে। আঞ্চলিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্টতা অনুসারে লোকগীতির আঞ্চলিক রূপ বা চরিত্র গড়ে উঠেছে। উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন লোকগীতির অধিকাংশই আঞ্চলিকগীতি। এমন কি, যে প্রেমগীতি সমস্ত লোকগীতির সার, তারও অনেকগুলো একান্ত আঞ্চলিক। যেমন, ভাওয়াইয়া গান। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন,—'ইহার বিষয়বস্তু প্রেম, কিন্তু ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেইজন্যই ইহা প্রেম-সঙ্গীতের অন্তর্গত হইলেও আঞ্চলিক সঙ্গীত।'

বারমাস্যা গীতের সঙ্গে এ জাতীয় অধিকাংশ লোকগীতির প্রথম ও প্রধান পার্থক্যই এইখানে। বারমাস্যা কোন আঞ্চলিকগীতি নয়। বিশিষ্ট কর্ম বা ধর্ম, বৃত্তি বা জীবনরূপ অনুসারে অন্যান্য গীতি-চরিত্রের ব্যাপকতা বা সর্বজনীনতার যে দৈন্য, বারমাস্যাগীতি সে দীনতা-মুক্ত। আবার প্রকাশভঙ্গিমায় যে আঞ্চলিকতা কোন কোন প্রেম-সংগীতের পক্ষে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রেম-গীতিরূপে বারমাস্যা সে ত্রুটিও বিমুক্ত। তাই বারমাস্যা সর্বভারতীয়, শুধু ভারতীয় নয়, সর্বদেশীয় ও সর্বজনীন গান।

দ্বিতীয়তঃ, বারমাসী একান্তই নারীজীবনাশ্রিত সঙ্গীত। নারীজীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা, কল্পনাদিই এ গানের মূল সুর, মর্মবাণী। অন্যান্য লোকগীতির কিছু কিছু পুরুষের কর্মময় জীবনের গান; আবার কিছু কিছু নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের কর্ম ও ধর্ম-সঙ্গীত। বারমাস্যা মুখ্যতঃ বা একান্তই নারীজীবনের ধ্যান-জ্ঞানের সুর-ভারতী। নারী-কথা এদেশের আদি ও অন্ত্যকার কথা। একান্ত নারী-জীবন-গান বলেই বারমাসীর আকর্ষণ বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

এ ছাড়া, বারমাস্যা-গীতি মুখ্যতঃ বিরহ-গীতি। মিলনের চেয়ে বিরহেই, সুখের চেয়ে দুঃখেই আমাদের জীবন ও সাহিত্যের প্রকাশ ও স্ফূর্তি। H. E. Krebiel-এর উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'The truest and the most intimate folk-music is that produced by suffering'.

এ জন্যেও অন্যান্য অধিকাংশ লোকগীতির তুলনায় বারমাস্যার আবেদন ও আকর্ষণ অধিকতর।

ছড়া ও বারমাস্যা : আমাদের দেশের ছড়াসাহিত্যও অনেক সময় সুর করে গাওয়া হয়ে থাকে। তাই আপাততঃ গীতি ও ছড়াসাহিত্য পৃথক ধারার হলেও ছড়াকেও লোকগীতি বলা চলে। বারমাস্যা সাহিত্যের কিছু কিছু ধর্ম ও লক্ষণ ছড়ার ভিতরেও নিহিত। বারমাস্যা গানের অন্তর্নিহিত নারীচরিত্র ও নারীজীবনের পরিচয় ছড়াসাহিত্যের মধ্যেও অমিল নয়। ছড়া ছেলে-ভুলানো সাহিত্য—শিশুজগতই এর লক্ষ্য। কিন্তু যে-সমাজ নারীপ্রধান, সে সমাজ-উদ্ভূত শিশুসাহিত্যের মধ্যেও নারীজীবন যে প্রাধান্য পাবে, তা বলাই বাহুল্য।

'পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥'...ইত্যাদি।

'তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥'...ইত্যাদি।

'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥'...ইত্যাদি।

বিচিত্র ছড়ায় এদেশের মেয়েদের জীবনের ব্যথা-বিড়ম্বনার কথাই ছড়ান। তবে বারমাস্যার অন্তর্নিহিত নারী আর ছড়ার অন্তর্নিহিত নারীজীবনের পরিচয় বিভিন্ন। একের নারী, বিরহিণী নারী, আর প্রেম বিরহ-প্রেম। তার দুঃখ বিরহ-দুঃখ। তার আর্তি আকূতি বিরহমূলক।

কিন্তু শিশুজগৎউদ্দিষ্ট ছড়ার নারীজীবনে দুঃখ-বিড়ম্বনা একান্তই আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার গলদক্রটিজনিত। এখানে বিরহিণী নারীর প্রেমমূর্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় না। ছড়ায় সমাজচিত্রই মুখ্য, নারীচিত্র গৌণ। মা-বোন, পিসী-মাসী, ঠাকুমা-দিদিমা—অর্থাৎ সাধারণভাবে স্নেহাধার, প্রেম-বাৎসল্যের নারীমূর্তিকে ছড়ায় আমরা দেখি, কিন্তু বিরহিণীর দিব্য-প্রেমসিক্ত মূর্তির পরিচয় এখানে দুর্লভ।

ছড়ায় ব্যক্তিচিত্র উপলক্ষ্য, সমাজচিত্রই লক্ষ্য। সহজ ও সার্থক বার-মাস্যায় ব্যক্তিই লক্ষ্য, সমাজ উপলক্ষ্য। ছড়ার সমাজ বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট। বারমাস্যার সমাজ সমগ্র ও সাধারণ। ছড়া চিত্রধর্মী, বারমাস্যা চরিত্রধর্মী। ছড়া-গীতির ভাবের অসংলগ্নতা বারমাস্যায় নেই; কারণ একটি শিশুমনের খোরাক, অপরটি প্রাপ্ত-বয়স্কের। ছড়ার জগতের বস্তু-সত্যের উপর একটা মায়া ও রহস্য-জাল বিস্তীর্ণ, বারমাস্যা অমায়িক সাহিত্য। তবে ছড়া-সাহিত্যের বর্ণ ও ভাব-বৈচিত্র্য বারমাস্যায় নেই। ছড়ার প্রকৃতি, ছড়ার আকাশ, শরৎ ও বসন্তের প্রকৃতি ও আকাশ, বারমাস্যার প্রকৃতি মুখ্যতঃ বর্ষা-প্রকৃতি, এখানকার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষার আকাশ। বারমাস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে জনৈক সাহিত্যিকের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করে এ ধারার উপসংহার করছি।

'ইংরাজী সনেট, বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যে চৌতিশা ও চৌপদীর মত এর স্বতন্ত্র আকৃতি ও প্রকৃতি আছে। অনুভূতি গাঢ় ও গভীর; প্রকাশ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায়। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ এতে সর্বজনীন ও সর্বকালীনভাবে ব্যক্ত। নারীর নিজস্ব স্মৃতির করুণরসে ঝঙ্কৃত, দুঃখময় জীবন অনুভব আশঙ্কায় আতঙ্কিত, মর্মরদাহের উষ্ণতা নির্জন সন্ধ্যায় একমাত্র বীণাঝংকারের করুণতা, সবুজ অন্তরের সজীবতা এতে রূপায়িত।'

তৃতীয় অধ্যায়

বারমাস্যার বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ

বারমাস্যার আকৃতিগত বিভেদ

বারমাসীগীতি স্থূলভাবে বারমাস বা ছয় ঋতুর পরিবর্তমান পটভূমিকায় মানব-মানবীর মানসরাজ্যের সুখ-দুঃখের কথা। কিন্তু বারমাস্যা-গীতি বলতে সর্বত্রই বারমাস বা ছটি ঋতুর পরিচয়ই যে থাকে, তা থাকে না। নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলনজনিত চিন্তানুভূতিই এর মর্মকথা। এ বিরহ বা মিলন কোথাও বারমাস, কোথাও আটমাস, কখনও বা ছ' মাস বা চারমাস কাল ব্যাপী। যেমন ষষ্ঠীবর দত্তের মনসামঙ্গল কাব্যে নায়িকা বেহুলার অষ্টমাসী—

'বৈশাখ মাসেত মাগো, লখাইয়ে বিয়া করে।
কাল রাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে॥'

ইত্যাদি বৈশাখ মাস থেকে, বিবাহের রাত্রি থেকেই অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, এই আটমাসব্যাপী বেহুলার জীবনের একটানা অসহ দুঃখ-যন্ত্রণা ও অশ্রুপাতের চিত্রই বেহুলার অষ্টমাসী বলে পরিচিত। এখানে মাসে আটমাস হলেও বারমাসী-গীতি বলেই এর পরিচয়। এমনিভাবে ময়মনসিং গীতিকার মলুয়ার অষ্টমাসী, বড়ুচণ্ডীদাসের রাধিকার বিরহ চাতুর্মাস্য, ময়মনসিং গীতিকায় লীলাবতীর ষান্মাষিকী গীতি—সবই বারমাসী-গীতিরই সগোত্র, এই নামেই এদের সাধারণ পরিচয়। সহজ কথায় বারোমাস বা ছয় ঋতুর কয়েকটা মাস বা ঋতুর চিত্র চরিত্র অবলম্বনে মানব-মানবীর আনন্দ-অশ্রুর আবেগ-উচ্ছ্বাসময় গীতিই বারমাস্যা।

হিন্দী সাহিত্যে নায়ক রত্নসেন ও নায়িকা পদ্মাবতীর সম্ভোগশৃঙ্গাররসের বারমাস্যায় মাসের পরিবর্তে কবি ঋতুর উল্লেখই করেছেন।—

'প্রথম বসন্ত নবল ঋতু আই'
'ঋতু গ্রীষ্ম কৈ তপনি ন তহাঁ'।
'রিতু পাবস বরসৈ, পিউ পাবা। সাবন ভাদোঁ অধিক সোহাবা॥'

ইত্যাদিক্রমে ষড়ঋতুর উল্লেখই বারমাসী নামে প্রচলিত। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া বা পাঞ্জাবী সাহিত্যের মত মাস বা ঋতুর ক্রমিক

বর্ণনসূত্রে এমনভাবে নায়ক-নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু প্রকৃতির বৈচিত্র সৌন্দর্য মাধুর্যময় রূপের অবতারণায় নায়িকাচিত্তের বিরহোদ্বেলতা সমভাবেই মূর্তি পেয়েছে। প্রকৃতির দুর্বার দুর্লঙ্ঘ্য হাতছানিতে নিসর্গলোকে প্রেমিকার মানসযাত্রা এখানেও সুস্পষ্ট। কাজেই পর্যায়ক্রমে বারমাস বা ছয় ঋতুর উল্লেখ না থাকলেও তামিল সাহিত্যে বিরহ-বারমাস্যার বিরহিণী নায়িকা চরিত্রটি অন্যান্য বিরহিণীর একেবারে সগোত্র। এখানকার নিসর্গ ও মানবজীবনের নিবিড় সম্বন্ধের আলেখ্যটি মনোজ্ঞ। তাই অন্তর্ধর্মে এ-চিত্রও বারমাস্যারই গোষ্ঠীভুক্ত। আঙ্গিকের কিছু ত্রুটি সত্বেও অন্তরের সমগোত্রতায় এ-কেও বারমাস্যা-গীতি বলাই সঙ্গত। তামিল সাহিত্যের মূল অংশ পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখানে প্রসঙ্গতঃ বারমাস্যার বিচিত্র রূপের অন্যতম রূপে তার কিছুটা ভাবানুবাদ তুলে ধরছি।—

'হে মেঘ, তুমি গম্ভীর গর্জনে আকাশপথে চলেছ। তোমার গর্জনে হিমালয় পর্যন্ত কম্পিত। অসহায় একাকিনী নারীর প্রতি তোমার কিছুমাত্র কৃপা নেই। তোমার এরূপ ব্যবহার মোটেই মহৎলোকের উপযুক্ত নয়। আকাশ ব্যাপ্ত করে যখন মেঘ বিস্তার লাভ করে, তখন সেই বিরহিণী নারী নির্জন নৈরাশ্যে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, হায়! আমি এই বিরহ-ব্যথা কি করে সহ্য করি!'

রাজস্থানী ভাষায় "বেলি সাহিত্য" নামক এক জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত "বেলি কৃষণ রুক্ মনীরী" নামক গ্রন্থে কৃষ্ণ রুক্মিণীর ষড়ঋতু বিহার বর্ণনা বারমাস্যারই এক বিশিষ্ট ধরণ।

তেলেগু ভাষার 'মনুচরিত্র' নামক গ্রন্থে নায়কপ্রবরের বিরহে প্রেম-মুগ্ধা বিরহিণী বরুথিনীর বিরহগীতিও ঠিক পর্যায়ক্রমে মাস বা ঋতু-কেন্দ্রিক নয়। তবে কখনও চন্দ্র, কখনও মন্দ-মারুত, কখনও বা মলয়-মারুতকে সম্বোধন করে এখানকার নায়িকার চিত্তবৃত্তির যে প্রকাশ, তাও অবিকল বিরহ-বারমাস্যারই অন্তর্নিহিত ভাবের অনুগামী। এখানেও নিসর্গ-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি পরস্পরের একান্ত কোল-ঘেঁষা। সুতরাং অন্তর্ধর্মে এ-কাব্যও বিরহ-বারমাস্যার পর্যায়ভুক্ত। *

এমনিভাবে ভারতীয় সাহিত্যের বারমাস্যা বলতে তার বিচিত্র আকৃতিগত বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।

---

* দৃষ্টান্ত গ্রন্থশেষে বারমাস্যা-সংকলনের মধ্যে দ্রষ্টব্য।

বারমাস্যার প্রকৃতিগত বিভেদ

ভাব বা প্রকৃতি অনুসারে ভারতীয় সাহিত্যের বিচিত্র বারমাস্যাকে নিম্নলিখিত রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।—

(ক) আদি বা মৌলিক।
(খ) মধ্যযুগীয় বা সাহিত্যিক।
(গ) আধুনিক।
(ঘ) আখ্যান বা বর্ণনামূলক।
(ঙ) ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যমূলক।
(চ) পূজা বা অর্ঘ্যমূলক।
(ছ) মিলনমূলক।
(জ) বিরহমূলক বা ভাবাত্মক।

(ক) আদি বা মৌলিক: যে-কোন শিল্প, সঙ্গীত বা সাহিত্য, মানুষের কর্মজীবন নির্বাহের সূত্রেই সব কিছুরই উৎপত্তি। জীবনধারণের অনুরোধে, অস্তিত্বের দায়ে পড়েই সব শিল্প, সব সঙ্গীতের উদ্ভব। সূক্ষ্ম শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ, কর্মের সম্পর্ক-বিমুক্ত উন্নত ধর্মবোধ, এ সব মানবজীবন ও সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উত্তরকালের কথা। ধর্মের জন্য ধর্ম, নিছক দেবপূজা বা আত্মিক আনন্দ লাভের অনুরোধে দেবার্চনা, লোকোত্তর ভাবসুরের আনন্দলিপ্সায় সঙ্গীত—আদিপর্বের ধর্ম, সাহিত্য বা শিল্পের মধ্যে এ সবের সম্পর্ক ছিল না। মানুষ তখন তাকেই বলতো ধর্ম, যা তার কর্মের পক্ষে ছিল পরম সহায়ক; তাঁরাই ছিলেন তার দেবদেবী, যাঁরা তার খাওয়া-পরা বা কর্মজীবনের ছিলেন পরম সহায়ক। সহজ কথায় সভ্যতার আদিপর্বের মানুষ মূলতঃ দেহ-ধর্মী, বিষয়-প্রাণ। তার বিষয়গত জীবনের কল্যাণ-মঙ্গল ও উন্নতি-উৎকর্ষের সূত্রেই তার সঙ্গীত ও সাহিত্য, ধর্ম ও কর্ম। তাই আদি-সঙ্গীত কৃষি-নির্ভর মানুষের কৃষি-সঙ্গীত; আদি দেবতা চাষবাসেরই দেবতা—আদি শিল্প ও সাহিত্য, কৃষি-শিল্প ও কৃষি-সাহিত্য।

এই সত্যের দৃষ্টিতে বারমাস্যা গীতি-মালার যেগুলো কৃষি-বারমাস্যা, সেইগুলোই নিঃসন্দেহে আদিপর্বের বারমাস্যা। বারমাস্যার অন্তর্গত যে দেবপ্রকৃতির পরিচয় একান্তই কৃষিগত পরিচয়, সেইগুলোই আদিপর্বের জিনিস। অবশ্য কালক্রমে

বারমাস্যার রচনা একান্ত প্রথাগত বা গতানুগতিক হয়ে উঠেছিলো। কাজেই সেকালের রূপ রীতি বাঁধাধরা পথ ধরে একালেও অনেক সংক্রামিত হয়েছে। তবুও ভাষা ও ভাবের আদিরূপ ও পরিচয়ে, লোকায়ত ধর্ম, বিশ্বাস সংস্কারের দৃষ্টিতে বারমাস্যার অনেকগুলোকে আমরা অনেকটা জোর করেই একান্ত প্রাচীন বলে চিনে নিতে পারি। কবির কাল-পরিচয়ও কতকটা এর সাক্ষ্য, সন্দেহ নেই। এমনিভাবে কৃষি-বারমাস্যা অথবা কৃষকের দেবতা শিবের কৃষি-বারমাস্যাকে আমরা বারমাস্যার আদি বা মৌলিক রূপ বলে ধরে নিতে পারি।

(ক) আয়রে তরা ভুঁই নিরাইতে যাই।
ভুঁই মো গো মাতাপিতা ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ॥

(চিত্তরঞ্জন দেব—পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ)

(খ) প্রথম অগ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান।
কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান॥
যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়।
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখ চায়॥

(রংপুর জেলার কৃষকের সঙ্গীত)

(গ) যতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল।
চাষ চষিয়া গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল॥···ইত্যাদি

(শূন্যপুরাণে শিবের গান)

সভ্যতার আদিপর্বে যখন 'ভুঁই মো গো মাতাপিতা ভুঁই মোর গো পুত' এইভাবে মানুষ কৃষিকেই জীবনের যথাসর্বস্ব জ্ঞান করতো, এ চিত্র সেই পরম কৃষি-নির্ভর যুগেরই।

এ ছাড়া, বারমাস্যার বর্ণনায় যেগুলোতে মুখ্যতঃ কৃষি-উৎসবের মুখরতা অতি প্রকট, সেগুলোকেও মোটামুটিভাবে বারমাস্যার প্রাচীন গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত করা সংগত বলে মনে হয়। উড়িয়া সাহিত্যের বারমাসী খান্ত, ময়মনসিং গীতিকার লীলা বা সুনাইর বারমাসী অথবা মলুয়ার অষ্টমাসী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষা এদের প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

এদের প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বিজড়িত এদের মৌলিকতা ধর্ম। লোক-সঙ্গীত যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজভাবেই কর্মরত মানুষের মনে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, তার ভাষা, ভাব ও ছন্দ যেমন অনায়াস-সম্ভূত, এ জাতীয় বারমাস্যা সেই সহজ ও সার্থক লোকসঙ্গীতের ধর্মসমন্বিত। এদের ভাষা অশিক্ষিত, প্রাকৃত মানুষের সহজ প্রাণের ভাষা; এদের ভাবও অযত্ন-সম্ভূত, একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত। তাই বারমাস্যা হিসাবে এদের আমরা মৌলিক বারমাস্যা আখ্যা দিতে পারি। এগুলো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টির পরিবর্তে কতকটা স্বয়ং-সৃষ্ট বললে মনে হয় এদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের শিল্প-সৌন্দর্য নগণ্য, কিন্তু এরা স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় অতুলনীয়।

(খ) মধ্যযুগীয় বা সাহিত্যিক বারমাস্যাঃ কালক্রমে এই কৃষি-বারমাস্যা বা আদিপর্বের বারমাস্যারই নিদর্শনে বৈষ্ণব সাহিত্যে, শাক্ত সাহিত্যে, শৈব সাহিত্যে এবং ভারতের বিচিত্র ভাষার নানা অভিজাত সাহিত্যেও আমরা এদের মার্জিত, সংস্কৃত ও শিল্পসম্মত রূপ প্রত্যক্ষ করি। কাল পরিচয়ে এগুলো অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উদাহরণস্বরূপ বৈষ্ণব পদাবলী বা চরিত সাহিত্যের অন্তর্গত বারমাস্যাগুলো উল্লেখযোগ্য। পদসাহিত্যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর—

'মুকুল-পুলকিত বল্লীতরু অরু চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল-সুখ-পরবঞ্চিতা॥'

অথবা

'পাপীয়া পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া॥'

ইত্যাদি বারমাস্যার চরণে সেই আদিবাসীদের সহজ লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত ভাব-সংকেত থাকলেও এর ভাষা, এর ছন্দ, এর অনুপ্রাসাদি অলংকারের পারিপাট্য, এক কথায় এর উন্নত শিল্প পরিচয় একে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু আদিপর্বের স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে বিলুপ্ত।

বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের—

'শাওন সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন-কণ্ঠ-বিলোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর-নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ॥'

অথবা

পদকর্তা বলরামদাস বিরচিত—

'কত ঘন-চন্দন কত কত বীজন সজল জলদ-বিষ-শংকা।

জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বাড়বানল পিয়া দূর বিহি ভেল বঙকা ॥'

ইত্যাদি বারমাস্যা-গীতি লিরিক-ধর্ম-সমৃদ্ধ, সাহিত্যগুণে অলংকৃত। আদিপর্বের মৌলিক বারমাস্যার গ্রাম্যচরিত্র এখানে অনুপস্থিত। এমনিভাবে বারমাস্যাকে মৌলিক ও সাহিত্যিক, স্থূলভাবে এই দুই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন মনে হয় না। মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু বারমাস্যা, বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের বারমাস্যা এই দৃষ্টিতে সাহিত্যিক বারমাস্যা আখ্যার যোগ্য। কারণ শিল্পী বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিমনের রঙ ও ঢঙ এসব বারমাস্যার ছত্রে ছত্রে অনুস্যূত হয়ে আছে।

সেই সভ্যতার আদিপর্বে কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের কেকা—এসব মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের নানা ইঙ্গিত, সংকেত এনে দিতো। তাই আদিবাসীদের লোকগীতিতে এদের প্রসঙ্গ আগাগোড়াই ছড়ান। বৈষ্ণব সাহিত্যের শিল্পী-কবি এবং ভারতচন্দ্র প্রমুখ মঙ্গলকাব্যের পণ্ডিত ও শিল্পী-কবির বারমাস্যাতেও সে ইঙ্গিত, সংকেতের অভাব নেই। কারণ এবিষয়ে তাঁরা পূর্বসূরীদের অনুগামীমাত্র। কিন্তু মূল সুরের যত মিলই থাকুনা কেন, এঁদের রচনায় আসলে শিল্প ও কলা-কৌশলগত কারিগরির দিকটাই মুখ্য আকর্ষণ। তাই এগুলো সহজ বা মৌলিক বারমাস্যা আখ্যার পরিবর্তে সাহিত্যিক বারমাস্যা আখ্যারই যোগ্য।

ভাব ও ভাষায় তথা অন্তঃপ্রকৃতিতে আদি ও মধ্যযুগীয় বারমাস্যার এই জাতীয় পার্থক্য ছাড়া বারমাস্যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটি বিশেষ রহস্য এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য মনে হয়। বারমাস্যার অনেকগুলোতেই মাগশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসকেই বৎসরের প্রথম মাস রূপে গণনা করা হয়েছে। যেমন ভাগবতে গোপিকার বারমাস্যায়,—

'পাইল অগ্রাণ মাসে নবীন পীরিতি।

কাত্যায়ণী ব্রত করি পাইল কৃষ্ণপতি ॥'

রংপুর জিলার কৃষকের বারমাসীতে—

'প্রথম অগ্রাণ মাসে নয়া·হেউতি ধান।

কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান ॥'

আসামী সাহিত্যের কন্যাবারমাহীতে—

'আঘোণর মাহতে কন্যা সংসারে নবান ধান।
কতেক খাইতে মধু কতেক পুরাণ॥'

আবার একই সাহিত্যের মধুমতীর বারমাহী গীতে আছে—

'অঘোণর মাহতে না কাটিলা পাত।
খাবলৈ না পালা প্রভু নবান ধানর ভাত॥'

উড়িয়া সাহিত্যের (কেউঝর) অঞ্চলের বারমাসীতে দেখি—

'অন্ত মগুশূর হেলা
একালরে কান্ত বিদেশ গলা গো বিদেশ গলা
সুনা দেহ চুণা কলা।'

ঐ সাহিত্যের অন্তর্গত 'পদ্মতোলা বারমাসী'তে আছে,—

'আন্ত যে মগুশির বহিলা শিশির কংসর ছএল।'

এবং

এরই 'দোলি বারমাসী'তে—

'আন্ত মগুশির হেলা, যুবাকালে কান্ত বিদেশ গলা লো;
আমকু অনাস্থা কলা।'

'হলি আ বারমাসীতে'ও একই পরিচয় লক্ষণীয়—

'আন্ত মার্গশির মাস হোইলা প্রবেশ,
পিতা সত্য পালি রাম গলে বনবাস।'

এই যে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বারমাস্যায় অগ্রহায়ণকে দিয়ে বৎসরের সূচনা করা হয়েছে, এটি আমাদের আর্য-সভ্যতা সংস্কৃতির এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্যোতক বলে মনে হয়। শ্রীভাগবতের মধ্যে স্বয়ং ভগবান যে বলেছেন,—'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্‌' এবং বাংলাদেশে এই মার্গশীর্ষ মাস যে অগ্রহায়ণ অর্থাৎ হায়ণের অর্থাৎ বৎসরের অগ্র বা প্রথম মাস বলে অভিহিত করা হয়েছে, এ থেকে যেন মনে হয়, এদেশে কোনকালে অগ্রহায়ণই বৈশাখের পরিবর্তে বারমাসের প্রথম মাসরূপে গণ্য ছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্রের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ না করে পারা যায় না। তিনি লিখেছেন—'ঋগ্বেদের কালে হিমবর্ষ ও শরৎবর্ষ এই দুইটি বৎসর ছিল। অগ্রহায়ণ মাস শরৎবর্ষের প্রথম মাস ছিল, এবং দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া শরৎ ঋতুর প্রথম মাস গণ্য হইত।'

আমরা উপরে গোপিকার বারমাস্যায় অগ্রহায়ণে গোপীগণের যে কাত্যায়ণী ব্রতের পরিচয় পেয়েছি, এই কাত্যায়ণী বা দুর্গার ব্রতোৎসবও দুর্গোৎসবের মত শরৎঋতুর উৎসব বলেই মনে হয়। কাজেই যেহেতু সুপ্রাচীনকালে অগ্রহায়ণই বৎসর আরম্ভের কাল বা মাস বলে গণ্য ছিল, সেইজন্য এ জাতীয় বারমাস্যাগুলো ভারতীয় কৃষ্টির প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক এবং এগুলো প্রাচীন বারমাস্যার ধারাভুক্ত, একথাও যুক্তিসঙ্গত, বিচারসম্মত, মনে হয়।

(গ) আধুনিক বারমাস্যা: সাহিত্যে বারমাসী বলতে মূলতঃ ও মুখ্যতঃ আদি ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিচিত্র ভাষার গীতিকেই বুঝায়। সে যুগের প্রথাবদ্ধ সাহিত্যে বারমাসী-গীতি একটা অঙ্গবিশেষ। কিন্তু উনবিংশ বিংশ-শতকেও সাহিত্য সৃষ্টির এ ধারাটি যে অবলুপ্ত নয়, যুগসুলভ সংস্কার মার্জনা নিয়ে আজও এটি সমভাবে বিদ্যমান, এর পরিচয় প্রতিষ্ঠার অনুরোধে একালের কিছু কিছু বারমাসী-গীতির নমুনা উদ্ধৃত করছি।

আগেই বলে রাখি, একালের বারমাসী না চাষীর জীবন-গান, না সেদিনের গতানুগতিক প্রেমগীতি। নায়ক-নায়িকার মিলন বা বিরহাত্মক প্রেম-চিত্র একালের বারমাস্যার মধ্যেও আছে। কিন্তু সেদিনের জীবনাশ্রিত বারমাসে-তের পার্বণের ছড়া-কাটা, ধরা-বাঁধা পরিচয় বিবরণ এখানে লক্ষ্য হয় না। সেদিনের 'রথযাত্রা', 'জন্মাষ্টমী', 'কার্ত্তিক ব্রত', 'বনদুর্গার পূজা', ত্রিদশের পূজা' —এ-কালের বারমাস্যায় এদের স্থান নগণ্য। কারণ এ জীবনে সেকালের এই বিচিত্র লোকধর্মের কঠিন অনুশাসন কতকটা শিথিল।

দ্বিতীয়তঃ, একালের সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভাত্মক শৃঙ্গাররসের বারমাসী-গীতি কোন অলৌকিক বা পৌরাণিক চরিত্র-আশ্রিত নয়। অর্থাৎ এখানকার নায়ক বা নায়িকা সেদিনের মত কোন বিশিষ্ট চরিত্র নয়, অবিশিষ্ট চরিত্র।

তৃতীয়তঃ, এ যুগের অন্যান্য সাহিত্যের মত বারমাসী-গীতি সাহিত্যও কবির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চিন্তা ও ধ্যানের রঙে একান্ত রঞ্জিত। মধ্যযুগীয় বারমাসীর মত কেবল শিল্পগত বিশিষ্টতাই বিভিন্ন কবির বারমাসীর পরিচয়সূত্র নয়, এখানকার দৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য বৈষম্যও উল্লেখযোগ্য।

'শরতের দিনে প্রভু ছাড়িতে কি পারি কভু?
বিশ্ব গায় মিলনের গান,

কোটরে নিকুঞ্জে নীড়ে নীরে তীরে গিরিশিরে,
কোথাও না বিরহের নাম।'

কিংবা

'শেফালি পড়িবে ঝরি, আমি বা কাহারে ধরি ?
দূর্বাসম হবে মোর দশা।
নয়ন-কমলে মোর দলিবে নীহার-লোর
হিমে কান্ত একান্ত ভরসা।'
('চির-মিলন'—ঋতুমঙ্গল, শ্রীকালিদাস রায়)

এখানে কবি-চিত্তের অপরতন্ত্রতা, দৃষ্টিভঙ্গীর লৌকিকতা ইত্যাদি আধুনিক বারমাসীর যে বিভিন্ন বিশিষ্টতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, একে একে তার সবই লক্ষণীয়। সহজ কবিত্বের কথাটি এখানে অবশ্য স্মরণীয়।

আধুনিকতার চিত্ররূপে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বিরচিত বারমাসীরও অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার্য মনে করি।—

'শিশির পরশে যবে ঝ'রি পড়ে দোপাটির দল,
অরুণ-কিরণ ভুলি রাতের তিমির-বনবাসে ;
শেফালি মেলিয়া আঁখি, সকাতর উষার আকাশে,
সমবেদনায় ভরি' আপনি লুটায় ধরাতল।
তাদেরি চোখের জলে ভিজিল কি তৃণের আঁচল ?'
(মধুমালা পুস্তিকা—১৩৪৩)

এই জাতীয় শৃঙ্গাররসাত্মক বারমাসীর চিত্রে যেমন আধুনিকতার বৈলক্ষণ্য লক্ষণীয়, কবি যতীন্দ্রনাথের 'পথের চাকুরি' শীর্ষক কবিতায় আধুনিক বারমাস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'জ্যৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা-বিকল,
ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাইসিকল'।
শুকায় সরিৎ কূপ,
ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ,
ডানে বাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাই নাই জল।

আমি কি করি ?
যত মোড়লে ধরি ;
হেঁকে কই শুন সবে—
এ গাঁয়ে ইঁদারা হবে,
কত চাঁদা দেবে ?'—মোর এই চাকুরি !

(মরীচিকা কাব্য—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

লক্ষ্য করবার বিষয়, মধ্যযুগের বারমাসী-গীতি মুখ্যতঃ নারীজীবনের বিরহ-মিলনের গান। নারীজীবন বার-ব্রত ও পূজা-আচারের জীবন। তাই সেদিনের বারমাসের পরিচয় প্রধানতঃ নারীজীবনাশ্রিত বিচিত্র ব্রত, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানেরই ইতিহাস। কিন্তু এ-যুগ কৃষিজীবীর সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী-জীবীর যুগও বটে। আর এ কবি গণজীবনের প্রতিনিধি কবি। তাই কবি সেনগুপ্তের এ বারমাসী কর্মপ্রাণ পুরুষ-জীবনের কর্মগীতি ; ভাব-প্রাণ, ধর্ম-প্রাণ নারীজীবনের ধর্ম বা প্রেমগীতি নয়। এর ভাব ও সুরে যুগান্তরের জীবন পরিস্ফুট।

কবি নৃত্যকৃষ্ণ বসু বিরচিত 'প্রেম-লিপি' শীর্ষক বারমাসী আধুনিক বারমাস্যার এক বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন।—

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পকবাসে বসন্তের বাসর ভবন,
লবঙ্গ কলিকাঘ্রাণে লালস বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি শিহরিবে মৃদু সমীরণ,
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন
অজ্ঞাতে নয়ন-জলে ভাসিবে নয়ন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন !···ইত্যাদি।

(কাব্য-দীপালি—শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত)

এখানে বারমাসে প্রকৃতির রাজ্যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় পূর্ণসৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবি পূর্ণ সুন্দর পরম পুরুষের আরাধনায় আত্মহারা। এখানকার প্রেমদৃষ্টি একান্ত সমুন্নত ও বিশ্বজনীন। আদি বা মধ্যযুগের প্রচলিত বারমাস্যার তুলনায় এর চরিত্র বা ধ্যান একেবারেই স্বতন্ত্র এবং পরম সমৃদ্ধ।

অতি সম্প্রতি 'বসুধারা' পত্রিকায় শ্রীযুত তুলসীদাস সিংহ মহাশয় 'পল্লীর বারমাস্যা'র যে চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তারও মর্মগত নবীনতা ও আধুনিকতা লক্ষণীয়। সিংহ মহাশয় বৈশাখ থেকে সুরু করে মাসের পর মাস এদেশের পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখময় নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার এক সুপ্রশস্ত ও মনোজ্ঞ আলেখ্য রচনা করেছেন। সেকাল ও একালের গ্রাম্য জীবনের দুই স্বতন্ত্র চিত্র এখানে সুস্পষ্ট। এ বারমাস্যাও আদি বা মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ বারমাস্যারই বিংশ-শতকীয় সংস্করণের পরিবর্তে একেবারেই নতুন বস্তু—একেবারেই ভিন্ন এর দৃষ্টি ও আদর্শ। এ ধারার অতি বিস্তারের আশংকায় এর নমুনা উদ্ধার থেকে নিবৃত্ত হ'লাম।

(ঘ) আখ্যান বা বর্ণনামূলক : বারমাসীর কতকগুলো নিছক বর্ণনামূলক। কাহিনীবর্ণনা বা ঘটনাচিত্রণ ছাড়া এগুলোর মধ্যে কোন ভাব বা রস পরিবেষণ নেই। মানব বা নিসর্গ জীবনের বিচিত্র রূপ, রঙ ও রসের জোগানও এখানে একান্ত নগণ্য। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার বারমাস্যা এই জাতীয় বারমাস্যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এ বারমাস্যায় আগাগোড়াই মনসা ও চাঁদসওদাগরের দ্বন্দ্বের সহজ বর্ণন ছাড়া ভাবের রঙ, কল্পনার বিলাস-বিভ্রম, রূপকের ছটা কোথাও নেই—কাহিনীমূলক মনসামঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ততম পরিচয় মাত্র, এ বারমাস্যা।

পূর্ববঙ্গের কৃষকের জীবনের বারমাসী-গীতিও এই একই পর্যায়ভুক্ত।

> পৌষমাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়।
> মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়॥
> ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ।
> বৈশাখেতে চিক চিহিনী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ॥…ইত্যাদি।

এ গীতি বিভিন্ন মাসে চাষ-আবাদের বিচিত্র রূপ ও পদ্ধতির এক স্বভাব-সিদ্ধ বর্ণনা মাত্র।

উড়িয়া সাহিত্যে বারমাসী খাদ্যের বর্ণনাও স্থূলতঃ এই বর্ণনধর্মী বারমাস্যা।

> পুষ মাসে মূলা মুড়ি খাই বাকু মিঠা
> ঘন আউটা পাট-কপুরা চকটা, পোড় পিঠা।
> মাঘ মাসে মকর মিঠা কেটুতলে সিম্।
> ফগুণে দ্বিগুণ মিঠা বাইগণে নিম্।…ইত্যাদি।

এখানেও কবিত্বের স্পর্শ বিশেষ কিছু নেই। নিসর্গ বা মানবজীবনের কোন উপভোগ্য বাণী-চিত্র এখানে স্পষ্টতঃ ফুটে ওঠেনি। তবে এই গীতির সম্পর্কে বলবার এই যে, ভারতের প্রাচুর্যময়, সরস জীবনের অনেকখানি সংকেত এখানে নিহিত। বাংলাই হোক, আর উড়িষ্যাই হোক, বিহারই হোক, আর আসামই হোক, সেদিনের সারা ভারতই ছিল লক্ষ্মীর নিত্য-উৎসব, নিত্য-মেলার ক্ষেত্র। তেলে-ঝোলে, মাছে-মাংসে, মোণ্ডা-মেঠাইতে জীবনের সে কি এক চমক ও জমক!

উড়িয়া সাহিত্যের 'শীত ছ-মাসীর' বর্ণনাও বারমাসী গীতের এই ধারার অন্তর্গত।

কাত্তিকি শীত আসে রাতি কি।
মগুশিরি শীত করে সিরি সিরি।
পুষ শীত করে ভুষ্ ভুষ্।
মাঘ শীতর বড় রাগ্।
ফগুণ শীত করে দ্বিগুণ।
চইত শীত যাই বোইত।

শীতের এই বর্ণনায় কোন ভাবের ঐশ্বর্যলালিত্য লক্ষ্য করা যায় না। এ বর্ণনা একান্ত গ্রাম্য ও মেঠোই বলতে হবে। কিন্তু তবুও একটা কথা এখানে না বললে নয় যে, যে জীবনের পরিচয় এ বর্ণনার অন্তরালে নিহিত, তা প্রাণ-ধনে দীন নয়। তখন জীবনে ছিল বিচিত্র রঙ, রূপ ও রস। তাই এক শীত-ঋতুর একান্ত এক-ঘেয়ে নীরস রূপকে নিয়ে তাদের কতই না রঙ্গরস, মনের কত না বিলাস! বলিষ্ঠ-প্রাণ মানুষের হাতে শীত ও শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে।

বিরহিণী নায়িকার বারমাসী-গীতি চিত্রের অন্তরালে যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, যে জড় ও জীবের, রূপ ও অরূপের বিরাট কল্পনা বিধৃত, এজাতীয় বর্ণনামূলক বারমাস্যায় তার কোন চিহ্নই নেই। বিরহ-দগ্ধ প্রেমই মানবচিত্তে জাগায় ভাবের রোমাঞ্চ, নব নব ধ্যান ও চেতনার উন্মেষ। রূপ ও অরূপের, সান্ত ও অনন্তের মিলন-সেতু গড়ে তোলে প্রেম। তাই বারমাসী-গীতির মধ্যে প্রেমাত্মক, বিশেষ করে, বিরহ-প্রেমমূলক গীতি-মালাই ভাবধর্মী, লিরিক জাতীয় কবিতা। পূর্বোদ্ধৃত সমস্ত বারমাস্যাই এই দৃষ্টিতে একান্ত বর্ণনা-ধর্মী।

(ঙ) ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যমূলক বারমাসীঃ বারমাস্যা মালার কতকগুলি একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যমূলক। মঙ্গল-সাহিত্যে ফুল্লরা, খুল্লনার বারমাসী ও বেহুলার অষ্টমাসী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উড়িয়া সাহিত্যে হলিয়া বারমাসীতে বনবাসগত পুত্র রামচন্দ্রের বিরহে বাৎসল্য-বিধুর মাতা কৌশল্যার করুণ ক্রন্দনের আলেখ্য প্রমূর্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতার বারমাস্যা বা লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত সীতার বারমাসীতেও বারমাসে সীতার জীবনের বনবাসজনিত দুঃখ-দুর্দশাই মূর্তি পেয়েছে।

এ জাতীয় বারমাস্যার স্থলবিশেষে পতিবিরহজনিত মানস অস্বস্তির আভাসও লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

'অনশন ব্রতকরি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি ॥'

এখানে প্রোষিতভর্তৃকা খুল্লনার বিরহ-জ্বালা আছে বটে, কিন্তু বিরহ-ব্যথা অপেক্ষা খুল্লনার সপত্নী-বিড়ম্বনার জ্বালাই একান্ত প্রকট। মানস-আর্তি, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেলতার চেয়ে এখানে শারীরিক দুঃখ-কষ্ট এবং অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্যের কথাই প্রকট ও প্রবল।

ভাদ্র মাসেতে, দেবী গো, বাদুলী ঘন হইল।
জুক, পোক, মশা মাছি সমাইয়ে বাস লৈল ॥

(বেহুলার অষ্টমাসী)

অধর সহিতে ওষ্ঠ কাঁপে ঘন ঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥

(ফুল্লরার বারমাস্যা)

কিংবা

শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা

অথবা

শয়ন ঢেঁকিশালে নাথ শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা জ্বালে ॥

(খুল্লনার বারমাস্যা)

ইত্যাদি এ জাতীয় বারমাস্যার সর্বত্রই দুঃখ-দারিদ্র্যজনিত ব্যবহারিক জীবনযাত্রা-

নির্বাহের বিড়ম্বনার ছবিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানকার ফুল্লরা, খুল্লনা, বেহুলা বা সীতা-চরিত্রের পরিচয়ে স্পষ্টই বোঝা যায়—

'করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি।
দুঃখ হেতু গড়িলা তরুণী ॥'

কবির এ উক্তি পরম সত্য ও সার্থক। নারীচরিত্রের ত্যাগ, সেবা ও আত্মদানই যে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল বাঁধন, সকল শান্তি ও সৌষ্ঠবের হেতু, এ সত্য বুঝতে আমাদের বিলম্ব হয় না। তাছাড়া, মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে—বারমাস্যার এ জাতীয় চিত্র-চরিত্রগুলো আমাদের এ বিশ্বাস ও সংস্কারকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে।

কিন্তু বারমাস্যা-মালার এই ধারায় বিরহ-বারমাস্যা বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসাত্মক বারমাস্যার মত জীবনদৃষ্টির পরম বিস্তার ও সমুন্নতি লক্ষ্য হয় না। দুঃখ এখানে মানুষকে তার মর্ত্যের গণ্ডি পার করিয়ে দিব্য রাজ্যের সীমায় পৌঁছে দেয়নি। এখানে তার অদ্বয় অখণ্ড প্রেমদৃষ্টির পরিচয়ও ফোটেনি কোথাও। এখানকার নারীর নারীত্বে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, তার ত্যাগ ও সেবা-শুশ্রূষার আদর্শ আমাদের বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগায়, সন্দেহ কি? কিন্তু তার অন্তর্নিহিত মহাভাবময় মূর্তি, তার বিরাট জীবন-ধ্যান বা বিশ্বপ্রেমিকতা আমাদের মহাজীবনের সংকেত সন্ধান দেয় না। শুধু বুঝি, বাংলা বা ভারতের সমাজ ও ধর্ম, সাহিত্য ও সভ্যতা যে নারীজীবনের ভিত্তিতে সৃষ্টি, এ জাতীয় বারমাস্যার কাহিনী, এবং এখানকার চরিত্র তার এক একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

(চ) পূজা বা অর্ঘ্যমূলকঃ মানবলীলার পরিবর্তে দৈবলীলা কীর্তনই এ জাতীয় বারমাস্যার স্বধর্ম। বিভিন্ন অবতাররূপে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বিচিত্র লীলা-বিলাসই এখানকার প্রতিপাদ্য বস্তু। উড়িয়া সাহিত্যের পদ্মতোলা বারমাসী, দোলি বারমাস্যা প্রভৃতি এর উজ্জ্বল নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

দোলি বারমাস্যা—

মাঘ মাস বর কেলি
মাধবত খেলন্তি দোলি
ফগুণে ফগু চাচেলি

বৃন্দাবনে লাগি অছি কচেরী
পিচ করি মরামরি।
আষাঢ়ে রথ যাতরা
শ্রাবণে ঝুলন কুঞ্জে···ইত্যাদি।

পদ্মতোলা বারমাসী—

মাঘরে মাধব পুরুণা সাধব বিষ উড়াই দেল হরি
ধূলিআ নাগ মারি দূরকু দেল যে ঘউড়ি
কি গোবিন্দ হরি।

বাংলাসাহিত্যে বারমাসী অর্ঘ্য-প্রদান
কোন্ মাসে কোন্ রাশি।
চৈত্র মাসে মীন রাশি ॥
হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিত্য ॥

* * *

হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্য।
হাতপাতি লহ সেব কর অর্ঘ পুষ্প পানী ॥···ইত্যাদি।

উপরের বিচিত্র দৃষ্টান্তে জয়দেববিরচিত প্রখ্যাত পদটি এদের সগোত্ররূপে স্বতঃই মনে আসে।

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥
(গীতগোবিন্দ—১৬নং শ্লোক ১ম সর্গ)

(ছ) সম্ভোগ-শৃঙ্গার রসাত্মক বা মিলনমূলক বারমাস্যা:

ভারতীয় সাহিত্যের বারমাস্যায় সম্ভোগ-শৃঙ্গারের চিত্ররূপে মঙ্গলকাব্যের সুশীলা ও বিদ্যার চিত্র, হিন্দীসাহিত্যে নায়িকা পদ্মাবতীর চিত্র এবং রাজস্থানী বা গুজরাতী সাহিত্যে মালবণীর চিত্র উল্লেখযোগ্য। আপাততঃ সম্ভোগের আলেখ্যরূপে এদের আকৃতি-প্রকৃতিতে সাম্য-সাদৃশ্য থাকলেও বিদ্যার সম্ভোগময়

জীবনালেখ্য সুশীলার চিত্রের কার্বনকপি বা দ্বিতীয় সংস্করণ নয়। সম্ভোগের বারমাসীরূপে পদ্মাবতী বা মালবণীর আলেখ্য সম্পর্কেও এই একই কথা।

বিদ্যার বারমাস্যায় কামোন্মত্তা, বিলাসোচ্ছলা নারীর উদ্দাম যৌবনের প্রকাশই মুখ্য বস্তু। বারমাসের বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা বা সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য—বর্ষার মেঘ, মাঘের শীত, বসন্তের মলয়পবন, জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্ম, সবই অবিমিশ্র দৈহিক ভোগেরই উপকরণ-উপাদান যোগায় বিদ্যার। গার্হস্থ্য জীবনের ধর্ম-কর্ম, বাংলার নারীর বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠান, বিদ্যার বারমাসীতে এ সবের স্থান একান্ত গৌণ। বিদ্যা ভাদ্রমাসে 'জলের পরিপাটী' দেখে শুধু 'উজান আর ভাটিকোশা' চড়ে বেড়াবার স্বপ্নেই বিভোর। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গলাগলি হয়ে 'জলের ঝরঝরি' বা 'বায়ুর থরথরি' শুনবার কল্পনায় মশগুল।

বিদ্যার জীবনে মাঘের হিমানী কেবল কামোদ্দীপনাই সৃষ্টি করে।—

'বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে॥'

স্বামীর মঙ্গল, উন্নতি কামনায় বাংলার নরনারী যে মাসে মাসে বা বিভিন্ন ঋতুতে বার-ব্রতাদি পালন করে থাকে, স্বামী-সাহচর্যে বিদ্যার পক্ষে সে চিন্তার অবকাশ একান্ত স্বল্প। কিন্তু সুশীলার সম্ভোগ-শৃঙ্গাররসের বারমাস্যার চিত্র বেশ একটু স্বতন্ত্র। বিদ্যার মত তারও চিত্ত মেঘগর্জনে, ময়ূর নাচনে, দাদুরের ডাকে স্বতঃই চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় ভাবরূপের প্রকাশে সেও স্বামীর সাহচর্য, সান্নিধ্য একান্তই কামনা করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের তথা গার্হস্থ্য জীবনের মহৎ দায়িত্ব, কর্তব্যে সে অনবহিত নয় আদৌ।

'পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়ে দ্বিজের পূরাও অভিলাষ॥'

কিংবা,

'পুণ্য কার্তিক মাস পুণ্য কার্তিক মাস।
দান দিয়া পূরহ দ্বিজের অভিলাষ॥'

অথবা,

'মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করে স্নান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥'

আবার,

'মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘমাসে ত্যাগ মীন॥'

ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারে সুশীলা তাদের দাম্পত্য জীবনের কল্যাণময় পুণ্যকৃত্য সাধনে পরম সচেতন। সুখ তার পরম কাম্য হলেও, সুখের নেশা, দেহ-সম্ভোগ-বাসনা তার নারী কর্তব্যে তাকে পরাঙ্মুখ করে তোলেনি।

তাছাড়া, সম্পন্ন পিতার স্নেহের দুলালী হয়ে—

'বাজারে করিয়া দিব শতেক খামার।
কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার॥"

এইভাবে স্বামীর স্থায়ী ধনসম্পদের ব্যবস্থায় এমন তৎপরতা সুশীলার সম্ভোগময় জীবনের অন্তরালে একটি বিশেষ লক্ষণীয় গুণ। একদিকে পুরাণ শ্রবণ, দান-ধ্যান ও মাঘমাসে মীন ত্যাগাদির মাধ্যমে স্বামীর ধর্মনৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের সমৃদ্ধি এবং অন্যদিকে শতেক খামারের ব্যবস্থায় তাঁর বৈষয়িক জীবনের উন্নতি, উৎকর্ষের পরম চিন্তা ভোগ-ঐশ্বর্যময় সুশীলার বারমাস্যায় সুশীলার নারীত্বকে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

হিন্দী সাহিত্যে ষড়ঋতুবর্ণনখণ্ডে নায়ক রত্নসেন ও নায়িকা পদ্মাবতীর সুখভোগের চিত্রটিও ভারতচন্দ্রের বিদ্যার ভোগসুখময় বারমাস্যার চিত্রের সগোত্র। পদ্মাবতীও বিদ্যার মত দেহগত ভোগ ও সুখলালসায় আত্মহারা। সেই লোকায়ত স্তরের জীবনে, সেই সভ্যতার আদিপর্বে প্রবৃত্তি-পরিচালিত মানুষের অবিমিশ্র ভোগ, সুখ, আকাঙ্ক্ষার চিত্রই এখানকার প্রথম ও শেষ কথা।

'রিতু পাবস বরসৈ, পিউ পাবা। সাবন ভাদোঁ অধিক সোহাবা।
পদমাবতি চাইত ঋতু পাই। গগন সোহাবন, ভূমি সোহাই॥
কোকিল বৈন, পাঁতি বগ ছুটী। ধনি নিসরীঁ জনু বীর বহুটী।
চমক বীজু, বরসৈ জল সোনা। দাদুর মোর সবদ সুটিলোনা॥
রঙ্গ-রাতী পীতম সঙ্গ জাগী। গরজে গগন চৌকি গর লাগী'॥ ইত্যাদি

পদ্মাবতীর বারমাস্যার চিত্রের সঙ্গে বিদ্যার বারমাস্যার—

'ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্জনার ঝঞ্জনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥'

... ... ইত্যাদি অংশের সৌসাদৃশ্য স্পষ্ট অনুভবযোগ্য।

তবে পদ্মাবতীর সম্ভোগ বারমাসীর শেষ কয়ছত্রে কবিকল্পনার বেশ একটু অপূর্বতা, রোমান্টিকতা লক্ষণীয়।—

'জই ধনি পুরুষ সীউ নহিঁ লাগা। জানহুঁ কাগ দেখি সরভাগা॥
জাই ইন্দ্র সোঁ কীন্হ পুকারা। হৌঁ পদমাবতি দেস নিসারা॥
এহি ঋতু সদা সঙ্গ মহঁ সেবা। অব দরসন তেঁ মোর বিছোবা॥
অব হসি কৈ সসি সূর হি ভেঁটা। রহা জো সীউ বীচ সোমেটা॥
ভএউ ইন্দ্রকর আয়সু বড় সতাব যহ সোই।
কবহুঁ কাহুকে পার ভই কবহুঁ কাহুকে হোই॥'

এখানে পদ্মাবতী বিতাড়িত শীতঋতুর পক্ষে ইন্দ্রের কাছে অভিযোগ এবং ইন্দ্রের পক্ষে 'কখনও একের প্রভুত্ব, কখনও অন্যের ইহাই সংসারের রীতি'—এ জবাবের মধ্যে কবিদৃষ্টির স্বকীয়তা বা অপরতন্ত্রতা উল্লেখযোগ্য।

মিলন বা সম্ভোগাত্মক বিদ্যা, সুশীলা বা গুজরাতী সাহিত্যের মালবণীর বারমাস্যায় সম্ভোগের চিত্রের মধ্যে বিচ্ছেদের আতঙ্ক, আশঙ্কার সুরটি লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রেমাস্পদ সুন্দরকে কাছে পেয়েও বিদ্যা যেন তাকে হারাবার আশঙ্কায় আকুল, তাই সে বিচিত্র আকর্ষণে বেঁধে রাখতে চায় প্রিয়তমকে—

'আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥'
'আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥'

স্বদেশগমনেচ্ছু সুন্দরকে একান্তভাবে আঁকড়ে রাখবার এই যে দুরন্ত প্রচেষ্টা বিদ্যার মধ্যে, সুশীলা-চরিত্রেও এরই অবিকল রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

> 'মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস।
> আর না করিহ প্রভু উজ্জাবনী আশ ॥'
> 'সুখে গোঙাইবে হিম, সুখে গোঙাইবে হিম।
> উজ্জানী নগরে বাসিবে যেন নিম।'

নায়ক সুন্দর ও শ্রীমন্তের সমাগমে নায়িকা বিদ্যা ও সুশীলার এই যে হারানর আতঙ্কে আকুলতা এবং প্রেমপাশে বন্ধনের দুর্বার প্রচেষ্টা, রাজস্থানী বা গুজরাতী বারমাস্যায় নায়িকা মালবণীর জীবনেও একই সত্য প্রমূর্ত। প্রেমাস্পদ ঢোলাকে কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেলার দুরন্ত আকুলতায় নায়িকা মালবণী বিদেশগমনেচ্ছু নায়ককে কতভাবে না যেতে নিষেধ করছে!—

বর্ষাকালে ঢোলা তার পূর্বপত্নী মারুর কাছে যেতে উদ্যত হলে মালবণী সনির্বন্ধ অনুরোধ করে জানাচ্ছে—

> 'জিন রুতি বগ পাওস লিয়ই ধরণি ন মেল্হই পাই।
> তিন রুতি সাহিব বল্লহা কোই দিসাবর-জাই ॥ ২৪৬নং

ভাবানুবাদঃ যে ঋতুতে বৃষ্টির জন্য বকগুলোও পৃথিবীর উপর পা রাখতে চায় না, হে প্রিয় স্বামী, সেই ঋতুতে কেউ কি কোথাও পা বাড়ায়?

গ্রীষ্মকালেও এমনিভাবে মালবণী কাতর অনুনয় জানাচ্ছে—

> 'থলতত্তা লূ সাঁ মূহী দা ঝোলা পহিয়াছ।
> মূহাঁকউ কহিয়উ জউ করউ ঘরি বইঠা রহিয়াই ॥' ২৪১নং

ভাবানুবাদঃ স্থলভাগ তপ্ত হয়ে আছে, সামনে 'লূ' বইছে; হে পথিক, তুমি যদি মারুর দেশে এই ঋতুতে যাও তো দগ্ধ হ'য়ে যাবে। আমি যা বলছি, তাই করো, ঘরে বসে থাকো।

বারমাস্যা সাহিত্যের এই সমস্ত অংশে বৈষ্ণব সাহিত্যের 'দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' প্রেমের এই লোকোত্তর রস-ঘন মূর্তিটি স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। অবশ্য এ দুই প্রেমের চরিত্র বা স্বরূপ যে তত্ত্বতঃ একই, এ কথা বলা সঙ্গত মনে হয় না। তবে বিশ্বসংসারের মিলন মাত্রই বিরহাত্মক, এ সত্য সর্বজনবিদিত হলেও অবোধ, অবুঝ মানুষ কেবলই নানাছলে নানা

মায়ায় প্রিয়জনকে একান্ত করে আঁকড়াতে চায়। মানব-জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, করুণতম আলেখ্যই এই। কবিগুরু তাঁর 'যেতে নাহি দিব' কবিতার

'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।'

আবার,

'যতবার পরাজয়
ততবার কহে,' 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!'

এই জাতীয় বিচিত্র ছত্রে মানবজীবনের যে চির-করুণ ও মর্মান্তিক রহস্যটিকে মূর্তি দিয়েছেন, সুশীলা, বিদ্যা বা মালবণীর বারমাস্তার অন্তরে তারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়েছে।

সাতবাহন বিরচিত 'গাথা সপ্তশতী' নামক প্রাকৃত সাহিত্যেও বর্ষা, হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুতে প্রবাসগমনোদ্যত নায়ক সম্পর্কে নায়িকার অনেকটা অনুরূপই মনোভাব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সেখানেও দেখি, বর্ষাগমে মালবণী বা সুশীলাদির মত নায়িকা প্রবাস-গমনোদ্যোগ থেকে নায়ককে নিরস্ত করতে একান্ত প্রয়াসী—

'দরফুডিঅ সিপ্পিসংপুডণিলুক্ক হালাহল-গগ-চ্ছেপ্পণিহম্।
পক্ক ঘট্টি বিণিগগ অকোমলমম্বস্কুরং উঅহ॥

(১ম শতক—৬২ শ্লোক)

'কথ গঅং রই বিম্বং কথ পণাট্টাও চন্দতারাও।
গঅণে বলা আপস্তিং কালো হোরং ব কড্ডেই॥'

(৫ শতক—৩৫নং শ্লোক)

আবার

উব্বহই ণবতনঙ্কুর রোমঞ্চ পসাহি আই অঙ্গাই।
পাউসলচ্ছীঅ পওহরেহিঁ পরি পেল্লিও বিঞ ঝো॥

(৬ শতক—৭৭নং)

প্রাকৃত সাহিত্যের এই নায়িকা এবং বারমাস্যার অন্তর্গত বিদ্যা, সুশীলা বা মালবণী —এদের সকলেরই প্রেমজীবনে মূলতঃ এই একই করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই এ জাতীয় আপাতঃ লঘু ভাবরসের বারমাস্যা বা তজ্জাতীয় রচনার এই দৃষ্টিগত সত্য-সুন্দর মহিমাটি চির-অবিস্মরণীয়।

(জ) বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসাত্মক বা বিরহমূলক বারমাস্যা—ভাবাত্মক ঃ

বিরহ-বারমাস্যাই বারমাসী-মালার মধ্যমণি। বারমাসের বিচিত্র নিসর্গ পটভূমিকায় তথা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানের স্মৃতি ও দৃষ্টিতে বিরহিণীর বিচিত্র ও বিশিষ্ট মানস-মূর্তিই এর মূল সুর।

যুগে যুগে সাহিত্য এই বিরহের সুরেই মানবচিত্ত মাতিয়ে এসেছে। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, আমাদের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, আমাদের শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, মেঘদূত ও মালতীমাধব, আমাদের শাক্ত, বৈষ্ণব ও মঙ্গল-সাহিত্য আমাদের লোকসাহিত্যের মলুয়া, মহুয়া ইত্যাদির গীতি ও গাথা অবিমিশ্রভাবে এই বিরহেরই কথা, বিরহেরই সুর ও সঙ্গীত। বিরহী রামচন্দ্র, যক্ষ ও মাধবের চরিত্রই রামাযণ, মেঘদূত ও মালতীমাধব কাব্যের মুখ্য আকর্ষণ। বিরহিণী মালতী, দময়ন্তী, সীতা, রাধিকা, বেহুলা বা লীলা ও চন্দ্রাবতীর চরিত্রই এই সমস্ত চরিত্র-আশ্রিত সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ। কারণ স্নেহ বা প্রেমের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা মিলনে নয়, বিরহে। বিরহে মানব-চিত্ত যখন তন্ময়, তখনই মিলন পূর্ণ ও মঙ্গলময়। তাই বিরহ-গীতিই গীতি-সাহিত্য-খনির কোহিনূর।

মাথুর ও বিরহ বারমাস্যা ঃ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীমতী রাধিকার বিরহ বা মাথুরের পদ যেমন শ্রেষ্ঠ, বারমাস্যা সাহিত্যে বিরহ-বারমাস্যার পদও তেমনি নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। পদাবলী সাহিত্যে সর্বসাধ্যসার শ্রীমতী রাধিকা-দেবীর বিরহ-ক্লিষ্ট মূর্তিই যেমন ভক্ত ও সাধক সমাজের ধ্যানের ধন, বারমাস্যা সাহিত্যেও তেমনি বিরহিণী রাধিকা, নাগমতী, লীলাবতী, রাজমতী প্রভৃতির চরিত্র মানব-পূজারী মাত্রেরই আরাধ্যা, আরতি-ভাজন।

মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার অবস্থা—

'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ-দিশ শূন ভেল সগরী॥'

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার কাছে ব্রহ্মাণ্ডই মহাশূন্যতার আধার হয়ে উঠেছে। বিরহে শ্রীমতী একান্তই তদ্‌গতচিত্ত। বিশ্বসংসার আপাতঃ ভরপুর থেকেও তাঁর কাছে সাহারার মত হয়ে উঠেছে। দেহগত চেতনা, শারীর ভোগ-বাসনা যেখানে নিঃশেষিত, কেবল সেখানেই একের অভাবে এমন মহাশূন্যতার অনুভূতি সম্ভব। কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা এখানে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত আপনার পৃথক সত্তার চেতনা-বিরহিত। কৃষ্ণই তাঁর সুখ, কৃষ্ণই তাঁর দুঃখ, কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান, কৃষ্ণই তাঁর জ্ঞান। তাই কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর অবস্থা—

'নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুখ মঝু পাস॥'

এই তদ্‌গত-চিত্ততার জন্যই পদাবলী সাহিত্যে রাধাভাবের এমন সম্ভ্রম ও পূজা। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এই রাধাভাবের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে এই কারণেই আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই রাধাভাব এবং আত্মহারা প্রেম-মূর্তির নানা প্রতিরূপ বিরহ-বারমাস্যার নারী-চরিত্রে লক্ষ্য করবার বিষয়। পাশাপাশি উভয়চিত্র স্থাপনে এদের সেই সৌসাদৃশ্য স্ফুট হয়ে উঠবে।

'এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐ ছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ॥'

পদকর্তা গোবিন্দদাসচিত্রিত রাধিকার এই বিরহ-বিধুর প্রেম-আলেখ্যটি হিন্দী সাহিত্যের বারমাস্যার অন্তর্গত বিরহিণী নাগমতীর চিত্রের পরম সহোদর সন্দেহ নেই। কবি এঁকেছেন—

জৌ পৈ পীউ জরত অস পাবা।
জরত মরত মোহিঁ রোষ ন আবা॥
রাতি-দিবস সব যহ জিউ মোরে।
লগৌঁ নিহোর কন্ত অব তোরে॥
যহ তন জারৌঁ ছার কৈ,
কহৌঁ কি 'পবন! জড়াব!'
মকু তেহি মারগ জড়ি পরৈ কন্ত ঘরৈ জহঁ পাব॥

আবার গোবিন্দদাসের,

'জনু বড়বানল হৃদি-মাহা এহ।
কিয়ে সুখ-লাগি ভসম নহ দেহ॥'

এই মাথুরের পদের সঙ্গে

'ফাগু করহিঁ সব চাঁচরি জোরী।
মোহি তন লাই দীন্‌হ জস হোরী॥'

ইত্যাদি নাগমতী বিয়োগখণ্ডের এই পদের মর্মগত ঐক্য ও সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

'চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥'

পদকর্তা বিদ্যাপতির এই মাথুরের পদটি নাগমতীর বারমাস্যার অন্তর্গত

'পরবত সমুদ অগমবিচ, বীহড় ঘন বন ঢাঁখ।
কিমি কৈ ভেঁটৌ কন্ত তুম্‌হ? না মোহি পাঁব ন পাঁখ॥'

এই পদের সগোত্র।

আবার,

'ভা ভাদোঁ দুভর অতিভারী! কৈ সে ভেঁার বৈ নি অঁধিয়ারী।
মন্দির সূন পিউ অনতৈ বসা। সেজ নাগিনী ফিরি॥'…ইত্যাদি

নাগমতীর বারমাস্যার পদ,

অথবা

'নৈরাশ বাসর-রজনী দশ দিশ গগনে বারিদ-ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই ময়ুর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিন্দ লোচনে জাগি সগরি রতিয়া॥'…ইত্যাদি

গোবিন্দ চক্রবর্তী বিরচিত রাধিকার বারমাসীর পদ,

কিংবা

'আষাঢ়ে মেঘ ঘড়ঘড়ি
কেমন্তে বঞ্চিবি মুঁ ছার নারী গো
জীবন যাউছি ছাড়ি॥'… ইত্যাদি

উড়িয়া সাহিত্যের বারমাসীর পদ,

পদকর্তা বিদ্যাপতির,

'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।

ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ॥'…ইত্যাদি

মাথুরের পদের একান্ত সমধর্মী ও সহমর্মী।

আবার,

'সুখদ কদম্বতলা কালিন্দীর কূল।

প্রাণনাথ বিনে দেখি আন্ধার গোকুল ॥

* * * *

সেই সব লীলা রস যেঞি মনে পড়ে।

নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জ্বালে ॥'

ভাগবতের অন্তর্গত এই গোপিকার বারমাস্যার ভাব ও সুর

'সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।

কীছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥'

বিদ্যাপতির এই মাথুরের পদের ভাব ও সুরের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত।

যথার্থ প্রেমের দৃষ্টিতে জড় ও জীব-জগতের সমস্ত ভেদ-ব্যবধান যায় ঘুচে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অদ্বয় সত্যের বেদীতে হয় প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের মহা-চেতনা মহা-প্রাণতা জড় ও জীব-জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, যাবতীয় পদার্থকেই করে আপন বক্ষে ধারণ ও আলিঙ্গন। যে ভারতীয় ধ্যান ও বিশ্বাসে সমস্ত জড় প্রকৃতিই 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ' বারমাস্যার অন্তর্গত বিরহিণীর বিশুদ্ধ প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্র জড়-জগৎ এমনিভাবে সুখ-দুঃখের অনুভূতিসম্পন্ন, সংজ্ঞাবান্ হয়ে উঠেছে। এ জাতীয় বারমাস্যার এ চিত্রও এক বিশেষ আকর্ষণ।

লীলার ষাণ্মাসিকী গীতিতে

'কাহারে সুধাও রে পাখী আরে পাখী পাইতাম তোমার কাছে।

কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে ॥'

এইভাবে বিরহিণী লীলা প্রেমের আবেগে ও সর্বজনীন প্রভাবে ক্ষুদ্র পাখীকেও দরদী স্বজনের পর্যায়ে টেনে এনে তার কাছে আপন মনের কপাট খুলে দিতে উদ্যত।

আবার,

'কৈও কৈও বঁধুর আগে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল॥'

এখানেও দেখি, পরম বিশ্বাসভরে লীলা, বিশ্বস্ত বন্ধু, পরম আপনজনের মত অলিকুলের মাধ্যমে প্রিয়জন কঙ্কের কাছে সংবাদ পাঠাতে উন্মুখ। বিরহে লীলার প্রেম হয়ে উঠেছে জড়ে ও জীবে সমদৃষ্টি। বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, পক্ষী—সর্বত্রই এক ও অদ্বয় মানবিক অনুভূতি, লীলার এই প্রেমে এক দিব্য মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলেছে।

প্রেমের এই বিশ্বোদর, মহাভাবময় মূর্তি বারমাস্যা সাহিত্যের আরও বিচিত্র অংশে নানাভাবে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।—

তামিল সাহিত্যের অন্তর্গত বারমাস্যা জাতীয় রচনাংশে বিরহিণী নায়িকা প্রেমের আকর্ষণে কখনও মেঘ, কখনও চাঁদ, আবার কখনও উত্তুরে হাওয়াকে সহানুভূতিশীল স্বজনের আসনে বসিয়ে পরম আশা ও বিশ্বাসভরে আপন মনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী গেয়ে চলেছে—

'কালোডু ওয়ন্দ কমঞ্জুল্ মামলৈ
আরলি ইলৈয়ো নিয়ে পেরিচৈ
ই মৈয়মুম্ তুলক্কুম্ পন্‌বিনৈ
তুনৈয়িলর্ অলিয়র্ পেণ্ডির্ ইত্তু এবনে
পরুবঞ্চেয়ত করুবি মামলৈ।

বঙ্গানুবাদঃ হে মেঘ, তুমি গম্ভীর গর্জনে আকাশ পথে চলেছ। তোমার গর্জনে হিমালয় পর্যন্ত কম্পিত হয়। অসহায় একাকিনী নারীর প্রতি তোমার কিছুমাত্র কৃপা নাই। তোমার এইরূপ ব্যবহার মোটেই মহৎ লোকের উপযুক্ত নয়। ...ইত্যাদি।

পেরুন্দন্ ওয়াডৈ
নিনক্কুত্ তিতরিন্ তণ্ড্রো ইলমে...

ইয়ারুমিল্ ওরুচিরৈ ইরুন্দু
পেরঞর্ উরুবিয়ৈ বরুন্দা তিমে।

বঙ্গানুবাদঃ হে নিষ্ঠুর উত্তুরে হাওয়া, আমি তো তোমার কোন অনিষ্টই করিনি। অনুগ্রহ করে তুমি এই অভাগিনীর দুঃখের মাত্রা আর বাড়িও না।

পাঞ্জাবী ভাষার বারমাস্যার মধ্যেও দেখা যায়, প্রেমের দিব্য আকর্ষণে এমনি করে মানব-জগৎ ও জীবন নিসর্গ-জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আলিঙ্গনরত। বিরহিণী নায়িকা বিরহাতুর চিত্তে দূর থেকে নায়কের অমঙ্গল নিবারণের ব্যাকুল-প্রয়াসে রৌদ্র-প্রখর জ্যৈষ্ঠ মাসকে ডেকে অনুনয় করে জানাচ্ছে—

'জেঠা! অরজাঁ হাঁ করদী।
তস্তী রাউদা ছোলা—
লগ্গে সাঁঈঁ ন দেহীআ॥

আবার আষাঢ় মাসের দিনে প্রখর সূর্যকে সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে—

সূরজ! তপীও না উথে
জিথে পীআ গিআ রে!
লূউ! ঠনটীআঁ হে ব্‌গনা
জিথে জিন্দী মাঁয় গঈআ॥'

এমনি করে বিরহ-প্রেমের বিশ্বম্ভরপ্রকৃতি বারমাস্যা সাহিত্যের নানাস্থানেই পরম ভাস্বর।

সংস্কৃত সাহিত্যেও এই বিরহমূলক বিশ্বোদরপ্রেমের মূর্তি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষের প্রেমের কথা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বারমাস্যায় যেমন বিরহিণীর প্রেম জড় ও জীবে সমদৃষ্টি, বিরহী যক্ষের প্রেমদৃষ্টিতেও তেমনি চেতন-অচেতনের ভেদবোধ ও বুদ্ধি বিলুপ্ত। তাই উত্তরমেঘে মেঘের কাছে অলকাস্থিত প্রিয়ার বিরহ অবস্থার বর্ণনায় যক্ষের উক্তি—

"পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং।
কচ্চিদ্‌ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥"

সেই জড়জীবে অদ্বয় সত্য ও সুন্দর প্রেমিকের দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

'মালতীমাধব' নাটকেও পার্বত্য ও বন্য জীবগণের উদ্দেশ্যে বিরহী নায়ক মাধবের সম্বোধন উল্লেখযোগ্য। বায়ুকে সম্বোধন করে মাধবের উক্তি—

বিকসৎ কদম্ব নিকুরম্ব পাংসুনা
সহ জীবিতং বহ মম প্রিয়া যতঃ।
অথবা তদঙ্গ পরিবাস শীতলং
ময়ি কিঞ্চিদর্পয় ভবান্ হি মে গতিঃ॥

(শ্লোক—৪৩)
(৯ম অঙ্ক—মালতীমাধব)

এই একই প্রেমমূর্তির ও দৃষ্টির নিদর্শন।

আবার রামায়ণে সীতাবিরহবিধুর রামচন্দ্রের মনোভাবের আলেখ্যটিও এই বারমাস্যার আলেখ্যেরই অপর একটি সংস্করণ—

"অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্ববনপ্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীসে শংস সীতাং শুভাননাম্॥"

নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তীও এখানকার লীলা, রাধিকা বা রাজমতীরই সহোদরা মাত্র।—

'অরণ্যরাড়য়ং শ্রীমাং শ্চতুর্দংষ্ট্রো মহাহনুঃ।
শার্দ্দূলোঽভিমুখং প্রৈতি পৃচ্ছাম্যেনমশংকিতা॥
ভবান্ মৃগানামধিপ স্ত্বমস্মিন্ কাননে প্রভুঃ।
বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিদ্ধি মাম্॥'

দময়ন্তী এখানে প্রেমের মহিমময় প্রভাবে হিংস্র শার্দূলকেও আত্মীয় করে তুলেছে।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, যে বিরহ বা বিচ্ছেদ আপাততঃ, এত দুঃখের, এত বেদনাদায়ক, তত্ত্বতঃ সেই বিরহই প্রেমকে করে সত্য ও সুন্দর। এই বিরহপূত প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন সাধক—

'প্রেম আছে তাই জগত আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ওরে, প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হলে,
প্রাণ ছাড়ত প্রেম ছেড়না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে॥'

(ব্রহ্ম সঙ্গীত)

এই যে শুদ্ধ শান্ত প্রেম যার মায়াস্পর্শে বিশ্ববিধাতা আপনিই বাঁধা পড়েন, বিরহই তার মর্মকথা, জন্মসূত্র। কালিদাসের অমরবাণী,

'স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিন স্তে ত্বভোগা
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি ॥'

এ সত্যের অক্ষয় সাক্ষ্য।

এই মানুষী প্রেমই শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের নামান্তর। এই প্রেমই 'ভূমির মধ্যে ভূমার' সন্ধান পেয়েছে; দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীতের, রূপের ও সীমার মধ্যে অরূপ ও অসীমের অনুভব ও স্পর্শলাভের অধিকারী হয়ে উঠেছে। এ প্রেমকে বলা যায়—'The worship of the heart that Heaven rejects not.'

বিরহ বারমাস্যায় প্রেমমহিমার এই স্বরূপ আলোচনায় এই জাতীয় বারমাস্যার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য, এর সর্বকালীন সর্বদেশীয় মূল্য ও মহিমা যে সর্বজনগ্রাহ্য, তা এখন বলাই বাহুল্য।

অবশ্য মাথুরের পদে শ্রীরাধার প্রেমের সঙ্গে বারমাস্যার অন্তর্গত বিরহিণী নায়িকার প্রেমের একান্ত সৌসাদৃশ্য থাকলেও পরিণতিতে শ্রীরাধার প্রেমের যে লোকোত্তর ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে উঠেছে, বারমাস্যার নায়িকাপ্রেমের সেই লোকোত্তরতা, সেই অতীন্দ্রিয়তা সুলভ নয়।

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।'

প্রেমের পরিণতিতে শ্রীরাধার এই 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' রূপ সৌন্দর্যের যে দিব্যমূর্তি, স্থূলভাবে বারমাস্যার প্রেমমূর্তির এই অশরীরী পরিচয় দুর্লভ। এখানকার প্রেম ঊর্ধ্বমুখী হলেও মৃত্তিকা-স্পর্শ এর আগাগোড়াই লক্ষণীয়। এখানেও পবিত্রতা আছে, ত্যাগ ও তিতিক্ষাও যথেষ্ট। কিন্তু মাটির ও মর্ত্যের সঙ্গে এর যোগ অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু রাধিকার প্রেম অকারণ ও অমর্ত্য।

অবশ্য একটি কথা বারমাসীমালার এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একান্ত স্মরণীয় যে, এদের এই চারিত্রিক পরিচয় ঐকান্তিক নয়। অর্থাৎ মৌলিক বা সাহিত্যিক, প্রাচীন বা আধুনিক বারমাসীর মৌলিকতা বা প্রাচীনতা কিংবা আধুনিকতাই তাদের একমাত্র পরিচয় নয়। প্রাচীন বা আধুনিক বারমাসী আবার মিলনাত্মক বা বিরহব্যঞ্জকও বটে। একদৃষ্টিতে এগুলো প্রাচীন বা আধুনিক, আবার আর একভাবে এগুলো বর্ণনাত্মক বা ভাবধর্মী; কিংবা মিলন বা বিরহসূচক বারমাসীও বটে।*

* [এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত যে সকল বারমাস্যার বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্য।]

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং বারমাস্যা

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির মুখ্য ও মৌলিক বিশিষ্টতা এর সমন্বয় ধর্মের মধ্যে। বিজিত-বিজেতা, আর্য-অনার্য, সকলের ধর্ম, সকলের বিশ্বাস, সংস্কার, রুচি ও রীতি যুগ-যুগান্তর ধরে একই সমাজদেহে, একই সমাজজীবনে সংহত হয়ে আছে। সেই সভ্যতার আদি পর্বে, সেই আরণ্য ও একান্ত কৃষিনির্ভর জীবনের ধর্মাধর্মবোধ, সে জীবনের আনন্দ উৎসবের ধারা, সেখানকার বিচিত্র ধ্যান, স্বপন ও কল্পনা—সমস্তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিংশ শতকের উন্নত ও সংস্কৃত ভারতীয় জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অল্পবিস্তর বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার পার্থক্য পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"[1] অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের উক্তির মধ্যেও ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট। তিনি বলেন—

'Hinduism is an eclectic and ever-expansive Socio-religious system built up through the assimilation of divorce ethnic, natural and spiritual forces during the successive ages of Indian history.[2]

বিভিন্ন বারমাস্যার অন্তর্নিহিত পূজা, অর্চনা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রকৃতি বা স্বরূপ বিচার-বিশ্লেষণে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এই সংযোজনশীল চরিত্রটি স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই একথা বলেছি, বারমাস্যা গীতি নারীজীবনেরই গীতি; এর অন্তর্নিহিত আচার ও ধর্ম অনুষ্ঠান মুখ্যতঃ নারীজীবনকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। এর ধর্ম, কর্মের অনেকটাই এক দিকে নারীজীবনের ব্রতধর্ম, আর অন্য দিকে অনার্য আদিবাসীর কৃষিগত জীবন, আরণ্য জীবনের

---

[1] ভারতবর্ষের ইতিহাস—স্বদেশ

[2] 'The Folk Element in Hindu Culture'

—Binoy K. Sarkar.

ধর্ম। এ ধর্ম মূলতঃ বেদবহির্ভূত, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র-বিগর্হিত ধর্ম। 'আমাদের গ্রাম্য সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতরে যেসব ব্রত আজও প্রচলিত, তাহার অধিকাংশই অবৈদিক অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলতঃ গুহ্য যাদু ও প্রজননশক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজেব সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত।'[৪] প্রকৃতপক্ষে আদিপর্বের নারীসমাজউদ্ভূত, নারীসমাজলালিত এই ধর্ম যাদুশক্তি, মায়াশক্তি এবং প্রজননশক্তির পূজা-প্রশস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সভ্যতার সেই আদিপর্বে নরনারী আপনার প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার বিপাকে পড়ে প্রতিপদেই বিচিত্র কল্পিত অদৃশ্য শক্তির কাছে আপনাকে বিকিয়ে দিত। তাই বন্ধ্যা নারীকে দেখি কার্তিক ব্রত বা ষষ্ঠীর আরাধনায় তৎপর।—

(ক) 'কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক বরত পুত্রের লাগিয়া।'

(মহুয়ার বারমাস্যা
—ময়মনসিং গীতিকা)

(খ) 'মায়ে করে ষষ্ঠী পূজা পুতের লাগিয়া।
প্রাণের ভাই বিদেশের মোর দুঃখে কান্দে হিয়া॥'

(কমলা—ময়মনসিং গীতিকা)

(গ) 'কার্ত্তিক মাসেতে দেখ কার্ত্তিকের পূজা।
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা॥
সারারাত্রি হুলামেলা গীতবাদ্যি বাজে।
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে॥'

(কমলা—ময়মনসিং গীতিকা)

(ঘ) 'মায় গিয়া ধন্না দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।'

(কমলা—ময়মনসিং গীতিকা)

বারমাস্যার অন্তর্নিহিত এই সমস্ত নারী জীবনের ব্রত-অনুষ্ঠানের মধ্যে আদিতম ধর্মবোধের মূলে যে যাদুশক্তি বা মন্ত্রশক্তির পরিচয় নিহিত, তারই প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। 'চণ্ডীর দুয়ারে ধন্না দেওয়া' পুত্রের জন্য কাতিক ব্রত করা, এসব সেই ধর্মবোধের উৎস যে ম্যাজিক, তারই ইঙ্গিত, সঙ্কেতে ভরা।

এ ছাড়া কৃষিনির্ভর সমাজ ও ঋতু-উৎসব বর্ণনপ্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবেই দেখিয়েছি, আমাদের দেশের সুচিরকাল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত দৈব

[৪] বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫৮২।

ও লৌকিক পূজা-উৎসবের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে আদিকালের কৃষিনির্ভর সমাজের ঋতু-উৎসব এবং শস্য-উৎসবেরই বিচিত্র ও বিশিষ্ট রূপ। ভারতীয় সমাজের উৎসবলীলার এই আদি রহস্যের আধার এই বারমাস্যা। বার মাস বা ছয় ঋতুর পরিবর্তিত পটভূমিকায় নারী বা বিরহিণী নারীর যে বিরহজ্বালা, জীবনের যে কারুণ্য ও আর্তি ফুটে উঠেছে, তা ভারতের বার মাসের উৎসব অনুষ্ঠানময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই ধ্বনিত হয়েছে। বিরহিণী রাধিকার বারমাস্যায় দেখি,

'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সুখী সব নারী।'
'আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।'
'পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।'

আবার,

'ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।'

ইত্যাদি বিভিন্ন মাসের আনন্দ-উৎসবময় জীবনের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার বিরহদগ্ধ মূর্তি প্রকট হয়ে উঠেছে।

কমলার বারমাস্যায় দেখি,

'লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া॥
জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে॥'

হিন্দী সাহিত্যের বিরহিণী নায়িকা নাগমতীর বারমাস্যায়

'ফাগু করহিঁ সব চাঁচরি জোরী।
সোহি তন লাই দীন্হ জস হোরী॥'

এবং নায়িকা রাজমতীর বারমাস্যায়ও দেখি,

'শ্রাবণ বরসই ছই ছোটীয় ধার।
প্রীয় বিণ জীবি জই কিসই অধারি।
সহু কোই খেলই কাজলী।'

পাঞ্জাবী বারমাস্যায় বিরহিণী নায়িকার উক্তিতে আছে,

'চড়িয়া কত্তক মহীনা
ঘর ঘর জগদে নে দীরে
রো রো ভিজদী এ অঙ্গী'

উড়িয়া সাহিত্যের 'দোলি বারমাসী'তে বিরহিণীর ক্রন্দনোক্তিতে দেখি,

'ফগুণে দোল গোবিন্দ, চাঁচেরি খেল যে বড় আনন্দ লো ;
বিধাতা হোইলা মন্দ।'

এমনিভাবে ভারতীয় বিচিত্র ভাষার বারমাস্যায় যে সমস্ত পূজা-উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানের সূত্রে বিরহিণীর বিরহজ্বালা অভিব্যক্ত হয়েছে, সব না হলেও তাদের অধিকাংশই মূলতঃ সেই আদি সমাজের ঋতু-উৎসব বা শস্য-উৎসব। উদ্ধৃত ছত্রমালায় 'নবান্ন' 'পৌষে পিষ্টক', 'আগবাড়ান', 'কাজলী বা কজরী খেলা' এ-সবই বিশুদ্ধ ঋতু বা শস্য-উৎসব। ক্ষেতের ফসলই ছিল যাদের জীবনসর্বস্ব, তারা সেই ফসল উৎপাদনের বা উৎপন্ন ফসলের বিচিত্র অবস্থায়, বিভিন্ন ঋতুতে নানা উৎসবের আয়োজন করতো। এগুলো তারই নিদর্শন। অগ্রহায়ণ-পৌষে যখন শস্যসম্ভার ঘরে বা গোলায় ওঠে, তখন আনন্দভরে তাকে সম্বর্ধনা জানাতো মানুষ এইসব উৎসবের মাধ্যমে। এ অবস্থায় শস্যই তাদের দেবতা, শস্যই ধ্যান ও জ্ঞান। তাই অগ্রহায়ণে নবান্ন ও পৌষে পিষ্টকোৎসবের আয়োজন। কাজলী বা কজরী বর্ষার গান। শ্রাবণের ভরা বর্ষায় যখন শস্যক্ষেত্রের শ্যামল যৌবনমূর্তি, নদ-নদী-খাল-বিল যখন কানায় কানায় ভরা, তখন প্রাকৃতজনচিত্ত এই বর্ষার গান বা কজরী গানে মত্ত হয়ে ওঠে। উত্তরপ্রদেশের আশে পাশে বিশেষ করে মিরজাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এ গান একান্ত প্রচলিত।

এ সব উৎসবের সঙ্গে অম্বিকা, লক্ষ্মী, গোবিন্দ বা কৃষ্ণ অথবা শিব ইত্যাদি দেবদেবীর নাম সংযুক্ত থাকলেও এদের আদি বা মৌলিক পরিচয়ে এগুলো দৈবকৃত্য নয়, একান্ত লৌকিক।

'ভুঁই মোগো মাতাপিতা, ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ।'

(কৃষি বারমাস্যা)

এই যে ভূমিসর্বস্ব জীবন, উপরি উদ্ধৃত উৎসবমালা প্রকৃতপক্ষে এই জীবন-উদ্ভূত ঋতু-উৎসব বা শস্য-উৎসব। শরৎকালীন চণ্ডিকা, অম্বিকা বা দুর্গাপূজা আদিতে ও আসলে শারোদোৎসব বা নববর্ষোৎসব ছাড়া আর কিছু নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে লিখেছেন—'সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ বৎসর হইয়া গিয়াছে। যথা, অমরকোষে, 'সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমাঃ'। অতএব শারদীয় উৎসব কেবল দুর্গোৎসব

নহে, নববর্ষ প্রবেশের উৎসবও বটে। স্থানান্তরে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, শরৎঋতুর আরম্ভে রুদ্র-যজ্ঞ হইত। ইহার বিশেষ প্রমাণ যজুর্বেদে আছে। সেখানে রুদ্রাণী অম্বিকা নামে উক্ত হইয়াছেন। একস্থানে শরৎঋতু অম্বিকারূপে বর্ণিত হইয়াছে।'[4]

মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা অর্থাৎ সমগ্র বাংলা সাহিত্য তথা অন্যান্য সাহিত্যে বারমাস্যায় এই অম্বিকা, চণ্ডিকা বা দুর্গাপূজা প্রসঙ্গের এমন ব্যাপক পরিচয়ে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী বা দানবদলনী পৌরাণিক মূর্তি মূলতঃ নন। এ উৎসব আধ্যাত্মিকতার রস-সম্পৃক্ত নয়। যে ঋতু-উৎসব বা নববর্ষোৎসবের সঙ্গে সমগ্র জনমানবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এ উৎসব তারই পরিচয়। এ ছাড়া যে দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে,

'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব'

বলে বিদ্যার মারফতে কবিবর ভারতচন্দ্র পরিচয় করে গেছেন, সে অশ্লীল সংগীত-সংশ্লিষ্ট দুর্গাপ্রতিমা মূলতঃ কোন শাস্ত্রীয় মূর্তি, কোন পৌরাণিক মহিমান্বিত দেবীশক্তি অথবা এ উৎসব সত্যকার পৌরাণিক উৎসব, তা মনে করা যায় না। আদিবাসীরা ঋতু-উৎসবে বা নববর্ষোৎসবে যে নৃত্য ও গীতোৎসবের আয়োজন করতো, যার বিচিত্র পরিচয় আদিবাসী বা কৌমসমাজজীবনের আমোদ উৎসবের পরিচয়ে একান্ত সুলভ, এ তারই এক বিশেষ সংস্করণ।

'Durga is worshipped also as Annapurna or Annada—the goddess of corn and food. Near about the autumn she is also worshipped as Jagaddhatri i.e. the maintainer of the world. During the spring she is worshipped as Vasanti i.e. the spring goddess.'[5]

দুর্গাপূজা রহস্যসম্পর্কে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের এই উক্তিতে দুর্গাদেবী শস্যসম্পদের দেবী, দুর্গোৎসব শরৎ বা বসন্তোৎসব রূপে মূলতঃ ঋতু-উৎসব —এই সত্যেরই ইঙ্গিত নিহিত।

---

[4] 'পূজাপার্বণ'—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৃঃ ৯৩-৯৪।

[5] 'Evolution of Mother Worship in India'—
Dr. S. B. Dasgupta.

দুর্গা অম্বিকা বা চণ্ডিকা দেবীর প্রসঙ্গ ব্যতীত বারমাস্যায়,

'লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া
মাঘে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া'···ইত্যাদি

রূপে যে লক্ষ্মীপূজার প্রসঙ্গ তাও এই কৃষিজীবী সমাজেরই লৌকিক উৎসব। 'ক্ষেতে ধান পাকিয়া উঠিলে সেই পাকা ধানের শিস প্রথম ঘরে তোলা—সেও একটা ছোটখাট উৎসব। ইহারই নাম আগলওয়া বা আউনি-বাউনি।'

(বাংলার পালপার্বণ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী)

এখানে এই 'আগ বাড়াইয়া' যে লক্ষ্মীপূজার উদ্যোগ-আয়োজন, এ ক্ষেতের নূতন শস্যের অভিনন্দন বা সম্বর্ধনা ছাড়া আর কিছু নয়! যে শস্যসম্পদের অনুগ্রহে সারা বছর কৃষকপরিবার খেয়ে পরে বেঁচে থাকে, শস্যপ্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্দেশে পূজা বা অর্ঘ্য নিবেদন, সে যুগের অনন্যগতি মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিকই বটে।

'ভোরেতে উঠিয়া করি বনদুর্গার পূজা'

(কমলা)

অথবা

'আশ্বিন মাসের দিন নবদুর্গার পূজা'

(মনসার বারমাসী, ষষ্ঠীবর)

ইত্যাদি যে 'বনদুর্গা' বা 'নবদুর্গার' পরিচয় বারমাস্যার মধ্যে ছড়ান, দুর্গাপ্রতিমা বা দুর্গাপূজার কৃষি বা আরণ্য জীবন উদ্ভবেরই এ স্পষ্টতর সাক্ষ্য। একালের পৌরাণিক দুর্গাপ্রতিমা এরই যুগোচিত মার্জিত ও সংস্কৃত রূপ, বলতেই হবে। এই বনদুর্গার ধ্যান দেবীর আরণ্য সমাজ উদ্ভবেরই পরিচায়ক।—

'দেবীং দানব মাতরং নিজ মদা ঘূর্ণন্মহালোচনাং
দংষ্ট্রা ভীমমুখীং জটালি বিল সন্মৌলিং কপালস্রজম্।
বন্দে লোক ভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্র হারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধ-নিতম্ববিম্ব-বিপুলাং বাণান্ ধনুর্বিভ্রতীম্॥'

(বাংলার পালপার্বণ, পৃঃ ৩০)

এ দেবতার আকৃতির মধ্যে যেমন বীভৎসতা ও বন্যতা, এর পূজা পদ্ধতির মধ্যেও আদিম কৌমসমাজের রুচি রূপ সুস্পষ্ট। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়

লিখেছেন—'নানাপ্রকার নাচগান ও বীভৎস আচরণের সহিত গ্রামের বহির্ভাগে জয়দুর্গা বা বনদুর্গার পূজা বা পত্রাবলী পূজা সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা আছে।'

(বাংলার পালপার্বণ, পৃঃ ৩০)

কমলার বারমাস্যায় দেখা যায়—

'আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুর্গাপূজা।

*   *   *   *

ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়॥'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বনদুর্গা বা নবদুর্গা বা আকাল দুর্গাপূজা—এজাতীয় সমস্ত পূজার অপরিহার্য অঙ্গই হচ্ছে নারীদের গীতবাদ্য ও নৃত্য। দুর্গাপূজান্তে যে শবরোৎসবের নিদর্শন আজও তামসিক দুর্গাপূজার মধ্যে দেখা যায়, তাতে এ তথ্য সুস্পষ্ট যে, পূজাপ্রচলনের আদিপর্বে সবই ছিল তামসিক পূজা এবং প্রায় সমস্ত পূজাতেই নারীর স্থান ছিল মুখ্য বা অগ্রগণ্য। কারণ নারীসমাজই পূজা পরিকল্পনার উৎস বা সূত্র। আচার্য যোগেশচন্দ্র নবদুর্গার স্বরূপপরিচয়সূত্রে লিখেছেন—'নবপত্রিকার অর্থ কি? বাঁকুড়ায় কেহ কেহ প্রতিমার পূজা না করিয়া নবপত্রিকায় পূজা করেন। অতএব মনে হয়, নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা।'

(পূজাপার্বণ, পৃঃ ৭৮)

এইভাবে বনদুর্গা বা নবদুর্গা অথবা আকাল দুর্গা এঁদের আকৃতি-প্রকৃতি, এঁদের পূজোপকরণ ও পূজাপদ্ধতির স্বরূপ আলোচনা বিশ্লেষণ করলে একথা বুঝতে আদৌ দ্বিধা আসে না যে, একালের যেসব শাস্ত্রীয় দেবীমূর্তির পূজা আমাদের সভ্য সংস্কৃত সমাজে প্রচলিত, তাদের সকলেরই উৎস এই জাতীয় আদিবাসীদের কল্পিত তথাকথিত দেবদেবী-চরিত্র। বারমাস্যার মধ্যে নানা সূত্রে যে মনসাপূজার প্রসঙ্গ দেখা যায়, সে মনসাও যথার্থতঃ প্রজননশক্তির প্রতীক। আদি বা কৌম-সমাজের প্রজনন শক্তির পূজাই যে মনসাপূজায় পর্যবসিত, একথা স্বতঃসিদ্ধ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

'শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।'

(মলুয়া)

'শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা
সেই তে না পূরিল গো আমার মনের আশা ॥'

(সুনাইর বারমাসী)

'কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ন্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে ॥'

(কমলা)

বারমাস্যায় এই মনসার চরিত্র প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে যে উর্বরতাবাদের পূজা, যে প্রজননশক্তির পূজা প্রচলন ছিল, তারই সাক্ষ্য। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তিতে এরই স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।—

'বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক; কারণ উভয়ই উর্বরতাবাদের (fertility) প্রতীক। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে মৃৎ কিংবা প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়—অপুত্রক নারীগণ সন্তান কামনা করিয়া অশ্বত্থতলে নাগমূর্তি উপহার দিয়া কিংবা পূজা করিয়া ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাতে বৃক্ষ ও সর্পের সংগে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে।'

(বাইশ কবির মনসামঙ্গল, ভূমিকা-॥০)

দেবদেবীর আদি কল্পনায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা যে একান্ত পরিচালিত, সে কথার প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির একটি স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃতির প্রলোভন এড়াতে পাচ্ছিনা! তিনি বলেছেন—

"It is a fact that man created God in his own image to prove that religious thought had its origin not in the contemplation of nature, but in social strife. God in the conception of primitive man, was not an abstract concept, a fantastic being, but a real personage, armed with some implement of labour, master of some trade, a teacher and a fellow worker of men. God was artistic generalisation

of the achievements of labour, and the 'religious' thought of the toiling masses since it represented a purely artistic creativeness."—Maxim Gorky : 'Problems of Soviet Literature.'

বারমাস্যার এই সমস্ত দেব-ধ্যান ও দেবচরিত্র অনুধাবন ও বিশ্লেষণে ম্যাক্সিম গোর্কীর এই উক্তির সার্থকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এমনিভাবে ভারতীয় সাহিত্যের বারমাস্যায় দুর্গা, অম্বিকা বা চণ্ডিকা, কালী, ষষ্ঠী বা মনসা ইত্যাদি বিচিত্র শক্তিদেবতার পূজাপ্রসঙ্গে যেমন ভারতীয় দেবদেবীর পরিকল্পনার মূল সূত্রটি অর্থাৎ উর্বরতাবাদ বা প্রজননশক্তির কথা, সেই ঋতুপূজার কথা তথা নরনারীর অবাধ মেলনের কথাটি নিহিত, এখানকার বৈষ্ণব দেবতা বা যাবতীয় বৈষ্ণবোৎসব সম্পর্কেও সেই একই সত্য সমভাবে সক্রিয়। বৈষ্ণবোৎসবের মধ্যে হোলী বা দোল, ঝুলন, রাস, চাঁচেরি খেল এইগুলোই মুখ্য। যেমন—

'ফগুণে দোল গোবিন্দ, চাচেরি খেল যে বড় আনন্দ লো
বিধাতা হোইলা মন্দ,
(দোলি বারমাসী, উড়িয়া সাহিত্য

'ফাল্গুণে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥'
(সুশীলার বারমাস্যা)

'ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥'
(বিদ্যার বারমাসী)

'ফুল দোলে পূজা আদি কহিতে বিস্তর,'
(কমলার বারমাসী)

'ফাগুণে গুণিনাগর গুণমনি গুণিগণ ফাগুয়া খেলত রঙ্গে.'
(বারমাসী, গোবিন্দদাস)

'ফাগু করহিঁ সব চাঁচরি জোরী।
মোহি তন লাই দীনহ জস হোরী॥'
(পদমাবত্‌-নাগমতী বিয়োগ খণ্ড)

সহী আঁ ফাগ রচাএ
সানু সদ্দনে আঈআঁ
মেহনে দেঁদীআঁ তানে

(পাঞ্জাবী-বারমাস্যা)

বিভিন্ন শক্তি দেবতাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র শক্তি উৎসবের অন্তরালে আমরা তত্ত্বতঃ যে নরনারীর নৃত্যগীতাত্মক আনন্দোৎসবের পরিচয় পেয়েছি, ফাগু বা হোলী অথবা দোলখেলা, ঝুলন বা রাস-উৎসবের মধ্যেও সেই অনার্য জীবনের অশ্লীল গীতি ও অঙ্গভঙ্গিময় নরনারীর সম্ভোগাত্মক চিত্রই পরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। এসব উৎসবের সুবিস্তৃত পরিচয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'পূজা-পার্বণ', অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের 'হিন্দুসমাজের গড়ন', আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'ভারতের সংস্কৃতি' তথা অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এখানে তার সবিস্তারে উল্লেখের অবকাশ নেই। শুধু এইটুকুই আমাদের জেনে রাখবার যে, এগুলোর মধ্যেও সেই কৃষিনির্ভর সমাজের fertility cult বা উর্বরতাবাদ, সে জীবনের প্রজননশক্তির পূজা, অবাধ অশ্লীল আনন্দ সম্ভোগের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তাই আচার্য সেন মহাশয় বলেছেন—'হোলি বা দোলকে শূদ্রোৎসব বলে। তাতে যে-সব অশ্লীল গান হয়, তা যে কিছুতেই আর্য নয়, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। হোলির আগুণ এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের কাছ থেকেই আনতে হয়।' (ভারতের সংস্কৃতি, পৃঃ ২৬)

'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডক্টর রায় লিখেছেন—'এ তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা, সুশস্য উৎপাদকামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ ; তার পরের স্তরে কোন সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছলচাতুরী ও তামাসার।'

('বাঙালীর ইতিহাস' পৃঃ ৫৮৬)

হোলি বা দোলের মত শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন উৎসবও মৌল পরিচয়ে একান্ত লৌকিক উৎসব—রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে উৎসবের আদিপর্বে আমরা দোলায় দুলতে দেখি

নরনারীকে, যুবক-যুবতীকে। এই মানবীয় লীলা, একান্ত লৌকিক যৌন-উৎসবই উত্তরকালে রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক ঝুলন-উৎসবে পর্যবসিত, এ তথ্যেরও ইঙ্গিত আমরা নানা সূত্রেই পাচ্ছি।

এই চাঁচর, এই দোলি বা হোলি উৎসব, এই ফাগু খেলার মধ্যে চাপা পড়ে আছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির একেবারে নাড়ীর কথা। আজ বৈষ্ণব-উৎসব বলে, আর্য-উৎসব বলে এদের যে খণ্ডিত ও সাম্প্রদায়িক পরিচয় গড়ে উঠেছে, সে কথা একেবারেই 'এহো-বাহ্য'। বস্তুতঃ এ উৎসব বাংলারও যেমন, বিহারেরও তেমন, উড়িষ্যারও যেমন, পাঞ্জাবেরও তেমন, উত্তর-ভারতেরও যেমন, পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ-ভারতেরও তেমন। এ উৎসব বৈষ্ণবেরও বটে, শাক্তেরও বটে, শৈবেরও বটে, সৌরেরও বটে—এককথায় এ কোন সাম্প্রদায়িক উৎসব নয়। এ উৎসবের যদি কোন সার্থক ধর্মগত পরিচয় দিতে হয়, তাহলে সে পরিচয় আদি মানবধর্মের পরিচয়, জীবনধর্মের পরিচয়। আদি-বাসীদের জীবনের যে প্রজননশক্তির পূজা, উর্বরতাবাদের পূজার কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি, এ ধর্ম এ পূজার মধ্যে তারই ঐতিহ্য, ইতিহাস নিবদ্ধ রয়েছে। এ ধর্ম, এ সংস্কৃতি সর্ব-ভারতীয়; মনে হয় তাও শুধু নয়, এ ধর্ম, এ পূজা উৎসব বিশ্বগত জীবন সমাজ ও সভ্যতাসম্পর্কেও সমভাবে সত্য ও সিদ্ধ। যে কৃষিগত জীবনে, সভ্যতা সংস্কৃতির যে শৈশব পরিচয়ে ভারতের সব প্রদেশের মানুষের ধ্যান ছিল এক ও অভিন্ন, যে জীবনে ধর্ম ও উৎসব অনুষ্ঠানের প্রেরণা আসতো মানুষের অন্নময় সত্তা থেকে, বারমাস্যার দোলি বা হোলি উৎসব সেই জীবনের, সেই আদি মানবসত্তার সহজ পরিচয় বহন করে চলেছে। হোলি সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর মৌলিক আহরণের কিছু কিছু এখানে উদ্ধার করছি।—

'হোলি উপলক্ষে ভক্তিমূলক নানাবিধ গান ভিন্ন দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অশ্লীল গান গাওয়ার রীতি আছে।'

'বাঙলা দেশে এক সময়ে আদি রসাত্মক গানের প্রচলন ছিল, কিন্তু আজকাল তাহা আর নাই; শুধু পরিবারের মধ্যে যাহাদের সহিত ঠাট্টা তামাসার সম্পর্ক আছে, তাহাদের লইয়া দোলের সময়ে একটু বেশী আমোদ-প্রমোদ করা হয়।'

'রাজসাহী, মৈমনসিংহ, বরিশাল, মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পশ্চিমে হাজারিবাগ, এমন কি সুদূর কুমায়ুন পর্য্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাকে লোকে বিশেষ দৈবগুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা

করে। গঞ্জাম জেলায় সেই ছাই মাঠে ছড়াইলে দ্বিগুণ ফসল হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। কোথাও বা শস্যে পোকা লাগিবে না এই ভরসায় ছাই গোলার মধ্যে রাখিয়া দেয়। মধ্যপ্রদেশে গণ্ডজাতি হোলির আগুনে তপ্ত লাঙ্গলের ফাল দিয়া বৎসরে প্রথমবার ভূমিকর্ষণ সমাধা করে।'

'হোলাকা উৎসবের সঙ্গে তথাকথিত হীনজাতির সম্পর্কের একটি প্রমাণ বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়। এই উৎসব উপলক্ষে কোঙ্কণের ব্রাহ্মণগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত হীনজাতীয় কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে হয়, অথচ অপর সময়ে তাহাতে স্পর্শদোষ জন্মায়।'

'উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগে কন্ধজাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। প্রায় শত বৎসর হইতে কন্ধগণ বাধ্য হইয়া মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি দিয়া আসিতেছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুতিয়া দেওয়ার রীতি ছিল।'

'কন্ধ জাতির মধ্যে মেরিয়া-সংহার উপলক্ষে অসম্ভব মদ্যপান এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছ সংগমের রীতি ছিল।'

(হিন্দুসমাজের গড়ন, পৃঃ ১২-১৩)

লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, বাংলার তথা ভারতের যাবতীয় উৎসব, যাবতীয় দেবদেবীর পূজা-অর্চনার সেই আদি কথা—উর্বরতাবাদের কথা, প্রজনন-শক্তির পূজার তথ্য। ভারতের সব প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনা, বৈষ্ণবদের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন নেই, থাকা স্বাভাবিক বা যুক্তিসংগতও নয়। কিন্তু এই হোলি বা দোল উৎসবের পরিচয়প্রসঙ্গ তাবৎ ভারতীয় সাহিত্যের বারমাস্যার মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এর কারণ এতক্ষণে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই উৎসব আদি মানবসমাজের fertility cult বা উর্বরতাবাদের উৎসব। উৎসবের এই আদি মূর্তির দৃষ্টিতে বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী বা রাজস্থানীর মধ্যে কোন ভেদই নেই। ধর্মপালনে, উৎসবের অনুষ্ঠানে মানুষে মানুষে যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, তা এসেছে অনার্য-যুগের অবসানে বা আর্যসভ্যতার স্তরে। অনার্য স্তরে, যখন অন্ন ও প্রাণময় সত্তাই ছিল মানুষের একমাত্র সত্তা, তখন সকলের ধর্ম, সব দেশের উৎসবের

সত্য ও রহস্য ছিল অভিন্ন। বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ভাষার বারমাস্যার একই উৎসব অনুষ্ঠানগত পরিচয় তারই অভ্রান্ত অকাট্য সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আজ একই ভারতের বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র ও বিশিষ্ট সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মগত পরিচয় যখন অখণ্ড ভারতের মানুষকে নানাভাবে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে, তখন ভারতীয় বারমাস্যাগীতি অখণ্ড ভারতীয়তা, অবিচ্ছিন্ন মানবতার সূত্র বা ধ্বজা রূপে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ও বরণীয়।

বারমাস্যার অন্তর্নিহিত এই হোলি বা দোল উৎসব ভারতীয় সংস্কৃতির আরও একটি বিশেষ রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে। এখানে লোকাচার ও বেদাচার, লৌকিক ধর্ম-অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম-অনুষ্ঠান যে চিরদিন মেশামেশি হয়ে চলেছে, একমাত্র এই উৎসবটিই তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কারণ শারদোৎসবের মত, যার কথা আগেই বলেছি, দোলোৎসবও আসলে নববর্ষের উৎসব।

কিন্তু বারমাস্যার পূর্বোদ্ধৃত বিচিত্র ছত্রের মধ্যে দেখা গেল, দোল-উৎসব ফল্গু-উৎসবও বটে। যেখানেই দোলের কথা সেখানেই ফল্গু-উৎসবের কথা অভেদ্যভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্রের কথা স্মরণে এ দেশের লোকাচারের ও বেদাচারের সংমিশ্রণ সমন্বয়ের ধর্মটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন—'দোলোৎসব আদি, পরে ইহার সহিত বসন্ত প্রবেশজনিত উৎসব ও আরও পরে মদনোৎসব যুক্ত হয়েছে। দোলের সময় লোহিত ফাগ (ফল্গু) দিয়া শালগ্রামরূপী সবিতার অঙ্গ ভূষিত হয়। ঋগ্‌বেদে সবিতা হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি। তাঁহার রথ হিরণ্ময়। শীতকালে বালরবি লোহিতবর্ণ দেখায়। লোহিতচূর্ণ দিয়া তাহা জ্ঞাপিত হয়। এইরূপে দোলোৎসব ফল্গূৎসব হইয়াছে। বোধহয়, পিচকারী দ্বারা লোহিত জল নিক্ষেপ সবিতার হিরণ্য-রশ্মির অনুকরণ।'

(পূজা-পার্বণ পৃঃ ৯)

বৈষ্ণব অবৈষ্ণবসাহিত্য-নির্বিশেষে, বাংলা, বিহার ও পাঞ্জাব প্রদেশ নির্বিশেষে বারমাস্যার ফাল্গুনের চিত্রে সর্বত্রই যে নারীজীবনের বিরহ বা সম্ভোগাত্মক গীতিতে এই দোল বা ফল্গু-উৎসবের প্রসঙ্গ এনেছেন কবিমাত্রই, এর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—দোল-উৎসব, বসন্তোৎসব, মদনোৎসবও বটে। নারীমাত্রেরই জীবনে এ

উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একান্ত। ভারতীয় একক ধর্মানুষ্ঠান বা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে কালে কালে কত বিচিত্র লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের যে সংযোগ ঘটে গেছে, বারমাস্যার এই দোল বা ফল্গুৎসব তার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

বারমাস্যার এই দোল, হোলি বা ফল্গু-উৎসবের অন্তরে ভারতীয় ধর্ম ও সাধনা-সংস্কৃতির আরও এক বিরাট রহস্য নিহিত। ভারতীয় জীবন কৃষি-নির্ভর জীবন, তাই এখানকার সমস্ত ধ্যান ও জ্ঞানের উৎস মূলতঃ ও মুখ্যতঃ ভূমি বা জমি। কিন্তু ভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের যাত্রা শুরু হলেও পরিণতি তার ভূমাতে। জীবসত্তার দৈহিক বা বিষয়গত প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে এ জীবনের ধর্মবোধ জাগ্রত হলেও মানবসত্তার আত্মিক বা অতীন্দ্রিয় জীবনের পরিপূর্ণ ধ্যানে ও মননে তার সম্যক্ স্ফূর্তি ও প্রকাশ। এই হোলি-উৎসবের আদি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে ভারতের আদিকালের মানুষের নানা আদিম ও বন্যপ্রবৃত্তির চিহ্ন—উর্বরতাশক্তি বা প্রজননশক্তির পূজা-অর্চনার সূত্রে নানা উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত যৌন মনোভাব। মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবের প্রভাবে এর আদিরূপের কতকটা রদবদল হয়েছে, কতকটা রূপান্তর ভাবান্তর হয়েছে। কিন্তু তবুও মোটের উপর এ উৎসব প্রাকৃত মানুষের প্রাকৃত উৎসব এবং এই হোলি বা দোলিগীতি প্রাকৃত নরনারীর বিচিত্র যৌন-লালসা ও আমোদ-প্রমোদসূচক গীতি, সন্দেহ নেই।

কিন্তু,
'ফাগ খেলন কৈসে জাউঁ সখিরী
হরি হাথন পিচকারী রহতি হৈ ॥
সবকী চুনরিয়া কুসুম-রংগ বোরী
মোরী চুনরিয়া গুলনারী রহতি হৈ ॥'

(গণসাধনা ও গণসংগীত পৃঃ ১১৯)

'মারো মারো হে শ্যাম
তোমার পিচকারী হে
তাক লাগাইয়া আছেন দাঁড়াইয়া
সখিগণ সঙ্গে
আপনাকে আগলে রাখিয়া
রাধা প্যারী হে।'

(ঐ পৃঃ ১২০)

অথবা, 'গুরু বিন হোরী কোন খেলারে ॥
কোঈ পংথ লখারে ॥
করৈ কৌন নির্মল যা জী কো
মায়া মন তেঁ ছুড়াবৈ ॥
(ঐ পৃঃ ১২১)

ইত্যাদি গণসাধনা ও গণসংগীতের আকারে ভারতীয় সাধকদের কণ্ঠে এই হোলি-গীতির যে মর্ম পরিচয় মূর্ত হয়েছে, তা এক লোকোত্তর বস্তু। মানব-মনের আদিম কাম প্রবৃত্তি এখানে বিশ্বজনীন প্রেমের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। ভূমির গান ভূমার গানে পর্যবসিত হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের কর্মসংগীত এখানে বিশ্বমানুষের মর্মসংগীতে পরিণত। আর্থিক জগতের দেহধর্মী মানুষ নিঃসন্দেহে আত্মিক জগতের মনোধর্মী হৃদ্‌ধর্মী মানুষে পরিণত। বারমাস্যার সর্বত্র ছড়ান এই হোলি বা দোলি উৎসব ও সংগীত এই দৃষ্টিতে ভারতীয় সাধন-সংগীতের, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পরমতম সত্য ও রহস্যকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে।

বারমাস্যায় দোলের মত শ্রীকৃষ্ণের রাস বলে যে বৈষ্ণবোৎসবের পরিচয় বিভিন্ন স্থলে বিধৃত, তাও মূলতঃ আদিবাসী নরনারীর সম্মিলিত নৃত্যোৎসবেরই অভিজাত ও সংস্কৃত রূপ। সাঁওতালদের মধ্যে এ জাতীয় মণ্ডলাকারে নৃত্যের প্রচলন অত্যন্ত বেশী।

এতক্ষণে বারমাস্যার যে বিচিত্র ব্রতানুষ্ঠান, এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব-উৎসব ও পূজা-পার্বণের পরিচয় পেলাম, তার প্রায় সর্বত্রই দেখি, ভূমিপূজাই সব পূজা, সব পার্বণের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেইসূত্রেই উৎসবের উদ্ভব। অন্যান্য যে সমস্ত দেব-দেবীর প্রসঙ্গ ও তাদের পূজা অর্চনার যে বিচিত্র ক্রম ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, তা একান্ত পরবর্তী কালের আমদানী। বারমাস্যায় এ-জাতীয় নানা উৎসব ও পার্বণের মধ্যে দীপ-দান উৎসব অন্যতম।

'কার্তিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পূজা।
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা ॥'
(কমলার বারমাস্যা)

'আহিনর মাহত তুলসীর গোরে চাতি।
বিধবা ব্রাহ্মণী পুজে হাতে লৈয়া বাতি ॥'
(আসামী সাহিত্য—মধুমতীর গীত)

'চড়িয়া কত্তক মহীনা
ঘর ঘর জগদে নে দীরে ;
রো রো ভিজদী এ অঙ্গী
তানেঁ দেঁদীয়া স হীআঁ।'

(পাঞ্জাবী বারমাস্যা)

'কার্তিক মাসেতে কন্যা তুলসীর গোড়ে বাতি।
ঘুরি আসে তোমার সাধু কান্দে লইয়া ছাতি ॥'

(রংপুর জেলার কৃষকের বারমাস্যা)

এই যে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নকালের বিচিত্র ধরণের বারমাস্যায় একই দীপ-দানের প্রসঙ্গ, এখানেও ভারতীয় পার্বণ কৃত্যের সেই একই রহস্যই বিধৃত।

এমনিভাবে বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যে, এখানকার বিচিত্র পল্লীসাহিত্যে তথা অন্যান্য বিচিত্র ভারতীয় সাহিত্যে ছোট-বড় পূজা-পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের যে রূপ আমাদের কাছে ধরা দিল, তাতে এ সত্য সুস্পষ্ট যে, উর্বরতাবাদ বা প্রজননশক্তির পূজাই সমস্ত কিছুর মূল সুর। আর উর্বরতাবাদের সঙ্গে নরনারীর অবাধ সংগম-সম্ভোগ ও সম্মেলনের ঘনিষ্ঠ যোগ বলেই বারমাস্যার গীতিমাত্রই অল্পবিস্তর এই একই সুরে বাঁধা। সর্বত্রই দেখি নারীসমাজের গীতিবাদ্য ও নৃত্যোৎসবের আলেখ্য, যুবক-যুবতীর স্বচ্ছন্দ মিলন ও অসংযত আমোদ-উল্লাসের চিত্র। (প্রথম অধ্যায়ের 'কৃষিনির্ভর সমাজ ও প্রজননশক্তিব পূজা' এই ধারায় এ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত পরিচয় রেখে এসেছি)। ভারতীয় আর্যধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিপর্বে যে বিচিত্র অনার্য প্রভাব অতি প্রবল, এই জাতীয় উৎসব পরম্পরার অন্তর্গত নারীগণের গীতি ও নৃত্যোৎসব বৃত্তান্ত এ সত্যের পরম সমর্থক। এ উৎসব যে মূলতঃ আর্যধর্ম ও সাহিত্য বিনিন্দিত, তা বলাই বাহুল্য। কারণ গীতি বা নৃত্য আমাদের মৌলিক বেদাচার বিগর্হিত আচরণ। 'ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্য-গীত করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র ও নারীরাই তা করতে পারতেন। সমাজে গীতবাদ্য যাদের জীবিকা, তাদের স্থান খুব নীচে ছিল।'

(ভারতের সংস্কৃতি, পৃঃ ১১
—ক্ষিতিমোহন সেন)

বারমাস্যা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত এই লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গে এই মহাসত্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই কৃষি ও অরণ্যনির্ভর মানবজীবনে উর্বরতাবাদকে কেন্দ্র করে উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে মানব-জগতের যে আত্মীয়তার আলেখ্যটি পরিস্ফুট ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে লোকধর্ম ও সংস্কৃতির এ আলেখ্য শুধু সর্বভারতীয় নয়, বিশ্বগতজীবনের আলেখ্য। এখানে ভারতীয় ও অভারতীয় জীবন একই সূত্রে গ্রথিত, একমন্ত্রেই দীক্ষিত। ভারতের দোলি বা হোলি-উৎসব, এখানকার শরৎ-বসন্ত-বর্ষা বা হেমন্তোৎসবের মধ্যে অভারতীয় জীবনের ধর্ম-কর্মের আদি ভাব ও সুর অবিকল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

'In various parts of Europe customs have prevailed both at spring and harvest which are clearly based on the same crude notion that the relation of the human sexes to each other can be so used as to quicken the growth of plantains.

In some parts of Germany at harvest the men and women, who have reaped the corn, roll together on the field. This again is probably a mitigation of an older and ruder custom designed to impart fertility to the fields by methods like those resorted to by the Pipiles of Central America long ago and by the cultivators of rice in Java at the present time.'

('The Influence of the Sexes on Vagetation'
—The Golden Bough—Frazer)

বারমাস্যার মধ্যে ভারতীয় জীবনের আশ্বিন-কার্তিক মাসে দীপ-দান বা আকাশ প্রদীপ জ্বালানব যে সুচিরপ্রচলিত প্রথার পরিচয় নিহিত আছে, তার মধ্যেও বহির্বিশ্বের আদি ধর্ম সংস্কৃতির সাম্য স্বারূপ্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বলতেই হবে।

'In the Lati, Sarmata and some other groups of islands which lie between the western end of New Guinea and the northern part of Australia, the heathen population regard the sun as the male principle by whom the earth or female principle is fertilised. They call him Upu-era

or Mr. Sun, and represent him under the form of a lamp made of cocoa-nut leaves, which may be seen hanging everywhere in their houses and in the Sacred fig-tree .'

(The Golden Bough-Frazer)

আজ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে আকাশ প্রদীপ-দানের মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৈবদৃষ্টি, আধ্যাত্মিক গুরুত্ব, মহিমা আরোপিত হয়েছে এবং ভারতীয় ধর্ম-কর্মের বা পূজা অনুষ্ঠানের আরও অনেকগুলো ধারা এমনিভাবে কালোচিত নানা সংস্কার মার্জনা পেয়ে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তাদের আদি বা মৌলিক চরিত্র থেকে দূরে সরে এসেছে। এ সংস্কার বা ধ্যান-ধারণাগুলো একান্ত ভারতীয় বলেই আমাদের এখন দৃঢ় ধারণা। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে এমনিভাবে ধরে দেখলে দেখা যায়, সেই আদিপর্বে ও-পারের ও এ-পারের জীবনের আধুনিক যুগের এই মৌলিক ও ঐকান্তিক পার্থক্য স্বতঃই ছিল না। সৃষ্টির আদিপর্বে প্রাচ্যের মানুষ আর পাশ্চাত্ত্যের মানুষ, নিসর্গের লালনায় প্রাচ্যের পূজা ও ধ্যান এবং পাশ্চাত্ত্যের পূজা ও ধ্যান মূলতঃ সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন রকমের, তা নয়। এ সত্য বারমাস্যার জগৎ থেকে, বারমাস্যা জগতের পূজা-পার্বণ, ধর্ম-কর্মের মৌলিক রূপ রহস্য থেকে আমাদের কাছে আর অস্পষ্ট থাকতে পারে না।

বারমাস্যা সাহিত্যের একদিকে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই আদি বা অনার্য রুচি রূপের পরিচয় যেমন বিধৃত, এরই পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃত ও মার্জিত রুচির নিদর্শনও কিছু দুর্লভ নয়। হিংসার পরিবর্তে অহিংসা, ভোগের জায়গায় ত্যাগ, গ্রহণের পরিবর্তে দান, আমিষ আহারের পরিবর্তে নিরামিষ ভক্ষণ এবং সংযম ও নিবৃত্তি মার্গের কথা, বারমাস্যার অনেক অংশে এই শাস্ত্রশাসিত ও আর্য ব্রাহ্মণ্যজীবনের আলেখ্যও লক্ষণীয়।

'মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খায়।
শ্রীভাগবত পড় আর শিষ্যের পড়ায়॥
বলি বৈশ্য শ্রাদ্ধ কর ভূদেব আচার।
পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার॥'

(বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা—চৈতন্যমঙ্গল-জয়ানন্দ)

'পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া দ্বিজের পূরিব অভিলাষ॥'
'পুণ্য কার্তিক মাস, পুণ্য কার্তিক মাস।
দান দিয়া তুষিও দ্বিজের অভিলাষ॥'
'মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্নান
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥'

(সুশীলার বারমাস্যা—চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম)

পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠানের এই জাতীয় ধারায় অনার্য ও অব্রাহ্মণ্য ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির উপর আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, লোক-সংস্কৃতির উপর পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বারমাস্যার পূজা-পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের বিচিত্র পর্যায়ে এই যে আর্য ও অনার্য ধর্ম, লোকাচার ও শাস্ত্রাচার, গ্রন্থ ও মন্ত্রশাসিত জীবনের পরিচয় নিহিত, সমগ্র ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্টতা এরই মধ্যে অনুসন্ধেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক বা অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতি যখন প্রশস্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আওতায় এসে নতুন করে ঘর বাঁধে, তখন আদি ও অনার্য জীবন-পর্বের কোন ধারা, কোন আদর্শ, কোন বিশ্বাস. সংস্কারই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়নি। বলিষ্ঠ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র অঙ্গরূপে সকলই 'এক দেহে হল লীন'।

বিচিত্র বারমাস্যার অন্তর্নিহিত জীবন, এখানকার ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কার যে আমাদের বৈদিক জীবন, পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কার এবং স্মার্ত বিধি-বিধানেরও আধার, অথবা পুরাণ ও শ্রুতি স্মৃতিশাস্ত্রের ধর্ম ও আচার এবং বিধি-বিধান যে লোকায়ত জীবনেরও অনায়ত্ত ছিল না, এখানে তারই কিছু কিছু প্রমাণ পরিচয় প্রদান করছি। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে সুশীলার বারমাস্যায়—

'পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস
দান দিয়া দ্বিজের পূরিব অভিলাষ॥'

অথবা

'পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস
দান দিয়া তুষিও দ্বিজের অভিলাষ॥'

ইত্যাদি রূপে বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসের যে বিশিষ্ট মহিমা বারমাস্যার অন্তর্গত

অশিক্ষিত নারীচরিত্রের মাধ্যমে গীত হয়েছে, পুরাণের মধ্যে বিচিত্র মাস-মাহাত্ম্য বর্ণনায় এই একই সুর স্পষ্টভাবে ধ্বনিত।—

'ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং পৌর্ণ মাস্যাং চ মাধবে।
স্নানং দানং পূজনং চ কথা-শ্রবণমেব চ॥
বৈশাখ ধর্ম নিরতঃ সর্বে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥'

(বৈশাখ মাহাত্ম্যম্-স্কন্দ পুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড)

কার্তিকঃ খলু বৈ মাসঃ সর্বমাসেষু চোত্তমঃ॥
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্॥
অস্মিন্মাসে ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সন্নিহিতা মুনে।
অত্র স্নানানি দানানি ভোজনানি ব্রতানি চ॥
তিল ধেনুং হিরণ্যঞ্চ রজতং ভূমিবাসসী।
গোপ্রদানানি কুর্বন্তি সর্বভাবেন নারদ॥
তানি দানানি দত্তানি গৃহ্ণন্তি বিধিবৎ সুরাঃ॥'

(কার্তিকমাস মাহাত্ম্যম্—ঐ)

বারমাস্যার মধ্যে নানাসূত্রে মাঘ মাসের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও এই মাসের স্নান ও দান-ধ্যানাদিজনিত পুণ্যার্জনের কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়।—

(ক) 'মকর উৎসব মহাপুণ্য সে বনর।
স্নাহান করন্তে রাম গঙ্গারে মোহর॥'

(হলিআ বারমাসী—পল্লীগীতি সঞ্চয়ন, কুঞ্জবিহারী দাস)

(খ) মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খায়,
শ্রীভাগবত পঢ় আর শিষ্যের পঢ়ায়॥

(বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা—চৈতন্যমঙ্গল-জয়ানন্দ)

(গ) মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্নান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥

(সুশীলার বারমাস্যা—চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম)

(ঘ) ফুল্লরার আছে কত কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥

(ফুল্লরা—কবিকঙ্কণ)

(ঙ) মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মৌন॥

মাঘ মাসের এই মকর স্নান ও উৎসবের কথা, এই নিরামিষ আহার এবং নিয়ম-নিষ্ঠা সহযোগে পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণের বিধি-বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও নানাভাবে উল্লিখিত।—

"মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্চ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদো ভব।
দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তুতে।
পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতঃ॥"

(অষ্টাবিংশতিতত্ত্বান্তর্গত কৃত্যতত্ত্বম্)

'সংপ্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে শুভে।
কর্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিৎ ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ॥'

(স্কন্দ পুরাণম্)

'স্বর্গলোকে চিরং বাসো যেষাং মনসি বর্ততে।
যত্র ক্বাপি জলে তৈস্তু স্নাতব্যং মৃগভাস্করে॥'

(কৃত্যতত্ত্বম্)

'পৌষ্যান্তু সমতীতায়াং যাবদ্ভবতি পূর্ণিমা।
মাঘমাসস্ত দেবেশ পূজা বিষ্ণো বিধীয়তে।'
পৌর্ণমাস্যন্ত মাঘমুপক্রম্য
'পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ মূলকং নৈব দাপয়েৎ।
দদন্নরকমাপ্নোতি ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণো যদি॥'

(স্কন্দপুরাণধৃত মলমাসতত্ত্ব)

মাঘ মাস-সংক্রান্ত এই শাস্ত্রীয় বিচিত্র বিধি-বিধান এবং বারমাস্যার অন্তর্গত আচার-নিয়ম বুঝে এ ধারণা আমাদের দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে যে, এদেশের শাস্ত্রশাসিত উন্নতজীবন ও শাস্ত্রবহির্ভূত অনুন্নত বা প্রাকৃত জীবন পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপূরক। জীবনের এই দুই ধারা কোনদিনই পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট নয়; অথবা ভারতে কোন নতুন ধর্ম ও সভ্যতার আবির্ভাবে পুরাতন ধর্ম বা সভ্যতা একেবারে নির্জিত, উপেক্ষিত হয়নি কোথাও।

বারমাস্যার অন্তর্গত অনুরূপ আরও অনেকগুলো নিদর্শন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির এই বিশিষ্টতার সাক্ষ্য। একটু আগেই বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসের বিচিত্র কৃত্যাদির সূত্রে ভারতের লোকজীবন ও শাস্ত্রবদ্ধ জীবনের যে আত্মীয়তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো, অন্যান্য মাসের সম্পর্কেও একই সত্য সমভাবে সক্রিয়। কবি ভবানীশংকর দাস বিরচিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সুশীলার বারমাস্যায় দেখি :

'অগ্রাণেতে নাগেশ্বর কাল উপস্থিত।
হেন সমে যাইতে বল নহে যে উচিত॥

এই নাগেশ্বর কাল বা নাগপূজা নিঃসন্দেহে পুরাণ বিধৃত বিধিরই প্রতিরূপ।—

'শুক্লা মার্গ শিরে পুণ্যা শ্রাবণে যা চ পঞ্চমী।
স্নান দানৈ র্বহুফলা নাগলোক প্রদায়িনী॥'

পুরাণের এই অংশে স্পষ্টই উল্লিখিত দেখা যায়,—

'মার্গশীর্ষ শুক্লপঞ্চম্যাং নাগ পূজোক্তা।'

(হেমাদ্রি নির্ণয় সিন্ধুধৃত স্কন্দপুরাণ বচন)

আবার 'পদমাবৎ' কাব্যের নাগমতী বিয়োগ খণ্ডে নাগমতীর বিরহ বারমাস্যায়,

'উআ অগস্ত, হবিত-ঘন গাজা।
তুরয় পলানি চঢে বণ বাজা॥'

ইত্যাদি রূপে আশ্বিন মাসে অগস্ত্য পূজার যে প্রসঙ্গ দেখা যায়, তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণধৃত নিম্নোদ্ধৃত বচনেরই প্রতিধ্বনি বলতে হবে :

'অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষ ভূতৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ
অর্ঘ্যং দদ্যুরগস্ত্যায গৌড দেশ-নিবাসিনঃ॥'

আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভারতের সর্বত্র বা অধিকাংশ অঞ্চলে যে সন্ধ্যায় দীপদানের প্রথার কথা আগে উল্লেখ করেছি এবং যার মূলে শুধু সর্বভারতীয় নয়, বিশ্বগত নানা পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মর্মকথা—উর্বরতাবাদ বা Fertility cult নিহিত ; পৌরাণিক সাহিত্যে তারও বিশিষ্ট স্থান আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

'কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে গগনে স্বচ্ছতারকে।
রাত্রৌ লক্ষ্মীঃ সমায়াতি দ্রষ্টুং ভুবন-কৌতুকম্।
যত্র যত্র চ দীপান্ সা পশ্যত্যব্ধিসমুদ্ভবা॥

তত্র তত্র রতিং কুর্যান্নান্ধকারে কদাচন ॥
তস্মাদ্দীপঃ স্থাপনীয়ঃ কার্তিকে মাসি বৈ সদা ॥

*   *   *   *   *

দত্ত্বাত্ৰাত্রৌ পঞ্চনদে দীপং যো বিধিপূর্বকম্ ॥
তস্য বংশে প্রজায়ন্তে বালকাঃ কুলদীপকাঃ' ॥

(কাতিকমাস মাহাত্ম্যম্, স্কন্দপুরাণম—বিষ্ণুখণ্ড)

এখানে যদিও লক্ষ্মীর অনুগ্রহ বা শ্রী-সম্পদ্ লাভই দীপ-দানের ফলরূপে আপাতঃ বর্ণিত হয়েছে, তথাপি 'তস্য বংশে প্রজায়ন্তে বালকাঃ কুলদীপকাঃ' এই শেষ ছত্রের মধ্যে বারমাস্যার অন্তর্নিহিত সভ্যতার আদিপর্বের সেই প্রজননশক্তির পূজার ইঙ্গিতটি কিছু অস্পষ্ট মনে হয় না। এইখানেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ ও স্বধর্ম স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের যে কোনটির আদ্য ও অন্ত্যকার পরিচয় মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এর পরলে পরলে মিশে আছে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার সূতিকাগারের কথা, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার কথা—বর্জননীতির পরিবর্তে অর্জন-আদর্শের কথা।

বারমাস্যার মত দু'চারিটি চাতুর্মাস্যারও কথা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। বারোটি মাসের স্থলে মাত্র চারটি মাসের পরিচয় এখানে থাকলেও প্রকৃতিতে এগুলো অবিকল বারমাস্যারই সগোত্র। বাংলা সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার বিরহচাতুর্মাস্য এবং পদকল্পতরুর অন্তর্গত সিংহভূপতির চাতুর্মাস্য উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করবার, উভয়ত্রই 'আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই চার মাসই বর্ণনার কাল। চাতুর্মাস্যব্রত প্রসঙ্গে মলমাসতত্ত্বে রঘুনাথ ভট্টাচার্য ধৃত বরাহপুরাণীয় বচন এই চাতুর্মাস্যারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয় :

'আষাঢ় শুক্ল দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভং কুর্যাৎ কর্কট সংক্রমে।
অভাবেপি তুলার্কেপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ।'

এমনিভাবে ভারতীয় বারমাস্যা সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ উপাদান অজস্র ভাবসম্পদ স্পষ্টতঃই বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এ ধারার উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বারমাস্যার জগতে ভারতীয় ধর্ম অথবা তাবৎ মানবধর্মের যে আদিপর্বের কথা নিহিত, যে ম্যাজিক বা যাদুশক্তির কথা

বিধৃত, যে প্রজননশক্তির পূজার ইতিহাস, যে ঋতু-উৎসবের ঐতিহ্য নিহিত, আজও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিময় জীবনে, পূজা-পার্বণময় জীবনে, সে ইতিহাস ঐতিহ্য একেবারে অতীতের কথা হয়ে পড়েনি। এ জীবনের, এ সমাজের পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের উপরের স্তরে অনেক নবীনতার প্রলেপ পড়েছে, আধুনিকতার রঙ লেগেছে সত্য, কিন্তু সমস্ত কিছুর মর্মমূলে সেই হাজার বছরের আগেকার যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য আজও অম্লান। ভারতবর্ষ কোন কিছুই কোনদিন ফেলে দেয় না, নূতনে পুরাতনে এখানকার ধর্ম, এখানকার সমাজ, এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপুল ও বিরাট। যুগে যুগে বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন যুগের বিচিত্র বারমাস্যা এবং এর অন্তর্গত বিশ্বাস, সংস্কার এবং ধ্যান ও আদর্শ মহাভারতীয় জীবনের এই মহাসত্যের ধারক।

ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার যে পর্বে বারমাস্যার অন্তর্গত আদিম মানব বিশ্বাস, সংস্কারের জন্ম, আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে নানাভাবেই। আজ আর সেদিনের মত লোকে বন্ধ্যা ভার্যাকে কৃষিগত জীবনের সফলতার প্রতিবন্ধক কল্পনা করে না। জনসাধারণের বিষয়গত বা ব্যবহারিক জীবনের কাঠামো বদলে যাওয়ায় সেদিনের মত ঋতুতে ঋতুতে শস্যের ও ফল-পুষ্পের বিচিত্র অবস্থায় ঋতু-উৎসব, শস্যোৎসবের ঘটাঘটার আয়োজনও ফুরিয়েছে। পূজোর বেদীতে নিসর্গের বিচিত্র মূর্তির পরিবর্তে বিজ্ঞান ভারতীর প্রতিকৃতি এখন স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতের ভৌগোলিক সংস্থা, নৈসর্গিক আলেখ্য আজও সেদিনে যা ছিল, স্থূলতঃ তাই-ই আছে। আজও সম্বৎসরে পর্যায়ক্রমে ষড়ঋতুর আবির্ভাব অনেকটা তেমনিই আছে। কাজেই বাহ্যজীবনের সহস্র পরিবর্তন-বিবর্তন সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত জীবনের মৌল পরিচয়, ভারতের ধর্মতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব সাংস্কৃতিকতত্ত্ব ও তথ্য সন্ধান করতে গেলে বারমাস্যার রাজ্যটি আমাদের পরমার্থ-সাধক, সেকথা এখন আর বলাই বাহুল্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বারমাস্যার সাহিত্যধর্ম

বারমাস্যা লোকসংগীতের অন্যতম ধারা। এর সাহিত্য-মূল্য, মর্যাদা অভিজাত সাহিত্যের পরিবর্তে লোকসাহিত্যের দৃষ্টিতেই বিচার্য। সার্থক লোকসাহিত্যমাত্রই যেমন ব্যক্তিবিশেষের সযত্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অযত্নসম্ভূত স্বয়ংসৃষ্ট বস্তু, মৌলিক বা সহজ বারমাস্যাও তেমনি স্বয়ম্ভু, আদিপর্বের মানব-মানবীর জীবনের অবস্থাবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত। প্রকৃতির বিচিত্র ও বিশিষ্ট পটভূমিকায় মানবচিত্তের বিরহমিলন, সুখদুঃখের সুর ও ছন্দময় অভিব্যক্তি এই বারমাসীগীতি। কালক্রমে বারমাসীগীতি তার আদিপর্বের সহজ ও অকৃত্রিম চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু এর মৌল পরিচয়ে গীত হিসাবে এ একান্তই সহজ প্রেমগাতি, জীবনসংগীত। তাই লৌকিক প্রেমগীতির স্বভাবধর্ম অনুসারে বারমাস্যার প্রথম সাহিত্যধর্ম এখানকার জীবনের সহজ স্পন্দন, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহ। সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ-মালার মুখ্যবস্তু মানবজীবন। জীবন থেকেই সাহিত্যের উদ্ভব এবং জীবনের প্রকাশই সাহিত্য। যেখানে জীবনের যেমন মান, সেখানে সাহিত্যের অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি। এ'দিক দিয়ে বারমাস্যা সাহিত্য যে জীবনের প্রতিভূ, তা স্থূলতঃ সেই আদিপর্বের মানবজীবন—মাটি আর জল, আকাশ ও বাতাস যেখানে মানুষের স্বজন ও পরিজন। এখানকার মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা সবেরই উৎস উন্মুক্ত প্রকৃতি।

বর্তমান যুগের বিচিত্র সংস্কৃতিপ্রাপ্ত সাহিত্যে আমরা যে জীবন প্রত্যক্ষ করি, তার গড়নে-পিটনে হাত, প্রকৃতি ছাড়া আরও কত কিছু শক্তির, কত শাস্ত্রের, কত তন্ত্র, কত মন্ত্রের, কত বিচিত্র ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির। এ জীবন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ও সমৃদ্ধ, এর রুচি ও রূপ নানাসূত্রে নানাভাবে প্রভাবিত। কাজেই এ যুগের রস-সাহিত্যে যে জীবন ও যে মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে জীবনে ঐশ্বর্য আছে, আড়ম্বর আছে, কিন্তু স্বাভাবিকতা ও সরলতার দীনতা ধরা না পড়ে যায় না। বায়ুস্পন্দনের সংগে যে মানুষ অনুভব করে অভিনব হৃৎস্পন্দন, দাদুরী ডাহুকীর ডাক যাকে ডাকে প্রিয়তম আত্মীয়ের, অন্তরঙ্গের মত,

সে মানুষের চেহারাটি দুর্লভ হয়ে উঠেছে একান্ত, এ যুগের অভিজাত নাগর কাব্য সাহিত্যে। এখনকার সাহিত্যে দেখি শিক্ষিত ও শিল্পী মানুষকে, জ্ঞানী-মানী ও গুণী মানুষকে, কিন্তু অভাববোধ করি সেই মানুষের যারা উদাত্ত কণ্ঠে গায়—

'ভূঁই মো গো মাতাপিতা, ভূঁই মোর গো পুত।
ভূঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ॥'

এই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে মাটির গলা জড়িয়ে মাটির সংগে এমন করে কোলাকুলি করার মানুষ এই বিজ্ঞানশাসিত যুগে পরম দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এ যুগের সাহিত্যে বিদ্বান মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ, কৌশলী মানুষ, শিল্পী মানুষের ছড়াছড়ি গেলেও মাটির হাতে গড়া সহজ সুন্দর মানুষ, হৃদয়বান ও নিসর্গ-নির্ভর মানুষ কেমন যেন স্বপ্নের বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই বারমাস্যার সাহিত্যধর্মের প্রধান কথা, এই সহজ জীবন, অনাবিল অকপট মানবতার কথা।

বারমাস্যার নারীচরিত্র ও তার সাহিত্যিক মূল্য ঃ আগেই আমরা বলে এসেছি বারমাস্যা বলতে মুখ্যতঃ বিরহ বারমাস্যাই বোঝায় এবং বারমাস্যার অন্তর্নিহিত মানবচরিত্র বলতে বোঝায় বিরহিণী নায়িকার চরিত্র, দুঃখ-দুর্দশা-জর্জরিত নারীচরিত্র। বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যের আগাগোড়াই নারীপ্রধান। কি লোকসাহিত্য, কি অভিজাত সাহিত্য, পলিমাটিতে গড়া, পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষে পুরুষের বুদ্ধিমত্তা বা শৌর্য-বীর্যের অপেক্ষা নারীর হৃদয়বত্তা এবং প্রেম ও সেবাধর্মই আবহমানকাল জাতীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে। ভারতবাসী বীর্যবান অথবা রণকুশলী জাতি এ পরিচয়ের পরিবর্তে হৃদয়বান্, ক্ষমাশীল জাতি এই পরিচয়ই ভারতের জাতীয় চরিত্র, জাতীয় জীবনের পরিচয়। আর সে পরিচয়ে পুরুষ অপেক্ষা ভারতীয় নারীচরিত্রই নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। ভারতীয় আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগের কাব্যে, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে—সাহিত্যমাত্রেই এ সত্য সমভাবে বিধৃত। বারমাস্যা সাহিত্যও ভারতীয় চরিত্রের এই বিশিষ্টতার সার্থক ধারক। এখানকার ফুল্লরা, খুল্লনা, পদ্মাবতী, নাগমতী, বিষ্ণুপ্রিয়া অথবা সীতা বা বেহুলা ভারতের শাশ্বত ও সনাতন নারীত্বের সার্থক প্রতিভূ। রামায়ণ-মহাভারতের সীতা, সাবিত্রী অথবা অহল্যা, দ্রৌপদী বা দময়ন্তী ভারতীয় নারীত্বের প্রতীকরূপে যেমন চিরস্মরণীয়, বারমাস্যার খুল্লনা, সুশীলা, নাগমতী, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতিও নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের অভ্রান্ত আদর্শ।

'সুরজ! তপীও না উথে
জিথে পীআ গিআ রে।
লূউ! ঠনদীআঁ হে রগণা
জিথে জিন্দী ম্যায়্ গঈআ।'
(পাঞ্জাবী বারমাস্যা)

'অনশনব্রত করি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি'
(খুল্লনার বারমাস্যা)

অথবা

'আত্মমাংস কাটি, দেবি যুগাইল আহার।
ছাড়িয়া পলাইল বাঘে বুঝি ব্যবহার॥'
(বেহুলার অষ্টমাসী)

এই সমস্ত অংশে নারীত্বের যে অনবদ্য আলেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে, ভারতবাসি মাত্রেরই কাছে তা পরম গৌরব গরিমার কথা এবং বারমাস্যার সাহিত্যমূল্যং এইখানে। এ সাহিত্য ভাষা, ছন্দ বা শিল্প সুষমাগত পরিচয়ে আপাততঃ একাং দীনহীন, একান্ত গ্রাম্য ও লঘু প্রকৃতির হলেও নারীচরিত্রের মাধুর্য ঐশ্বর্য নারীজীবনের অপূর্ব পাতিব্রত্য আত্মবিস্মৃতিমূলক সেবা ও শুশ্রূষা এর সাহিত্য মূল্য মর্যাদার অন্যতম নিদান।

সার্থক সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মানব-মানবী চরিত্র জাতীয় জীবনের অতীত ও বর্তমানকে মুখোমুখী করে দেয়, সরিয়ে দেয় তাদের মধ্যেকার হাজা বছরেরও ব্যবধানের পরদাকে। জাতি প্রাচীন সাহিত্যের এই জাতীয় চিরকালী চরিত্রগুলোকে ভর করে দুই কালের জীবনরূপকে একসূত্রে গেঁথে নেয়, খুঁ পায় তার জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ঐতিহ্যের যাবতীয় রহস্য ও গোপন মন্ত্রকে ভারতীয় বারমাস্যার অন্তর্নিহিত বিচিত্র নারীচরিত্র অতীত ও বর্তমান ভারতী সমাজ ও জীবনের সংযোগসূত্ররূপে চিরস্মরণীয়। কবিবর ভারতচন্দ্রের উক্তি:

'করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী॥'

বারমাস্যার নারীচরিত্র সম্পর্কে পরম সার্থক ও সংগত। বারমাসে পতি পুত্রের কল্যাণ-মঙ্গল কামনায় নারীজীবনের কতই না বারব্রত পালন। কার্তিব

ব্রত, ষষ্ঠীপূজা, মনসাঅর্চনা পৌর্ণমাসীব্রত উপলক্ষে, কত অনশন, অর্ধাশন, কত না দুঃখ-ক্লেশ বরণ অকাতরে, হাসিমুখে! তাই:

'আকৃতি প্রেমসরসা বিলাসালসগামিনীঃ।
অসারে দগ্ধ সংসারে সারং সারঙ্গলোচনাঃ॥

(সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্)

ভারতীয় স্ত্রীচরিত্রের এই প্রশংসাবাদ বারমাস্যার নারীচরিত্র সম্পর্কে সার্থকভাবেই প্রযোজ্য।

একদিকে বারমাস্যায় শাশ্বত নারীচরিত্রের এই প্রেম-প্রীতির দিক যেমন উদ্ভাসিত, অপরদিকে নারীচরিত্রের অজস্র বিশ্বাস, সংস্কারের দিকটিও বারমাস্যার মধ্যে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে। নারীজীবন আশৈশব বিচিত্র বিশ্বাস সংস্কারে ভরা, এ জীবনের ধর্ম ও কর্মে, আচার ও আচরণে, পাপ ও পুণ্যবোধের প্রতি পদেই অজস্র অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কার ক্রিয়াশীল। স্বাধীন সত্তার, সংস্কারমুক্ত সত্তার বিচার বিশ্লেষণ এবং তারই দৃষ্টিতে কর্ম ও ধর্মসাধন নারীচরিত্রে অজানা বস্তু। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, তারা নানাভাবে নানা উদ্ভট, উৎকট ধারণা সংস্কারের দাস। অল্পবিস্তর মানবমাত্রেরই সম্পর্কে অবস্থাবিশেষে একথা সত্য বটে, তবে পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্র সম্পর্কে এই অতিবিশ্বাসপ্রবণতা, সংস্কারাচ্ছন্নতার পরিচয় সবিশেষ উল্লেখনীয়। এবং এযুগে স্ত্রীশিক্ষা, নারী প্রগতির রটাঘটা সত্ত্বেও বারমাস্যার অন্তর্নিহিত এই অশিক্ষিত একান্ত গ্রাম্য-নারীচরিত্রের সঙ্গে একালের এই সুশিক্ষিত নাগর রমণীচরিত্রের অন্তঃপুরের পরিচয়ের সাজাত্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এই দুই ভিন্ন কালের, স্বতন্ত্র সমাজের নারীজীবনের বৈষম্য, বৈসাদৃশ্য যা কিছু, সব জীবনের উপরের স্তরেই; এর আড়ালে আড়ালে উভয়েরই ধ্যান ও ধারণা প্রায় এক ও অভিন্ন:

"হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে।
পরাদস্ত সাক্ষী করি সভার বিদ্যমানে॥"

(কমলার বারমাস্যা)

'পূজুক পূজুক পূজা মাগিয়া লব বর।
আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল॥'

(কৃষকের রংপুর জেলার জীবন হইতে সংগৃহীত বারমাস্যা)

'পৌষ মাসে পোষা আন্দি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ।'

(মলুয়ার বারমাস্যা)

বারমাস্যার নারীচরিত্রের এই বিশিষ্টতা একালের শিক্ষিত, সংস্কৃত নারী-চরিত্রেও নানাভাবে লক্ষ্য হয়ে থাকে। নারীচরিত্রের এই বিশিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে একটি প্রাজ্ঞ উক্তি এ সূত্রে স্মরণীয় মনে করি :—

"The life of women from the cradle to the grave has always, from the earliest period, been surrounded with all manners of curious beliefs. And strange to say, even at the present day, these old-world fancies—childish as they only too frequently are—exercise, not unfrequently, a strong influence even in high places upon womankind, and oftentimes, they crop up in the most unexpected manner when urged in support of some event in a woman's life."

বারমাস্যার নারীচরিত্র তাদের সবলতা-দুর্বলতা, ভালমন্দ নিয়ে এমনিভাবে চিরন্তন নারী চরিত্র—শুধু ভারতীয়ই নয়, সর্বদেশীয়, সর্বকালীন সহজ ও স্বভাব-সঙ্গত নারীচরিত্র, এবং এই সহজ-সুন্দর চিরন্তন নারীচরিত্রের আধাররূপে বারমাস্যা ভারতের অন্যতম সার্থক সাহিত্য-পদবাচ্য—একথা অস্বীকার করা চলে না।

আগেই বলেছি, বিচিত্র বারমাস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপটি ধরা দিয়েছে বিরহ বারমাসীর মধ্যে। আবার বারমাস্যার বিশিষ্ট সাহিত্য ধর্মটিও ব্যক্ত ও ব্যঞ্জিত এই বিরহের সুরে। প্রোষিতভর্তৃকা নারীর এই বিরহ ব্যথা-বেদনার মধ্যে প্রতিটি মানব-মানবী পায় তার হৃদয়কন্দরের চিরসঞ্চিত বিরহ-ব্যথা প্রকাশের অকৃত্রিম অকপট ভাষা। কারণ অন্তরের অন্তরে মানবমাত্রেই বিরহী এবং এই বিরহ-ব্যথা বিরহজ্বালার মধ্যেই তার মানবতার প্রকাশ ও পরিচয়। এখানে জ্বালার মধ্যে আছে এক পরম স্বস্তি ও সান্ত্বনা। কাজেই বারমাস্যার এই নায়িকা জীবনের বিরহ, তার আর্তি ও আর্তনাদ, ক্ষণিক মানুষের অন্তর্নিহিত চিরমানুষের জন্য আর্তি ও ক্রন্দনেরই প্রতিরূপ। তাই মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষ, বারমাস্যার বিরহিণী নায়িকা—এরা সকলেই সব দেশের, সব কালের

নরনারীর পরম আত্মীয়, একান্ত স্বজন। অভিশপ্ত যক্ষ তার প্রাণপ্রতিম প্রিয়তমার জন্য একান্ত ব্যাকুল। কিন্তু কোথায় রামগিরি আর কোথায় অলকা! উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অগণিত নদনদী-পর্বত-প্রান্তর এবং অরণ্য, জনপদের। তার চিত্তে আছে দুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা-কামনা। কিন্তু তার অবস্থা—

"উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিক তরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী।
সংকল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ॥"

প্রতিকূল বিধি তার অন্তরের অভীষ্ট জনকে পাওয়ার পথে দুরন্ত অন্তরায়।

বিরহ বারমাস্যায় বিরহিণী নায়িকাও প্রবাসগত প্রিয়তমের মিলন আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। বিরহের আগুন তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে চলেছে। কিন্তু সেও বিরহী যক্ষের মত অবস্থার অধীন।—

'মগ সিরিয়ই দিন ছোটা জী হোই।
সখীয় সন্দেসউ ন পাঠবই কোই
সন্দেসই হীরজ পড়িয়উ
উঁচা হো পরবত নীচা ঘাট।
পরদেসে পর ভুঁই গয়উ।
তবই চীরীয় ন আবই ন চাল এ বাট॥'

(বীসল দেব রাসো—নায়িকা রাজমতীর বারমাস্যা)

এমনি করে সংসারের প্রতিটি নরনারী অন্তর্জগতে তাদের পরম আকাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার জন্য অনুক্ষণ ব্যাকুল। কিন্তু বহির্জগতের পাহাড়-পর্বত-নগর-জনপদের বাধার মত মানুষের অন্তর্জগতেও বিচিত্র বাধা, নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংশয় ও সংঘর্ষ প্রতিক্ষণেই ঘনিয়ে আছে, যাকে ঠেলে মানুষ তার অভীষ্ট জনের লাভে অসমর্থ। মানবজীবনের এই চিরন্তন বিরহের দৃষ্টিতে কালিদাসের মেঘদূত যেমন চির পুরাতন হয়েও চির নবীন কাব্য, এই জাতীয় বারমাস্যাও তেমনি সেকালের হয়েও একালের সাহিত্য, এদেশের হয়েও সর্বদেশের সর্বজনীন সাহিত্য।

বারমাস্যার ভাষা ও তার সাহিত্য-মূল্য ঃ মূলতঃ বারমাসীগীতি প্রকৃতির বিচিত্র ও বিশিষ্ট পটভূমিকায় আপনহারা লোকচিত্তের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-বেদনার গান। তাই এর ভাব যেমন অকপট, এর ভাষাও তেমনি অকৃত্রিম ও জীবনরসোচ্ছল। এ ভাষা আপনিই আপনার রূপ-নির্মাতা, শ্রোতার মনোরঞ্জন

মানসে এ ভাষার সহজ প্রাণ, স্বচ্ছন্দ গতি, স্তব্ধ বা আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি। ভাবার অনুরোধে ভাষা সৃষ্টি বারমাস্যার ভাষা পরিচয় নয়। এখানকার ভাষা গেঁয়ো-মানুষ, মাটির মানুষের মেঠো ভাষা। আবরণ বা আভরণ, সাজ বা সজ্জা এর প্রকাশের স্বচ্ছন্দতা ও সাবলীলতাকে ঢাকতে চায়নি কোথাও। বারমাস্যা জাতীয় গীতি-রচনার আদিপর্বে এখানকার মানুষ আপনার সহজ ভাষাকে, সহজ প্রকাশকেই সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকাশ মনে করতো। এখনকার মত বিশিষ্ট শিল্পময় ভাষাকে সুন্দর বলবার রুচি তাদের গড়ে ওঠেনি। তাদের কাছে জীবনের স্থান ছিল প্রথম, শিল্পবোধ নগণ্য। একালের অভিজাত অথবা নাগর সংস্কৃত (cultured) সাহিত্যে যেমন শিল্পের অনুরোধে অনেকক্ষেত্রে জীবন হয়েছে উপেক্ষিত, শিল্পময় প্রকাশ জীবন-গাঢ় প্রকাশকে করেছে হীন ও নিস্প্রভ, সেদিনের দৃষ্টি ও রুচি ছিল বিপরীত। তাদের জীবনে ছিল বেগ ও আবেগ, দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও স্বাধীন। তাই তারা ভাষা প্রয়োগ করতো স্বাধীন ও উলঙ্গভাবে, আর সেই ছিল তাদের শোভা ও সৌন্দর্য।

প্রকৃতির সংগে, আকাশ-বাতাস, জল-মাটির সঙ্গে সেদিনের মানুষের সম্বন্ধ ছিল পরম আত্মীয় অন্তরঙ্গের সম্বন্ধ। প্রকৃতি রাজ্যের বিচিত্র শব্দ ও স্পর্শ, রূপ ও রস মানবমনে জাগাতো বিচিত্র ভাব ও সুর। বর্ষা-বসন্ত-শরতাদি ঋতু প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি ও রূপলীলা মানুষের কাছে ছিল শোকে সান্ত্বনা, বিপদে আশা ও আশ্বাস এবং উৎসবে, সম্পদে আনন্দ ও উল্লাসের অনন্য উৎস। তাই বারমাস্যা সাহিত্যের নরনারীর ভাষা মানুষ ও প্রকৃতির সহজ মিলন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাপ্রসূত অন্তর্গাঢ় প্রাণরস সিঞ্চিত সহজ ভাষা। এদের ভাষা, শিল্পবোধ, সারস্বত ধ্যান-চর্চা-সঞ্জাত নয়, আনায়াস জাত, প্রেমসিক্ত চিত্তের সহজ ও অনিবার্য ধ্বনিময় অভিব্যক্তি।

আলোচিত বারমাসীসংগীত সাহিত্যের কয়েকটি একান্ত উল্লেখ্য ছত্র এখানে উদ্ধার করছি :

(ক) 'সেই সব লীলারস যেঞি মনে পড়ে।
নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জ্বালে॥'

(খ) 'জল গেলে হয় যেন মীনের মরণ।
কৃষ্ণ বিনু তেমতি হইল গোপীজন॥'

(গোপিকার বারমাসী—
ভাগবত—নরসিংহ দাস)

(গ) 'না দেখি পন্থের কায়া জোর আখির জলে।
তরাইতে দরদী নাই বিপদের কালে॥'

(কমলার বারমাসী—ময়মনসিং গীতিকা)

(ঘ) অব যহি বিরহ দিবস ভা রাতী

(ঙ) সব কহ চঁদ খণ্ড মোহিঁ রাহু

(নাগমতী বিয়োগখণ্ড—পদমাবৎ)

(চ) কবহুঁ কাহুকে পার ভই কবহুঁ কাহুকে হোই।

পাঠান্তর

কবহুঁ কাহুকে প্রভুতা কবহু কাহুকে হোই।

(ছ) জিম্ব ঘর কংতা ঋতু ভলী, আব বসংত জোনিত্ত।

(নায়িকা পদ্মাবতীর বারমাস্যা)

(জ) দেখতৌঁ মন্দির হুয়উ মসাণ

(ঝ) আজ দীসই সু কাল্হে নহীঁ

(নায়িকা রাজমতীর বারমাস্যা)

(ঞ) মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল॥
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক॥
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন॥

(মলুয়ার বারমাসী)

(ট) তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী॥

(সুনাইর বারমাসী)

(ঠ) পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ॥

(ড) দুঃখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা।
কারে বা কহিব আমি এই দুঃখের কথা॥

(কমলার বারমাসী

(ছ) সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥

(মহুয়ার বারমাসী

উপরের বিচিত্র ছত্রে মানবচিত্তের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, আশা-নৈরাশ্য যে ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে, তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দনটি স্পষ্ট অনুভবনীয়। বাংলা ভাষায় প্রবাদ প্রবচন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় মন্তব্য করেছেন—'আধুনিক তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের ভাষায় মনের সৌখিনতা আছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নাই। বাংলা প্রবাদের ভাষা সেই স্পন্দনে স্পন্দিত।' (ভূমিকা—বাংলা প্রবাদ, শ্রীসুশীলকুমার দে)

আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের শিল্প-সমৃদ্ধ ভাষার চরিত্র আখ্যান সূত্রে স্থানান্তরে তিনি লিখেছেন 'বর্তমান কালে সুস্থ প্রাণধর্মের সহজ রসজ্ঞানের পরিবর্তে আমরা মার্জিত রুচির শুচিবাইগ্রস্ত হইয়াছি।' (ঐ)

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দের বাংলা প্রবাদ সম্পর্কে এই প্রশংসাবাদ আলোচ্য বারমাস্যা সংগীতের বিচিত্র লোকউক্তির প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য। সত্যই এ ভাষা এক অনিন্দ্যসুন্দর জীবনের 'স্পন্দনে স্পন্দিত'।

প্রশ্ন হচ্ছে, যথার্থ বারমাস্যার ভাষা যে সমাজ, যে সভ্যতার সৃষ্টি, আজ সে সমাজ, সে সভ্যতা থেকে দূরে, অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা। আজ আর সে সমাজ, সে সভ্যতা, সে জীবনকে কাছে টেনে আনা সম্ভব নয়, স্বাভাবিক বা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে সে জীবনের ভাষা, সে সভ্যতার ভাবসুর-ব্যঞ্জক ভাষার উপর শ্রদ্ধার কারণ কি? অথবা আজকের দিনেও এর সাহিত্যমূল্য স্বীকৃতির যুক্তি কোথায়? এ কথার সহজ জবাবে বলবো—

'The folksong must of necessity bear within it the seed of all the future development of the art.'—'Encyclopaedia Britannica.

সরস্বতী দেবীর সহজ ও সুন্দর লীলানৃত্য সাধারণ লোকের মুখেই। পৃথিবীর সব সভ্যজাতির বিপুল সাহিত্যহর্ম্যের ভিত্তি এই চলিত ভাষা—এই গেঁয়ো ও মেঠো মানুষের নগ্ন সুন্দর ও সহজ উক্তি। যে-কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যের শব্দ-শক্তির উৎসটি আবিষ্কার করতে গেলে সে জাতির 'মেলায়, মজলিসে এবং বাজারে আড়িপাতা ছাড়া যেমন গত্যন্তর নেই, তেমনি ভারতীয় বিচিত্র অভিজাত সাহিত্যের ভাষা-শক্তির উৎসটি আবিষ্কার করতে গেলে এদেশের বিচিত্র ছড়া-প্রবচনের মত এই বারমাস্যা সাহিত্যের জগতটিকেও পাশ কাটিয়ে রাখা অসম্ভব। বিশেষ করে ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতির পুনর্গঠন, পুনর্জাগরণের যুগে এ ভাষার ধর্ম ও মর্ম উপলব্ধি, আবিষ্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রখ্যাত মনীষী ইমার্সন (Emerson) সাহিত্যের ভাষারহস্য বিশ্লেষণ সূত্রে ভাষাকে বলেছেন—'fossil poetry'. বাস্তবিকই ভূগর্ভে যেমন বিচিত্র বিনষ্ট ও বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও অজস্র প্রাণীকুলের নানা লক্ষণ, নানা চিহ্ন নিহিত থাকে, তেমনি এই জাতীয় সাহিত্যের ভাষার মধ্যে, এদের অগণিত শব্দ-সম্ভারের মধ্যে এ জাতির বিচিত্র বিগতসভ্যতা, বিভিন্ন জীবনধারা ও আদর্শের বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে আছে। জাতির আত্মপরিচয়ের সূত্রে এর প্রয়োজন সর্বথা অনস্বীকার্য। কেবল বর্তমানকে নিয়ে যেমন কোন ব্যক্তি বা জাতি বাঁচতে পারে না, তেমনি কেবল আধুনিকতার মধ্যে আমাদের সাহিত্যের ভাব ও ভাষা-শক্তির পরিপূর্ণ অনুভব উপলব্ধি বাতুলতা মাত্র। তার পরিপূর্ণ রসাস্বাদনে, তার সুষ্ঠু সুন্দর ও সার্থকতম প্রয়োগে এখানকার ভাষা ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিরহস্যের আবিষ্কার উদ্ঘাটন অপরিহার্য। বারমাস্যায় যে বিচিত্র প্রবাদ প্রবচনাত্মক বাক্য নিহিত, ভারতীয় সাহিত্যের কোন স্তরেই, কোন পর্যায়েই কোন দিন তার মূল্য নিঃশেষিত হতে পারে না; সমাজ, সভ্যতার সর্ব দেহেই তার মূল্যমর্যাদা চিরদিনই স্বতঃই স্বীকৃত হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে মনীষী Montaigue-এর একটি উক্তি স্মরণীয়।—'In our ordinary language there are several excellent phrases and metaphors to be met with, of which the beauty is withered by age, and the colour is sullied by the common handling, but that takes nothing from the relish to an understanding man, neither does it derogate from the glory of those ancient authors, who, 'tis likely first brought those words into that lustre.'

লৌকিক গ্রাম্যজীবন ও অভিজাত নাগরজীবন—এ দুয়ের সংমিশ্রণের মধ্যেই নিহিত জাতির সমগ্র জীবন পরিচয়। তেমনি লৌকিক ও মৌখিক ভাষা আর অভিজাত জীবনের ভাষা ও সাহিত্যের মার্জিত লেখ্যভাষা—এ দুয়ের সংমিশ্রণেই জাতীয় সাহিত্যের ভাষাগত সামগ্রিক পরিচয় গড়ে ওঠে। আজ বিশিষ্ট-সভ্যতার গতিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ঘটে গেছে এক বিপুল ব্যবধান। এরই ফলে লোক-উক্তি ও প্রাজ্ঞ-উক্তি, গ্রাম্য চলতি ভাষা বা জীবনের ভাষা আর নগর ভাষা, শিল্পের ভাষার মধ্যে মিলমিশ হচ্ছে না আদৌ। জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চ ও নীচ স্তরের এই অন্যায় অবাঞ্ছনীয় ও অকল্যাণকর ব্যবধান দূর করতে গেলে, এই জাতীয় সাহিত্য, তার ভাব-ভাষার সমাদর-সম্ভ্রম আমাদের অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ নেই। ভারতীয় জাতির জনক স্বর্গত মহাত্মা গান্ধী এই জন্যেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"Of the language of the people we know next to nothing. We hardly understand their speech. The gulf between them and us, the middle class, is so great that we do not know them and they know still less of what we think and speak.

Folk-lore is the literature of the people, but it belongs to an order of things that is passing away, if it has not already done so."

—M. K. Gandhi.

কথা-সাহিত্য ও বারমাস্যা—বারমাসীর বিচিত্র অংশ, এর বিচিত্র চিত্র চরিত্রে নানাভাবে উপন্যাসাদির লক্ষণ লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ ভাগবতের অন্তর্গত গোপিকার বারমাসীতে কাত্যায়নীব্রতসাধনপূর্বক গোপিকাগণের কৃষ্ণরূপ পতিলাভ এবং দিনে-দিনে, মাসে-মাসে কৃষ্ণসাহচর্যে গোপিকাগণের বিচিত্র প্রেমলীলা-বৃত্তান্ত ও পরিশেষে

'সে সব সুখের দিন হৈবে গেল দূরে।
ফাল্গুনেতে কিবা করে শ্যাম মধুপুরে॥
সেই সব লীলা রস যেগ্রি মনে পড়ে।
নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জ্বলে॥' ইত্যাদি

গোপিকাগণের জীবনের এই করুণ আলেখ্য কৃষ্ণ ও গোপিকার আধারে আমাদের বাস্তবজীবনের আলেখ্যই বলা চলে। আমাদের সহজ দাম্পত্য জীবনের যে করুণ পরিণতি নাটক-উপন্যাসাদিতে চিত্রিত, এ তারই এক সুর-সংগীতময় রূপ ছাড়া আর কি? শুধু উপন্যাসাদিতে মিলন-বিরহের বৈষয়িক বা মানসিক কারণ যেভাবে বিশ্লেষিত হয়, এখানে তার পরিচয়ের অভাব।

ময়মনসিংহ গীতিকায় কমলার বারমাসী গীতির মধ্যে রাজঅত্যাচারে তার বাপ-ভাইএর কারাবাসের আলেখ্য এবং তজ্জনিত তার জীবনের দুরবস্থা এবং মামাদের দুর্ব্যবহারে তার জীবনের অবর্ণনীয় বিড়ম্বনার যে বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে, তা যে-কোন দেশের, যে কোন যুগের সার্থক উপন্যাস সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উপাদান। পরলে পরলে সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তর, বিচিত্র রূপ-রহস্যের বিশ্লেষণ এবং তারই প্রেক্ষাপটে নরনারীর জীবন ও মনঃসমীক্ষণই উপন্যাস সাহিত্যের ধর্ম। কমলার বারমাস্যায় উপন্যাস সাহিত্যের এই ধর্মটি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। রাজার অত্যাচারে প্রজার লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা এবং সমাজ-শৃঙ্খলার নামে আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার-দুর্ব্যবহারের বাণী-আলেখ্যটি এখানে ষোল আনাই ফুটে উঠেছে এবং ময়মনসিংহ গীতিকার লীলা, সুনাই প্রভৃতির বারমাসীর মধ্যেও অল্পবিস্তর এই উপন্যাস লক্ষণ ছড়িয়ে আছে।

খুল্লনার বারমাসীর চিত্রও একান্ত উপন্যাসলক্ষণাক্রান্ত। সপত্নীবিড়ম্বিত খুল্লনার জীবন এ যুগের অগণিত নারীজীবনের সহোদর। আজও মনে হয়, এদেশের অনেক ঘরে খুল্লনার সহোদরা রমণীরা লহনার মত সপত্নীর নিপীড়নে অনেক সময় বলতে বাধ্য হয়,—'কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী'। কোথাও সপত্নী, কোথাও শাশুড়ী বা ননদিনীর ব্যবহার এমনিভাবেই নারী বা স্ত্রীজীবনকে দুঃসহ, দুর্বহ করে তুলেছে। সুতরাং এ চিত্র কোন মায়ালোক, কোন কল্পলোকের বস্তু নয়, একান্ত ঘরোয়া, পরম বাস্তব পদার্থ। এ চিত্রের, এখানকার ঘটনা পরম্পরার সংগে জীবনের যোগ, সে যুগেও যেমন ছিল, এখনও তা বিশেষ ম্লান হয়ে পড়েনি। বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টির কল্পনাকে এজাতীয় বারমাস্যা জাগ্রত ও সম্প্রসারিত করে। কাজেই এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশই নেই।

খুল্লনা-ফুল্লরার বারমাস্যার চিত্র এমনিভাবে যেমন উপন্যাসধর্মী, রাজস্থানী ভাষায় রচিত মালবণীর বারমাসীগীতিও তেমনি উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভরা। প্রথমা

পত্নীর সন্ধানে আকুল স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে মালবনীর যে প্রাণপণ প্রয়াস, তা একদিকে যেমন কোন অবাস্তব চিত্র নয়, তেমনি এযুগের সামাজিক পটভূমিকায় এর সজীবতা ক্ষুণ্ণও হয়ে পড়েনি কোন রকমে। এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীজীবন চিরদিনই পুরুষের খেয়াল খুসীর কবলগত। কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যার মারফতে এ সত্যটি সুন্দর বাণীবদ্ধ করে রেখেছেন।—

'পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
* * * *
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥'

(বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র)

এদেশের বিচিত্র উপন্যাস সাহিত্যে ঔপন্যাসিকেরা বহুবিবাহবিড়ম্বিত ভারতীয় সমাজে নারীজীবনের এই দুঃখ-বিড়ম্বনা, নারীজীবনের অসহায়তার করুণ চিত্রই নানাভাবে ফুটিয়েছেন। সমাজের এই একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে মানব-দরদী কথা-সাহিত্যিকগণ নালিশ রেখে গেছেন। সমগ্র নারীর হয়ে তাঁরা এখানকার সমাজ-ব্যবস্থার প্রতীকার চেয়েছেন এবং আজকের দিনের সাহিত্যেও ঔপন্যাসিক বা কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টি এইদিকেই একান্ত নিবদ্ধ। কাজেই বারমাস্যা সাহিত্যের এই সমস্ত নারী-চরিত্র সার্থক উপন্যাসের চরিত্র। এখানকার প্রতিবেশ উপন্যাসেরই প্রতিবেশ। বারমাস্যা সাহিত্য এই দৃষ্টিতে উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের পূর্বাভাস।

ইতিহাস ও বারমাস্যা: ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনের ইতিহাস। কারণ ভারতবাসীর জীবন কর্মের জীবনের পরিবর্তে মুখ্যতঃ ধর্মের জীবন। কর্মী ভারতবাসী অপেক্ষা ধর্মপরায়ণ, ভাবপ্রবণ ভারতবাসী বলেই বহির্বিশ্বে ভারতবাসীর যথার্থ পরিচয়। ভারতের এই ভাবময়, ধর্মময় জীবনের সংগঠনে নারী জীবনের প্রভাব অথবা নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের প্রভাব কতদূর, গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সে পরিচয় মনে হয় অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হতে গেলে সে ইতিহাসের মৌল ও মুখ্য উপাদান সংগ্রহ করতে হবে ভারতের লোকসাহিত্য, লোকসংগীত থেকে,

এদেশের বিচিত্র ছড়া প্রবচনমূলক সাহিত্য থেকে এবং এই জাতীয় বারমাসী সংগীতগুলো থেকেও বটে। কারণ ইতিহাসে সচরাচর জাতির বা জাতীয় জীবনের যে পরিচয় ধরা পড়ে, তা জীবনের বহিঃপুরের কথা, অন্তঃপুরের নয়। সে পরিচয় নিতান্ত কালিক, চিরকালীন নয়, নৈমিত্তিক, নিত্যকার পরিচয় নয়। সে পরিচয়ের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশের প্রবেশপত্র সংগ্রহ সম্ভব নয়। সাধারণ ইতিহাস যোদ্ধা বা সৈনিক ভারতবাসী, রাজা ভারতবাসী, বণিক বা সওদাগর ভারতবাসীর পরিচয় দিতে পারে মাত্র। কিন্তু ঘরের মানুষ, মনের মানুষরূপে ভারতবাসীর পরিচয় ইতিহাসে স্বল্পই মেলে। প্রথমতঃ, সহজ মানুষের পরিচয় সাধারণ ইতিহাস শাস্ত্রের বহির্ভূত বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাসীর প্রকৃত ইতিহাস আজও অলিখিত। এযাবৎ ভারতের ইতিহাস নামে যত রকমের যতগুলো গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে, তা কোন-না-কোন দৃষ্টিতে এদেশ বা দেশবাসীর খণ্ড বা আংশিক ইতিহাস। কারণ, যে ইতিহাস বিদেশী প্রভুশক্তির ইঙ্গিত সংকেতে সৃষ্ট, তা যে জাতির সহজ ও সমগ্র ইতিহাস নয়, তা প্রমাণের চেষ্টা করতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ কোন জাতিরই ইতিহাস সে জাতির নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবন, আর্থিক বা আত্মিক জীবন, বর্তমানকাল ও চিরকালের জীবনের সাক্ষ্য নয়। তার উপর ইতিহাস জাতির যে কর্মময়, প্রকট ও বহিঃ-প্রসারিত জীবনকে নিয়ে তৎপর, ভারতবাসীর পক্ষে সে জীবনকথা নিতান্তই 'এহো বাহ্য'। কারণ, ভারতবাসীর জীবনটা বাইরের অপেক্ষা অন্তঃপুরের দিকেই অধিক প্রসারিত। আর সেই জীবনের মধ্যেই ভারতীয়তার মুখ্য ও মৌল পরিচয়। কাজেই ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বা ষোল-আনা ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের সঙ্গে অপরিহার্য সংযোগ প্রয়োজন যাদের, তাদের মধ্যে বারমাস্যার স্থান নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। কারণ, আগেই বলেছি, যে ধর্ম ও সংস্কৃতিময় জীবনই ভারতের জীবন পরিচয়, বারমাস্যা সে পরিচয়ের এক অমূল্য ও অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার। ভারতীয় জীবনের হোলি ও দোলি-উৎসব, এ জীবনের ঋতু ও শস্যোৎসবের মধ্যেই ভারতীয় জীবন ও চরিত্রের মর্মকথা, নাড়ীর পরিচয় নিহিত, এবং যতদিন প্রচলিত ইতিহাস বা ভারতীয় জীবনের বাহ্য পরিচয়ের সঙ্গে এই বারমাস্যা বা এই জাতীয় অন্যান্য গীতি ও ছড়া সাহিত্যাদির অন্তর্নিহিত জাতির মর্মপরিচয় সংমিশ্রিত না হয়, ততদিন ভারতীয় ইতিহাস কেবল তথাকথিত ইতিহাসই হয়ে থাকবে। এবং সে ইতিহাসের অস্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র দর্পণে এ জাতি নিজের বিকৃত ও খণ্ডিত

মূর্তিই দেখতে পাবে মাত্র। এ প্রসঙ্গে মনীষী Edmund Spenser-এর একটি উক্তি অবশ্য স্মরণীয়।—

"By these old customs the descent of nations can only be proved where other monuments of writings are not remayning"

(View of the State of Ireland 1595. P. 478)

বারমাস্যায় প্রকৃতির স্থান ও তার সাহিত্যিক মূল্য—সাহিত্য সৃষ্টির মুখ্য উপাদান দু'টি—মানবজীবন ও নিসর্গজীবন। সাহিত্য ও সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই মানুষ তার সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, আশা-নৈরাশ্যের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। আদি পর্বের মানুষ, অজ্ঞ ও অসহায় মানুষ প্রতিপদেই প্রকৃতির নানা ইঙ্গিত ও সংকেত নিয়ে চলতো ফিরতো জীবনে তাদের সুখেও প্রকৃতি, অসুখেও প্রকৃতি, উৎসবেও প্রকৃতি বিপদেও প্রকৃতি এককথায় প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবন-ভাবনা ছিল অসম্ভব।

কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতার, বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সেকালের একান্ত মাটিঘেঁষা মানুষ, প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ একটু সরে এসেছে প্রকৃতির কোল থেকে কিন্তু তাহলেও একালের অধিকতর মনোজীবী মানুষ দেহের প্রয়োজনে না হলেও মনের খাতিরে নিসর্গের আরতি-অর্চনা চায় একান্তই। তাই সাহিত্যে সমস্ত সত্য সুন্দরের ধ্যান ও চর্চা রূপ পেয়েছে নিসর্গজীবন ও মানবজীবনের দ্বৈতরূপ অবলম্বনে। কারণ, জীবনের যথার্থ সত্য সুন্দর ও শিবময় প্রকাশ একান্তই নিসর্গ নির্ভর। ইংরেজ কবি ল্যাণ্ডর বলেছেন : 'I loved Nature and next to Nature Art.'

কবি বায়রণের উক্তিও সমগোত্রের—'I love not man the less but Nature more.'

জীবনের যথার্থ প্রকাশ-বিকাশে নিসর্গ সৌন্দর্যকে অন্তরাত্মায় ধারণ এবং তার ধ্যান ও উপলব্ধি মানুষের পক্ষে অপরিহার্যই মনে হয়। মানবজীবনের এক বিশিষ্ট সাধনা, স্বতন্ত্র কর্ষণা।

তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের বারমাস্যা বা 'Cycle of months' জাতীয় সাহিত্যেও যেমন, তেমনি অন্যান্য বিচিত্র সাহিত্যেও মাস বা ঋতু প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের বিষয়বস্তু পরিবেশনের রীতি সুচিরাগত

সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য বারমাস্যারূপ লোকসংগীতের অন্তর্গত প্রকৃতিচিত্রের সংগে দেশীয় বা বিদেশীয় বিভিন্ন অভিজাত সাহিত্যের অন্তর্গত প্রকৃতিচিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আমাদের তীক্ষ্ণ ও কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইংরেজী সাহিত্যে ভারতীয় সাহিত্যের এই বারমাস্যার অনেকটা সগোত্রীয় বস্তু Spenser-এর 'Shepherds Calendar', James Thomson-এর 'The Seasons' এবং William Morris-এর 'The Earthly Paradise'. স্পেন্সারের গ্রন্থে যে বিভিন্ন মাস বা ঋতু-প্রকৃতির বর্ণনা, তা একান্ত বৈচিত্র্যময়; বারমাস্যার চিত্রের মত সেখানকার নিসর্গ প্রেমমূর্তি একটানা একসুরে বাঁধা নয়। সেখানকার ভাব-সুর কোথাও শোকাত্মক, কোথাও প্রেমাত্মক বা ব্যক্তি চরিত্রের স্তুতি-প্রশস্তিমূলক আবার কোথাও বা নীতিধর্ম বা আদর্শব্যঞ্জক। বিভিন্ন ঋতুর প্রেক্ষাপটে মানবচিত্তের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, হর্ষ-বিষাদের চিত্র এখানেও আছে। তবে মেষপালকদের বিচিত্র আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংসার-জীবনের নানাতত্ত্ব ও রহস্য এখানে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। বারমাস্যার অন্তর্গত সম্ভোগ-শৃঙ্গার ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চিত্র সাধারণতঃ একান্ত গতানুগতিক, বর্ণনামূলক ও দেহধর্মী। এখানে সেখানে কিছু কিছু বিলাসী ও সৌখীন মনের কিংবা রোমান্টিক মনের স্পর্শ থাকলেও মোটের উপর বারমাস্যায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আদিম মানুষ, প্রাকৃত মানুষের দৃষ্টি। এ দেখা প্রাকৃত-মনের, অতাত্ত্বিকের দেখা, এখানে দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের মধ্যে কোন ভাবুক-মন, তত্ত্বানুসন্ধী মনের আড়াল নেই। নরনারীর পক্ষে প্রকৃতির বিচিত্ররূপ ও লীলার শুধু দর্শনই আছে, অন্তর্দর্শন নেই তেমন কোথাও।

কিন্তু স্পেন্সারের গ্রন্থে কাডি (Cuddie) ও থেনট (Thenot)-এর প্রেমসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা পরম তত্ত্ব ও রহস্যময়। ফেব্রুয়ারী মাসের একান্ত শীতের শুষ্ক ও নীরস প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের নীরসতা ও নানা ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা এই উভয় চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে পরিস্ফুট। মূলতঃ এ প্রসঙ্গ প্রেমেরই প্রসঙ্গ। তবে বারমাস্যার প্রেমচরিত্রের সঙ্গে এখানকার প্রেমধর্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ প্রেম তত্ত্ব নীতি ও দর্শনের আগুনে ভাজা। বারমাস্যার নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত প্রেম নয়।

তাই আপাতঃদৃষ্টিতে ভারতীয় বারমাস্যা সাহিত্য স্পেন্সারের এই গ্রন্থের সমগোত্রীয় মনে হলেও আসলে বারমাস্যা বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত—

ভাবেও বটে, ভাষায়ও বটে। কিন্তু 'Shepherds Calender' অভিজাত সাহিত্য, রসিক ও সমজদারের সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্যের পরিবর্তে নাগর-সাহিত্য। এখানে প্রেমের সঙ্গে আছে তত্ত্ব ও দর্শন, রাজনীতি ও ধর্মনীতি ইত্যাদি।

তাছাড়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের মৌল পরিচয় ও পার্থক্য এদের ধর্মপ্রাণতা ও কর্মপ্রাণতার মধ্যে। তাই বারমাস বা ছয় ঋতুর বিচিত্র ও বিশিষ্ট পরিবেশে ভারতীয় জীবনে যেখানে প্রতিপদেই নানা ধর্মকৃত্যের প্রসঙ্গ, পাশ্চাত্য-জীবনে দেখি, ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের পরিবর্তে নিছক কর্মজীবনের কথা, রাজনীতি বা বিষয়গত জীবনের সমস্যা, জটিলতার কথা। বারমাস্যা সাহিত্য হিসাবে এ তথ্যেরও আধার।

ইংরেজ কবি টমসনের 'The Seasons' কাব্যগ্রন্থ মূলতঃ ভারতীয় বারমাসী সাহিত্যের কোন কোনটির সগোত্র। তবে কবি সাধারণ বারমাসীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নন। বিভিন্ন মাসের পরিবর্তে গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছয় ঋতুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও প্রভাবই কবির বর্ণনীয় বিষয়। অবশ্য ভারতীয় বারমাস্যা-গীতিরও কোন কোনটি মাসের পরিবর্তে ঋতুকেন্দ্রিক চিত্র। যেমন হিন্দী সাহিত্যে নায়িকা পদ্মাবতীর বারমাসী ('প্রথম বসন্ত নবল ঋতু আই') ইত্যাদি।

কবি টমসন সর্বত্রই ঋতুর বস্তুময় সহজ বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন ঋতু জীব ও জড় জগতকে যে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, আবার একই জীবজগতের বিচিত্র প্রাণীকুল ঋতুস্পর্শে যে বিচিত্রভাবে প্রভাবিত হয়, কবি তার মনোজ্ঞ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

তবে সর্বত্রই কবি রূপময় বর্ণনা বিশ্লেষণের শেষে কিছু কিছু তত্ত্ব ও দর্শনের আভাস ইঙ্গিত দিয়েছেন। রূপ থেকে ভাবে, বর্ণনধর্ম থেকে মননধর্মে গিয়ে পৌঁছিয়েছেন কবি। তত্ত্বদর্শী, মননশীল কবি আগাগোড়াই ঋতুর প্রসঙ্গে জীবনের ও ভুবনের বিচিত্র সত্য, তত্ত্ব ও রহস্যের আভাস দিয়েছেন। স্পষ্টতার অনুরোধে কবিচিত্রিত একটি ঋতুচিত্রের শেষাংশের উদ্ধার করছি।

'Summer'

'Enough for us to know that this dark state,
In wayward passions lost and vain pursuits,
This infancy of being, cannot prove

The final issue of the works of God,
By boundless Love and perfect wisdom, formid,
And ever rising with the rising mind.'

(1800—1805 Lines, Page—164)

আমাদের বারমাস্যার মধ্যে কোথাও এ জাতীয় তত্ত্বদর্শন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ নয়। এও স্পেন্সারের গ্রন্থের মত প্রবীণের সাহিত্য, রসিক চিত্তের রসায়ন—এখানকার বারমাস্যার মত একান্ত জন সাহিত্য নয়। টমসনের ঋতুচিত্র নায়ক-নায়িকার মিলন বা বিরহগীতিও নয়, প্রাচ্যের বারমাস্যার মত জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অথবা জাতীয় ঐতিহ্যের আধারও নয়; এ গ্রন্থ একাধারে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন। বারমাস্যা মুখ্যতঃ সংগীত এবং লোক সংস্কৃতির আধার। তবে বারমাস্যার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ জীবন, টমসনের ঋতুকাব্যের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ দর্শন।

স্যার উইলিয়ম মরিস্ (William Morris) তার 'The Earthly Paradise' গ্রন্থে বিভিন্ন মাসের চিত্রের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গল্প বা উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। যেমন, মার্চ মাসের পটভূমিকায় গ্রন্থকার 'Atalanta's Race' এবং 'The Man Born to be King' এই উপাখ্যান-যুগ্মের বর্ণনা করেছেন। এপ্রিল মাসের চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'The Doom of King Acrisius' এবং 'The Proud King' এই দুই গল্পের অবতারণা করেছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, এই সব গল্পের অন্তরালে যে বিশিষ্ট ভাব-আকাশ, যে বিশেষ সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিহিত, গ্রন্থকার বিভিন্ন মাসের বর্ণনা-সূত্রে তারই অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র। প্রকৃতির সংগে মানবজীবনের কোন অন্তরঙ্গতা, কোন নিবিড় সম্পর্ক এখানে গড়ে ওঠেনি।

মূল বিষয়বস্তুর অনুভব-উপলব্ধির সোপানরূপেই প্রকৃতির বর্ণনা। প্রকৃতি এখানে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য কাহিনী অংশ।

এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কবি সাহিত্যিকদের মত প্রাচ্যের কবি-কুল-সম্রাট কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যেও বারমাসী সংগীতের কতকটা স্বজাতীয় সাহিত্যের সন্ধান মিলে। কালিদাসের ঋতু-সংহার ছয় ঋতুর পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার জীবনের সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভাত্মক শৃঙ্গার রসের চিত্র। কিন্তু কালিদাসের এ কাব্যে মানব চরিত্র একান্ত গৌণ, প্রকৃতির বর্ণনাই মুখ্যবস্তু। রাজসভার কবি, অপরিণত কবি, সম্ভোগের কবি কালিদাস এখানে বিভিন্ন

ঋতুবর্ণন মাধ্যমে কেবল একটানা সম্ভোগের চিত্রই এঁকেছেন। প্রকৃতির দৃষ্টিতে জীবন এঁকেছেন কবি, জীবনের দৃষ্টিতে প্রকৃতির ছবি আঁকেননি। বারমাস্যার মধ্যে যথেষ্ট চিত্রচরিত্রের একঘেয়েমি বা গতানুগতিকতা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখানকার নারীচরিত্রের অবস্থাগত বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কোথাও পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের, কোথাও পতির জন্য পত্নীর, কোথাও বা পিতার জন্য দুহিতৃ-হৃদয়ের আর্তি বা বিরহবেদনার সুর বারমাস্যায় ধ্বনিত হয়েছে। এ ছাড়া সুখ-সম্ভোগের চিত্রও বিরল নয়। এমনিভাবে গতানুগতিকতার মধ্যেও প্রকৃতি ও মানব-জীবন আলেখ্যের যে বর্ণ-বৈচিত্র্য, রস-বৈচিত্র্য বারমাস্যায় লক্ষণীয়, ঋতু-সংহারে তার শোচনীয় অভাবই লক্ষ্য করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু-উৎসব' বা শারদোৎসব ঋতু-প্রকৃতির সংগীত প্রশস্তিমূলক কাব্য বা গীতিনাট্য। বারমাস্যার মত এখানেও আছে সেই নিসর্গ ও মানব-জীবনের অবাধ মেলামেশা এবং সেই দ্বৈতজীবন সমুত্থিত বিচিত্র ভাবসুরের সমবায়। এমনিভাবে সেই কোন্ অজানা যুগ থেকে মাস বা ঋতু-প্রকৃতিকে পিছনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টির ধারা সুরু হয়েছে এবং যুগে যুগে বিচিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে এ ধারার নব নব প্রকাশ, নব নব অভ্যুদয় ঘটে চলেছে। বারমাস্যা-জাতীয় লোকসাহিত্যকে আমরা এই জাতীয় সর্ববিধ অভিজাত সাহিত্যের সূত্র বা উৎস বলে গ্রহণ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ঋতুমূলক কাব্য বা নাট্য-সাহিত্যে ঋতু-প্রকৃতির সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য বর্ণনার মাধ্যমে কবির যে অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয়, যে সর্বাত্মক ও অদ্বয় অনুভূতির প্রকাশ প্রমূর্ত, বারমাস্যায় তা একান্ত অনুপস্থিত। আর এখানে এ বস্তু আমাদের প্রত্যাশিত নয়, স্বাভাবিকও নয়। বারমাস্যার নায়ক-নায়িকার বিরহ-বেদনার মধ্যে প্রকৃতিস্পর্শজনিত রবীন্দ্র চিত্তের বিরহ-ব্যথার সুর মিলবে না। কিন্তু বারমাসী সংগীতের বিচিত্র অনার্য উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন এযুগের যাবতীয় সংস্কৃত উৎসব অনুষ্ঠানের মূল, তেমনি এখানকার নিসর্গদৃষ্টির মধ্যে সহস্র দীনতা, গ্রাম্যতা সত্ত্বেও মনে হয়, এই দৃষ্টিরই পরিমার্জিত পরিণত রূপ রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-দৃষ্টি।

এমনিভাবে আধুনিক বিচিত্র উন্নত ও অভিজাত সাহিত্যের দৃষ্টিতে বারমাস্যাসংগীতের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সহস্র দীনতা গ্রাম্যতা সত্ত্বেও সাহিত্যের আসরে একে অপাংক্তেয় করে রাখা অবিদ্যা ও অবিচারের পরিচয় বলে মনে হয়। তাছাড়া, সাহিত্য হিসাবে এর নিন্দা-অপবাদের পূর্বে পাঠক-

মাত্রকেই স্মরণে রাখতে হবে মনীষী T. S. Eliot-এর চিরস্মরণীয় সাবধান বাণী :

"The reader who does not like Pound's epigrams should make very sure that he is not comparing them with the 'Ode to a Nightingale before he condemns them."

বারমাসী-সংগ্রহ

(ক) আদি বা মৌলিক বারমাস্যা

চিত্তরঞ্জন দেব—পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ (১৩৬০), ৪১—৪২

কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতে করিতে গায়—

আয় রে তরা ভূঁই নিরাইতে যাই।
ভূঁই মোগো মাতাপিতা, ভূঁই মোর গো পুত।
ভূঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ॥
(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়।
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়॥
ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ।
বৈশাখেতে চিক চিহিনী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ॥
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে।
ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্তেতে তুলে॥
ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল, কার্ত্তিকে দেয় সাড়া।
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখ্‌রে আমন ছড়া॥
আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই আর।
আইস এ'বার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার॥
(ওগো) সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে।
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে॥*

রংপুর জিলার কৃষকের মুখ হইতে সংগৃহীত সংগীত—

ব.সাঃ পঃ প—১৩১৫ সাল, ২য় সং

প্রথম অগ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান।
কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান॥

* এটি চাষ-আবাদের বর্ণনামূলক বারমাসীর নিদর্শনও বটে।

যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়।
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখ চায়॥
এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস॥
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোক খায় আলোয়া।
ভাল ফুল ফুটিয়াছে কেকিটী কমলা॥
কেকিটী কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী।
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িল সোয়ামী॥
এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল মাঘ মাস॥
মাঘ না মাসেতে কন্যা করুয়া পড়ে শীত।
তলে পাটী পাড়ে কন্যা শিওরে বালিশ॥
সাধু সাধু বলিয়া বালিশে দিলাম কোল।
হতভাগা তুলার বালিশ না বোলে এক বোল॥
পোড়া দেঙ্ তোর তুলার বালিশ গগনে উঠুক ধুঁয়া।
কতদিনে ফিরিবে অভাগিনীর চন্দ্রমুয়া॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ফাল্গুন মাস॥
ফাল্গুন মাসে হে কন্যা ফাগুয়া খেলায় রাজা।
ডালমূল ভাঙ্গিয়া যখন কুহুলী তোলায় ভাষা॥
তোলাও রে তোলাও রে কুহুলী পাড়িয়া মারিম ছাও
আমার দেশে নাই সাধু সাধুর দেশে যাও॥
গাছে পড়ি পঙ্ক কথা সাধুরে বুঝাও॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল চৈত্র মাস॥
চৈত্র না মাসেতে কন্যা পচিয়া বয় বাও।
হেটে তালু শুকায় কন্যার মুখে না আসে রাও।
মুখে না আসে রাও হে কন্যা চক্ষে না ধরে নিন্দ।
হাতে হাতে চন্দ্র দিয়া হারাইলাম গোবিন্দ।

এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল বৈশাখ মাস॥
বৈশাখ মাসেতে হে কন্যা সুশাগ ললিতা।
সব সখী খায় শাগ অভাগীর মুখে তিতা।
আঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন শোঙ্গ্রাইলাম পাতে।
আমার ঘরে নাই সাধু পশিয়া দিব কাকে॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি আসিল জ্যৈষ্ঠ মাস॥
আম খাইলাম কাঁটাল হে খাইলাম আরও গাভীর দুধ
কতদিনে খণ্ডিবে অভাগীর মনের দুখ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আষাঢ় মাস॥
আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিস্সানে কাটে ধান।
কোড়া পাখীর কান্দনেতে শরীর কম্পমান॥
হেঁওয়া পাখীর কান্দনেতে পাঁজর কৈল শেষ।
ডউকির কান্দনেতে মুঞ্এ ছাড়িনু বাপের দেশ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল শ্রাবণ মাস॥
শ্রাবণ মাসেতে কন্যা কিস্সানে ওয় ওয়া।
হাড়ি কোণে করিছে মেঘ গগনে বর্ষে দেওয়া॥
বর্ষেক রে বর্ষেক রে দেওয়া বর্ষেক পঞ্চধারে।
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়া আসুক ঘরে॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ভাদ্র মাস॥
ভাদ্র না মাসেতে হে কন্যা পাকিয়া পড়ে তাল।
যুগীর যুগিনী হইয়া হস্তে লব থাল॥
হস্তে লব থাল হে প্রিয় মাগিয়া যাব দেশে।
দুই কানে দুই কুণ্ডল পিন্ধিয়া যাব সাধুর দেশে॥

এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আশ্বিন মাস॥
আশ্বিন মাসে হে কন্যা দুর্গা অষ্টমী।
ধানে দুর্ব্বায় করে পূজা বিধবা ব্রাহ্মণী॥
পূজুক পূজুক পূজা মাগিয়া লব বর।
আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল কার্ত্তিক মাস॥
কার্ত্তিক মাসেতে কন্যা তুলসীর গোড়ে বাতি
ঘুরি আসে তোমার সাধ কান্দে লইয়া ছাতি॥

শূন্যপুরাণে শিবের গান

রামাই পণ্ডিত—খৃঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী

একদিন রস হাসে কৈলাসে ভোলানাথে।
পেম রসে তিলোচন পার্ব্বতীর সাথে॥
কৌতুক করিতে শিবে উপজিল কাম।
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম॥

* * *

যতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল।
চাষ চষিয়া গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল॥
শাবণ মাসেত ধান হইলেন গছা।
ধান দেখিয়া পরভুর মনে বড় ইচ্ছা॥
ভাদ্দর মাসেত হৈল ধান অতি মনোহর।
ডহর ডাঙ্গর সব একুই স্থসর॥
আশ্বিন মাসেত মেঘে বারিষএ ঝিষিকানি।
নদীএ আছেন কূপজল পূরিত যে পানী॥
কাত্তিকে সোলুঙেতে নাহিক আফুলা।
অঘানে পাকএ শিষ নামএ পড়এ কলা॥

…ইত্যাদি।

(খ) মধ্যযুগীয় বা সাহিত্যিক বারমাস্যা

রাধার বারমাসী—লোচনদাস

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥
শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা।
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা॥
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হাহুতাশ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্ব্বরী॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত।
ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বজ্রাঘাত॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।
অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকূলে॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে॥
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী॥
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী ভুলিবে কোন্ ছলে॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত-উদয়।
লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয়॥

বারমাসী

গোবিন্দদাস—১৬শ শতাব্দী

আঘন মাস রস-সায়র নাগর মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিনীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন ভেল॥
আওল পৌষ তুষার সমীরণ হিমকর-হিম অনিবার।
নাগরী কোরে ভরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কঙন পাতিয়ায়ব আতপ-মন্দ-বিকাশ।
দিনমণি-তাপ নিশাপতি চোরল কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুনে গুণি-নাগর গুণমণি গুণিগণ ফাগুয়া খেলত রঙ্গে।
বিরহ-পয়োধি অবধি নাহি পাই এ দৃঢ়তর মদন-তরঙ্গ॥
আওত চৈত চিত কত বারিব ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ-ফুল-শরে হানই কানু রহল দূরদেশ॥
মাধবী মাস সাধ বিহি বাধল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দক্ষিণ-পবন নাহি ভাওত ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
জেঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিনী চন্দন চাঁদনী-রাতি।
শীতল পবন মোহি নাহি লাগত দারুণ মনমথ সাথী॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদ-পাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগএ নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙনে সঘনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন-কণ্ঠ-বিলোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর-নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ॥
আশ্বিন মাসে বিকশিত পদুমিনী সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
কার্ত্তিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি লীলাময় রসরাস।
নিকরুণ মাধব কোন আয়ব কহ তহি গোবিন্দদাস॥

বারমাসী—গোবিন্দ চক্রবর্তী—১৬শ শতাব্দী

গাবই সব মধুমাস।
যনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ চাঁদ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধুমত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জন পুঞ্জ রঞ্জিত চুত-কানন শোহই।
রস-লোল কোকিলা-কোকিলকুল কাকলী মন মোহই॥

মোহই মাধবী মাস।
চৌদিগে কুসুম-বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস-জৃম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরী-কুল পদুমিনী মুখ-চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল সুখ-পরবঞ্চিতা॥

বঞ্চিত অহর্নিশি বাস।
ভৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহু যা রূপয়ে পহুঁ সোই সুলখিনী কামিনী।
যো কান্ত-সুখ-সম্ভোগে বঞ্চয়ে-চাঁদ-উজোর-যামিনী॥
দহই দাদুরী দিনহি বঞ্চয়ে কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেশলী পূরব প্রেয়সী পেখি তাপিত অন্তরে॥

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী-বেদন বাঢ়॥
রাঢ় ফুল্লিত-বল্লী তরুবর চারু চৌদিশে সঞ্চারে।
উত্তাপে তাপিত ধরণী-মণ্ডলে নিরখি নব নব জলধরে॥
পাপীয়া পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া॥

পাপীয়া শাঙন মাস।
বিরহী-জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর-রজনী দশদিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে জাগি সগরি রাতিয়া॥

রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ।
ভাদক বাদর মন্দ॥
মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ দহই মারুত বিন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর হামারি লোচন-ছন্দ॥
উঠল ভূধর পূরল কন্দর ছুটল নদ নদী সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতী পরক যুবতী গমন জগ ভরি নিন্দুয়া॥

নিন্দু আপন পরভাষ।
ভৈ গেল আশ্বিন মাস॥
মাস গণি-গণি আশ গেলহুঁ শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
ময় শারদ-চাঁদ নিরমল দীগ্ দীপতি-বাতিয়া।
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া॥

পাতিয় শমনক লই।
আওল কার্ত্তিক ধাই॥
ধাই-ষটপদ নাই পদুমিনী পাই কিয়ে রস-মাধুরী।
তুহি নিশঙ্কউ সঘনে চুম্বই কোন বুঝে অছু চাতুরী॥
যবহুঁ পিয়া মঝু লেহ কয়লহি মেঘ চাতক রীতিয়া।
পিয়া সে দূরহি রোয়ে পাপিনী হোই রহলহিঁ কি রীতিয়া॥

কি রীতি করব অব হামে।
আওল আঘন নামে॥

নাম শুনইতে ঐছন অন্তরে সো রস সায়রে পেশলি।
কোন বিহি মঝু নাহ লে গেও হাম সে পড়ি রহুঁ একলি॥
শিশির নব নব তরুণ নব নব তরুণী নবী নবী হোইরি।
লেহ নব নব তেজি দারুণ দেহ থরু যনু কোইরি॥
কোই করয়ে যনি রোখে।
আওল দারুণ পৌখে॥
পৌখ দিন মাহা সুরয-আতপ-পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনী হিমকর-দরশে দহ দহ হেরি সহচরী রোতিয়া॥
কপট কানুক পীরিতি-আগুনি দরশ কথি যনি হোই রে।
অতএ কুল শীল জীবন যৌবন সখীক সঙ্গহি খোইরে॥

খোই কুলবতী-মান।
আওল মাঘ নিদান॥
নিদানে জীবন রহল সো পুন মাঘে সমুঝল যাবই।
মদন ধানুকী ফেরি কি আওল সবহুঁ মঙ্গল গাবই॥
রসাল নব নব পল্লব চাপহি মুকুল শর কত যোইরে।
ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত মার বিরহিণী ওইরে॥

ওই দেখহ অনুরাগে।
ফাগুন আওল আগে॥
আগে মঝু কছু আশ আছিল নিচয় নাগর আওবে।
বারিখ গেলহি অবধি ভেলহি পুন কি পামরী পাওবে॥
সোই নিরমল বদন-মাধুরী দরশ কথি জনি হোয়।
অতএ নিরগুণ জীবন ভেজব মরণ ঔষধ মোয়॥

মোহে হেরি সখী কোই।
চৈত মাস সবহুঁ রোই॥
আধ বরিখহি তাহি পামরি দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব কবহু না পাওব রহল মরমক নাশিয়া॥

বারমাসী—বলরাম দাস—১৬-১৭ শতাব্দী

তুয়া গুণে কামিনী কত হিমযামিনী জাগয়ে নাগর ভোর।
সরসিজ বর-লোচন মোচন রহু ঝরতহি ঝরঝর লোর॥
ফাগুনে মধুপুর নাগরী-নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিহরক আগুনি জরিজরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে॥
তুহু সে নিরন্তর নাগরী-অন্তর কি করব রঙ্গিনী-সঙ্গে।
শীতল ভূতল লুটয়ে বেয়াকুল দংশিল বিরহ-ভুজঙ্গে॥
দূরহি বিরহিগণ তেজই জীবন শুনি তছু নাম দুরন্ত।
সো মধুমাস বিলাসত জনে জনে আওল কাল বসন্ত॥
এতদিনে কতহি যতনে জীউ রাখল অব কি জীয়ব তুয়া কান্ত।
পিক-অলি-কাকলী কুসুম-লতাবলী দিনে দিনে জীউ করু অন্ত॥
বিকশিত কুসুম ভরল সব কানন চৌদিগে ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তরু-পর পঞ্চম গাওই নিশি দিশি পিকরবে জীবন-সংহার॥
পাপ-নিশাকর কিরণ পসারল জগ ভরি আনল-বিথার।
মাধবী মাসে আশে জীউ না রহল আর কি সহব দুখ আর॥
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণী লুঠি লোরে করই মহীপঙ্ক॥
কত ঘন-চন্দন কত কত বীজন সজল-জলদ-বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বাড়বানল পিয়া দূর বিহি ভেল বঙ্কা॥
নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর বরিষা নব পরবেশে।
ক্ষণে ক্ষণে জলদ মধুরময় ধ্বনি শুনি গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে॥
নব নব পল্লব মনোভব লাগল বিহি করু সব অবশেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে বাঢ়ল অব নাহি রহ জীব-লেশ॥
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন ঘন গরজন দামিনী দশদিগ পাত।
যামিনী ঘোর-তিমির ডরহে রইতে থরহরি কাঁপয়ে গাত॥
এ দুখ-সায়র নিমগণ নায়র তঁহি হত দাদুরী রাব।
শাঙন গহন দহন-দাহন জীবন কিয়ে জানি হরি কবে পাব॥
মাহ ভাদর দিন নিরখিতে তনু ক্ষীণ দারুণ দূর দিনমান।
বিরহ-হিলোলী দরদর অন্তর দোলত চপল পরাণ॥

তুয়া বিনু যনু শূন সব মন্দিব মনমথ-তূণ সমান।
একলী বিকল সকল নিশি আলপই অবিরত ঝবয়ে নয়ান॥
উজোর হিমকর শীতল নিরমল চাঁদনি-রজনী উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরী সহ বিলসই বিকশিত পদুমিনী-কোর॥
আঘন মাস পাই হিয় দাহই শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির সুন্দরী তুহু ভেলি বাম॥
কিয়ে লিখি বাসর গরগর অন্তর জরজর মরমক ঠাম।
বিদগধ রায় মুগধচিত অবিরত সোঙরিয়া তুয়া গুণ নাম॥
সুন্দরি কো কহু ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম-শর-জ্বরে ভেল দুবর বল্লভ রাজ কিশোর॥
পৌষ তুষার তুষানলে ডারল জীবন-নাহ।
সুধীর সমীর সুধাকর-শীকর পরশ গরল অবগাহ॥
অহনিশি ডহ ডহ পিয়া জীউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কয়ে কহব নিরবাহ॥
মাঘহি দিন নিশি শিশিরক নিকরহু অবনী আগোর।
উলটি পালটি অনুখন ছটফটি তনু দহে সহচরী-কোর॥
তোহারি দরশ বিনু ক্ষীণ অতি জীবন গদগদ কহে আধ বোল।
আশ্বিন শারদ হংস-শবদ শুনি পিয়া জীউ অতি উতরোল॥
বিহরই বিহগ সুভগ তটিনী-তট জল-সরসিজ পরকাশ।
জগজন-লোচন তনু মনোমোহন আওল কাতিক মাস॥
এবেহুঁ অনঙ্গ ভুজঙ্গ গরাসল অব নাহি জীবনক আশ।
দিশি অণুক্ষণ গুণি গুণি তুয়া গুণ উনমত বারহি মাস॥
বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন মানে তাহে কি মাথুর-সুখ॥
সদাই বিরলে বসি অবনত মুখ-শশী ঝরঝর ঝরয়ে নয়ন।
দুই হাত বুকে ধরি রাই করি রাই করি ঐ ছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন যৈছনে মূরছল পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক হেরি কত পথিক করে ধরি করে পরিহার॥

আওব কানু কহল তোমে কত কত বচনে করহ বিশোআসে।
তোহারি প্রেম সই বিছুরি না পারব পুছহ বলরাম দাসে॥

বিদ্যার বারমাস্যা

'অন্নদামঙ্গল'—ভারতচন্দ্র

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥
জ্যৈষ্ঠমাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥

* * *

ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥

* * *

নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
তন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

* * *

ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥

* * *

নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥

*　　　*　　　*

বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন॥
কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর॥

*　　　*　　　*

আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥

…ইত্যাদি

বারমাসী—ঘনশ্যাম দাস—১৭শ শতাব্দী

দেখ পাপি আঘন মাস।
যনু নাহ-বিরহ-হুতাশ॥
দরশাই সুখ বিহি নেল। — অগ্রহায়ণ
হিয়ে কৈছে সহইহ শেল॥
ভেলয় প্রাণ-প্রিয় পরদেশিয়া।
যনু ছুটল বিষ-শর ফুটল অন্তর রহল তঁহি পরবেশিয়া॥
অব পৌষ ভেল পারবেশ।
মঝু নাহ রহ পরদেশ॥ — পৌষ
গণি সোয়ি কামিনী ভাগী।
রহু প্রিয়ক হিয় হিয় লাগি॥
শয়নহিঁ বয়নে নয়নহিঁ ঝাপিয়া।
হামসে পাপিনী পৌষ-যামিনী রহু থরহরি কাঁপিয়া॥
দিনরজনী গণি গণি শেষ।
অব মাঘ ভেল পরবেশ॥ — মাঘ
অব কতহুঁ হেরব পন্থ।
নাহি যাত জীবন দুরন্ত॥

নাহি যাত জীবন দুরন্ত কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
পরম জরজর নয়ন ঝরঝর তিলেক নাহি বিছুরন্তিয়া॥

দেখ ভেল ফালগুন মাসা।
নাহি গেল তবহুঁ দুরাশা॥
হত চিত আল না ফুর। ফাল্গুন
দিন রাতি তছু গুণ ঝুর॥

দিন রাতি তছু গুণ ঝুর দূর সো উর পরয়ব নায়িয়ে।
তবহিঁ হতচিত হোত সচকিত হেরি পুন নাহি পাইয়ে॥

দেখ শিশির-নিশি বহি গেল।
মঝু পিয়াক দরশন না ভেল॥
মধুমাস পহিলহি সাজ। চৈত্র
হত মদন সঞে ঋতুরাজ ॥

হত মদন সঞে ঋতুরাজ আওত ভঙর গায়ত মাতিয়া।
কুহলে কোকিল কুহু কুহুহু ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

অব মাস ভেল বৈশাখ।
তরু কুসুমে ভরু নতশাখ॥ বৈশাখ
বহ মলয়-মারুত মন্দ।
ঝরু মাধবী মকরন্দ॥

ঝরু মাধবী মকরন্দ সো মত্ত মধুকর ঝঙ্কহিঁ।
টঙ্কারি কার্ম্মুক সাজি মনসিজ বিন্ধে মরম নিশঙ্কহিঁ॥

ইহ জৈঠ পৈঠল আগি।
দহ দহত তনু-বন লাগি।
রহ বেঢ়ি আগল পাশ। জ্যৈষ্ঠ
নাহি জীউ-হরিণ-নিকাশ॥

নাহি জীউ-হরিণ-নিকাশ শ্বাস না নিকশে ফাঁফর ধূমহিঁ।
হৃদয়-হ্রদরস শেষ শোষিত লুঠত সুতপত ভূমহিঁ॥

অব মাস ভেল আষাঢ়।
হিয়ে দাহ দুহ-গুণ বাঢ়॥

যাহাঁ দৈব দারুণ লাগি। আষাঢ়
তাহাঁ চাঁদ বরিখয়ে আগি ॥
তাহাঁ চাঁদ বরিখয়ে আগি লাগয়ে গরল মলয়জ পঙ্কহিঁ।
কমল কোমল সজল কিশলয় অনল দলসম শঙ্কহিঁ ॥

দেখ ভেল শাওন মাস।
অব নাহিঁ জীবন-আশ ॥ শ্রাবণ
ঘন গগনে গরজে গভীর।
হিয়ে হোয়ত যেও চৌচীর ॥
হিয়ে হোয়ত যেও চৌচীর থির না বান্ধে মত্ত দাদুরী-রবে।
ঝলকে দামিনী খনে খনে যনু মদন শর বরখবে।

দেখ ভেল ভাদর মাস।
ঘন বরিখে নাহি দিশ পাশ ॥ ভাদ্র
কিয়ে কান বাহুক লাগি।
দিনরাতি পতি-ভয়ে ভাগী ॥
দিনরাতি পতি-ভয়ে ভাগী রহ নহ দিবস রজনী বিভেদ রে।
ঐছে সময়ে না কানু মন্দিরে কৈছে সহ ইহ খেদরে ॥

দশদিশ ভেল পরকাশ।
ভৈ গেল আশিন মাস ॥ আশ্বিন
হতচিত অবহুঁ না জান।
অব পুন কি হেরব কান ॥
অব পুন কি হেরব কান নিরিখব নিয়ড়ে সে মুখ বান্ধরে।
অমিঞা মাখন মধুর ভাখন শুনব পুন মৃদু মন্দরে ॥

দেখ সোই কাত্তিক মাস।
ভেল কুন্দ-কুসুম-বিকাশ ॥ কাত্তিক
পুন সোই রজনী সুঠান।
ইহ সবহুঁ বিছুরব কান ॥
ইহ সবহুঁ বিছুরব কান কান হি কোন পুন সোঙরাব রে।
প্রিয় নন্দ-নন্দন-চরণে যব ঘনশ্যাম দাস না আয়ব রে ॥

রাধিকার বারমাস্যা

ভাগবত, শ্যামদাস—১৬শ শতাব্দী

ভাদ্রমাসে হরিজন্ম ভূ-ভার-তারণে।
ভব বিরিঞ্চির ভাব করিতে পালনে॥
ভাগ্যবন্ত নন্দ-গৃহে দেখি শ্যামরায়।
ভাব কৈনু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গা পায়।
উদ্ধব, ভরম ভাঙ্গিল।
ভকত-বৎসল হরি মথুরায় রহিল॥
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা এই তিন পুরে।
আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে॥
অখণ্ড শ্রীফল-দল অগুরু চন্দনে।
অনেক আরতি কৈনু গৌরী ত্রিলোচনে॥
উদ্ধব, অনেক ভাগ্যের ফলে।
অম্বর হরিয়া আজ্ঞা দিলা গোপীকুলে॥
কার্ত্তিকেতে কল্পতরু-মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জক্রীড়া-কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥
কত রঙ্গ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর।
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির॥
উদ্ধব হে, কহ কি করি উপায়।
কমললোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যায়।
মার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে।
আকুল হইয়া বুলি শোক গদগদে॥
আপনি আপনাগুণে প্রিয়া দিলা দেখা।
অনঙ্গ-সাগরে হে আমরা পানু রক্ষা॥
উদ্ধব, আর কি গোকুলে।
আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে॥
পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে॥

প্রভুর পীরিতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী॥
উদ্ধব, প্রিয়া গুণনিধি।
পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি॥
মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি-মন্দিরে।
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে॥
মাধবী মল্লিকা লতাকুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব, মরিহে বুঝিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া॥
ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায়॥
উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥
চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ-ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব, চিত্ত ছল ছল করে।
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥
বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের বায়।
বিরহী বিকল করে কোকিলের রায়॥
বাসা ভাঙ্গি বল্লকী করিব তোরে দূর।
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব হে, বিস্মরণ নয়।
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা-জলে যাদব-সংহতি।
জল-কেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী॥
জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়।
যৌবন চুম্বন-ধন যাচে যদুরায়॥
উদ্ধব, যত দুঃখ উঠে মনে।
জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ-বিহনে॥
আষাঢ়ে আঙ্গিনা রসে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ॥
উদ্ধব, অনেক যন্ত্রণা।
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা॥
শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত ষট্‌পদ হিল্লোলে॥
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
স্মঙরি স্মঙরি কান্দি এ ভব-তরঙ্গে॥
দুঃখী শ্যামদাস গায়।
চিত্ত দৃঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যামরায়॥*

(গ) আধুনিক বারমাস্যা

বারমাস্যা

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'

বিষ্ণু দে

১

ভেসে যায় হাওয়ায় হাওয়ায় তারা
তারা বুঝি বৃষ্টিহারা বৈশাখীর ঢেউ, হাওয়া, মেঘ
তারা গানের পাখির সুর, অগোচর,

---

* এগুলি একদিকে যেমন সাহিত্যধর্মী, অন্যদিকে তেমন এদের বিরহ ও মিলনের সুরটিও লক্ষণীয়।

দূর থেকে ডাক দিয়ে যায়
অস্পষ্ট ঝাপটে
ছাতে ছাতে হৃদয় ওড়ায়
দিনান্তের পটে তারা রেখে যায় উষার শিশিরে বেলি জুঁই ফুলে
চক্রান্তির মর্মর বারতা দক্ষিণা হাওয়ায় ধীরে ধীরে
সমুদ্রের গন্ধবহ হাতছানির সুরে সুরে তুলে
তারা নেই, কোথা তারা বসন্তের সমুদ্রের হাওয়া
নতুন বছরে
তমাল বা তালীবনে বননীল আমাদের
নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিত বসন্তের সেনা,
হৃদয়ে যাদের বিরাট সমুদ্র স্থির
শান্ত, রুদ্র, গভীর, সুনীল,
হাতে আনে আমেরু নিখিল উন্মুখর
বসন্তের হাওয়া কখনো চঞ্চল তারা কখনো মন্থর
দেশ হতে দেশান্তরে আকাশে আকাশে
দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় বাধাবন্ধহারা
কোথা তারা ভেসে যায়
সে বসন্তসেনা
কলকাতার বাঙলার দক্ষিণের হাওয়া
রেখে যায় অরণ্যে রোদন কোন্ নগরে অরণ্য কোন্ উচ্ছিষ্ট সন্ত্রাসে,
রাজার বাগানে জাগে উন্মাদ করাল পুঞ্জীভূত ভুলে
মরে হেসে খাঁচায় হায়েনা
চিতা চড়ে প্রাসাদ শিখরে
সিংহদ্বার ভাঙে হাতি, সিংহাসনে আসীন শৃগাল
ফলাও লাঙ্গুলে
নেকড়ের পাল ছোটে তাই দেখে সদরে অন্দরে
বীভৎস চীৎকারে
দিশাহারা নিস্তব্ধ আকাশ

ঝড়ে ঝড়ে কোথা তারা দুঃস্বপ্নের সমুদ্রের পারে
হাওয়ায় হাওয়ায় আসুক্ আসুক্ তারা ফিরে ফিরে
বৃষ্টি ধারে
নবধারা জলে তারা বৈশাখীর দীপকমল্লারে তারা
বৈশাখীর মেঘ তারা আমাদের সমুদ্রে
সে বসন্তসেনা।

রাত্রি রুদ্ধ, নিদ্রাহীন, জ্যেষ্ঠের জ্বালা নিঃশ্বাসে—
যেন মৈনাকমন্থনে আকাশ বাতাস মূর্চ্ছিত।
রাতের পাখীও করে না রা, স্তম্ভিত মন স্তব্ধতায়—
অর্জুন যেন অসম্ভব অজ্ঞাতবাসে অন্ধকার।
শুনি নিশাচরও নীরব, চুরি বাটপাড়ি নাকি নগরে কম!
সুন্দরবনে স্বপ্নে তাই বাঘে কুমিরের মিলিত গান!
কপিলগুহায় গোপন ও কারা? স্বেদাক্ত গুরু অন্ধকার
জ্যৈষ্ঠের জ্বালা নিশ্বাসে রাত্রি রুদ্ধ নিদ্রাহীন।
আকাশে একশো চুয়াল্লিশ বাতাস বন্ধ একঘরে
বিধিনিষেধের বজ্র আঁটুনি, অণুও বন্দী, গড়েছে ফেউ,
ফস্কাগেরোতে শৃগাল বেঁধেছে, গাঁটছড়ে ভালোমন্দ এক,
চোর বাটপাড় চেনাই যায় না, নিশাচরেরাই নীরব শুনি।
বৈশাখী শেষ, নিরেট গরম আষাঢ় বৃষ্টিধারার গান
কবে যে ধরবে উল্লাসে বঁধু বৃষ্টিভির্ উদ্বেজিতা!
বৃহন্নলার পাপ হবে ক্ষয়, পার্থ-সারথি নির্ঘোষে
নামাবে বর্ষা—মাটির হরিষে পুরবৈঞায় নিন্দ যাই।
কোথায় পার্থ-সারথি পৃথার পুত্র কোথায় পৃথিবী ডাকে।
শোনো উত্তরা উত্তরে আর দক্ষিণে একই উষ্ণ মায়া।
উষায় জাগাও উর্মিল হাওয়া সুভদ্র দিনে পাণ্ডু হাসি
তারপর ঐ পাঞ্চজন্যে ভাঙুক পাহাড় ভাঙুক পাহাড়
ভাসুক হাসুক কপিলগুহায় অমৃত আষাঢ় হাজার সাগর।

৩

বৃষ্টি তো নয়, মুঠি মুঠি ঝরে আনন্দ ফুলঝুরি
মুঠি মুঠি মিঠা হিমকরকার প্রপাত
এলোমেলো হাওয়া আনন্দে এলোমেলো
প্রথম প্রেমের পাহাড়ে স্রোতের খাত।
মহুয়া শুকানো মাস শেষ হয়ে এল
জামকাঁঠালের আমকাঁঠালের চির আকালের মাস,
বৃষ্টি তো নয় মুঠি মুঠি ধান ছড়া—
ওরে ও কানু কি ভাঙল দৈত্যপুরী!
সরসজীবন বয়ে আনে ভিজে হাওয়া
জীবনে স্বপ্ন রিমিঝিমি ঝুরু ঝুরু
সুন্দরদির পাগলা হাওয়াকে ধাওয়া
এই ফুলঝারি এই বা শিকারী পাড়া
এ ও-কে হারায় মেঘে মেঘে গুরু গুরু
মত্ত মাদল, হাওয়ায় পালক ওড়ে,
কাঠে কাঠি বাজে—শালবন মাঝে আষাঢ়ে মন্ত্রপড়া!
মহুয়াগাড়ির পাথর ভাসানো হাসি
পাল্‌সিতে ফোটে সফেন বেগের তোড়ে।
ও ময়ূরাক্ষী তুমিও এবার জাগো
নবজীবনের বীজবপনের বানে
ভাঙনে গড়নে দুই তটে তটে লাগো,
ত্রিকুটের জলে পরগণা বারোমাসই
বাঁচুক নাচের সচ্ছল সুখী গানে,
নাচুক নাচুক মেঘমালা মেয়ে যতো
দুহাতে ছড়িয়ে মুঠি মুঠি সাদা হাসি।

৪

সেদিনও আকাশে ঘনালো বর্ষা
বাজে আর বিদ্যুতে

নেমে এল সে কি শ্রাবণের ধারা
প্রবল জীবন যেন
নেমে এল এক মুহূর্ত উল্লাসে
ভাসাল প্রাত্যহিকের কড়চা
মেশাল আপন সত্তাকে দূরে ঘরে এনে অদ্ভুতে
নেমে এল বাধা বন্ধনহারা
দীর্ঘজীবন যেন
প্রাণ পেল এক মুহূর্ত উল্লাসে
মাঠ বাট খেত পাহাড় ঝরণা একাকার উল্লাসে।
সেদিনই আকাশে ঘনাল বর্ষা
যেদিন তোমার আসা।
সেদিন সুদূর তোমার স্মৃতির প্রান্তরে দেশছাড়া
তবু তুমি জেনো সেই বর্ষার জল
আমার হৃদয়ে
স্বচ্ছ দীঘিতে আজো বর্ষার ভাষা
পাহাড়তলীতে প্রবল শ্রাবণ যেন।

হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
ভেসে যায় অহরহ
তবু সাধ যায় তবু করি যাওয়া আসা
কাছাকাছি যদি পাই শূন্যের বাসা
নিত্যই আনি নানা ফল কাঁচা ডাঁসা
আনন্দে দুর্বহ
হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
শুনি আমি অহরহ।
তুমি আর আমি বুঝিবা বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা
তুমি চন্দনা ফুলের বনের শাখী

তোমার গন্ধ হৃদয়ে আমার মাখি
আমার বনের ফল এনে মুখে রাখি
শুনি নাকো দূর মানা
আমরা দুজনে দুইটি বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা ?
তোমার আকাশ আমার আকাশ মেশে
সূর্যাস্তের গানে
তুমি কি ভাসবে কখনও আমার দেশে
ঢালবে কি সুর আমার ডাকের রেশে
আমার বিভাসে আসবে সাহানা বেশে
বল্‌বে কি কানে কানে
তোমারও আকাশ আমার আকাশে মেশে
সূর্যোদয়ের গানে ?
সূর্যোদয়ের সূর্যাস্তের মিলে
সে কবে বাঁধবে দিন
আলো ঢেলে দেবে হৃদয়ের ঝিলমিলে
জীবন ছড়াবে মুক্ত এই নিখিলে
পাখির মতন স্বচ্ছ স্বাধীন নীলে
খোলা শৃঙ্খল-হীন
আজ হবে কাল, ভাদ্রে বাঁধবে মিলে
জ্বল্‌জ্বলে আশ্বিন !

যেতে হবে বহুদূর অজানা পাড়ায়
বাড়ি তার খুঁজে নিতে হবে
মোড়ের মাথায় কাছাকাছি এসে শুনি এসে গেছি প্রায়
তাড়াতাড়ি গলি এক বাঁয়
দেখে ঢুকি অন্ধকার অন্ধ চোরা গলি
অনেক শোষণে শুক্‌নো হাড়ে হাড়ে শান

বাঁধানো সে গলি যেন সরু আঁকা বাঁকা
কেবলই ডাইনে বাঁয়ে
অনেক কষ্টের অনশন ও অনেক মৃত্যুর
ঘেঁষাঘেঁষি ইতিহাসে জরজর এদিকে ওদিকে
অন্ধকার বাড়ি সারে সারে রংচটা চুন ঝরাঝরা
মনে হল শেষ নেই অন্তহীন চলা
কেবলই ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকার গায়ে গায়ে লাগে
ভাদ্রের ধোঁয়ার মতো কান্নায় কান্নায়
আকাশ অদৃশ্য প্রায় অন্ধকার বোবা গলি
নিচু নিচু বাড়ির কান্নায় চাপাহাসি প্রাণের গুমোটে
হঠাৎ সে গলি শেষ পড়ে যাই প্রায় বিস্মিত উঁচোটে
আলো পথে আলো লোক চলাচল রাতে দিনে
এক রাত জাগে দিনে
পৌঁছিয়েছি চৌমাথার আগে
শুনি তার বাড়ি নাকি গলির আগেই মোড়েরই মাথায়
বিস্তীর্ণ আকাশ যেন ঘুম থেকে জাগে ভাদ্রে নয়
সদ্যস্নাত প্রশস্ত আশ্বিনে।

পাথরে বাঁধিনি ধ'রে তোমায়, পূর্ণিমা।
ভুলে যাই খরস্রোতে দুইতটে সীমা
ভুলে যাই স্থাবর অভ্যাসে।
প্রেয়সী, তাই তো ক্ষমা
চাই, ঐ পূর্ণিমায় ভুলে যাই অমা
পৃথিবীর পশ্চিম নিশ্বাসে।
অস্থির আবেগ খোঁজে ছন্দে পরিক্রমা
মেলেনা মন্থর নাট্যে তোমার পূর্ণিমা।
ফল্গুর বিন্যাসে
আমরা প্রয়াগ নই, আমৃত্যু প্রয়াণে

সঙ্গত সঙ্গং নই ; যেন বাখ্, উভচর গানে
ভেদে স্বর, সোনাটা উপমা :
থেকে থেকে ওঠে মিল ঘূর্ণীর আশ্লেষে ।
অসহিষ্ণু অন্ধকার কোজাগার মেশে,
আবর্তে উল্লাসে মিলে যায় সীমা ।

সেখানে খাড়াই শেষ দিগন্তের নীলে দূর শূন্যে,
হিরণ্ময় স্তনাগ্র শেষ আকাশের হঠাৎ আশ্লেষে
ধানের সজল স্বচ্ছ সর্ষের অনচ্ছ আবেশে
মাটিতে কাঁকরে লাল আপিঙ্গল পথের রেখায়,
সেইখানে চোখ চলে, করকোষ্ঠী পাথুরে লেখায়
খুঁজে ফেরে বর্ষফল কয়েকটি হৃদয়ের পুণ্যে ।
তোমারও হৃদয়ে তাই হাত পাতি । আজকে শরতে
বর্ণাঢ্য পৃথিবী বটে, তবু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
স্মৃতির পরম্পরা ঘুলিয়েছে অঘ্রাণের দৃষ্টি
পরগণার ঘরে ঘরে, যদিচ নীলায় মরকতে
কুসুমার টিলা জ্বলে, তবু দূর দিগন্তে দিগন্তে
মন খোঁজে নিশ্চিতের ভবিষ্যৎ বর্ষায় হেমন্তে ।
এখন আসন্ন সন্ধ্যা । উপ্ড়িয়ে হিরন্ময় পাত্র
উন্মুক্ত বিরাট নীলে সত্যবান প্রাণ পায় রক্তিম ক্রান্তিতে ;
পশ্চিমের ছটা বই আমারও হৃদয়ে—একমাত্র
বাধা আজ অঘ্রাণের সোনা কালবৈশাখী চৈত্রীতে
লুটেরায় লুট করে । তাই আজ হাত পাতি তোমার মৈত্রীতে
মিলাও সন্ধ্যার রঙে প্রেমের সংরাগ তীব্র সংহত শান্তিতে ।

হিমগিরি ছেড়ে এলে তুমি কার জন্যে
অলকনন্দা ! যাবে বুঝি সমুদ্রে ?

তাই কি গিরিশ ছেড়ে চাও নীলরুদ্রে ?
মন্দাকিনী কি সমতলে এসে অন্য ?
পরিবর্তনে একই তুমি চির কন্যা,
চূড়া প্রান্তরে দেওদারশালে অনন্যা।
স্রোতস্বিনী সে শহর গ্রামের বন্যা,
আবার প্রিয়ার স্নানোদকে ধারা পুণ্য।
তুষার করকা! থৈ থৈ তুমি মোহানায়
তুমি সমুদ্রসত্তা কানায় কানায়
ক্রান্তি তোমার পৌষ করুক উষ্ণ।

১০

যাক রজনীতে ঝড় হয়ে যাক
রজনীগন্ধাবনে
সহিষ্ণু বাহু তুলি' কালো থাক
মাঘের মরণায়ণে
প্রেয়সী তোমার কালের কপোলে অক্ষয় চুম্বনে।
রজনীগন্ধা! দিনের আলোয়
তোমার মুকুল বাহু
আমার হৃদয় ভীম ভয় রোঁয়
বেঁধে দাও, উদ্বাহু
বিশ্ব মেতেছে বৃথাই জীবনে ওত পাতে বৃথা রাহু।
রজনীগন্ধা তোমার শরীর
ঢেকো না অন্ধকারে
মানসসরের ম্লান উষসীর
জহ্নুর কারাগারে
ভেঙে দাও নীল প্রেমের আলোয় জাহ্নবী শতধারে।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে ?
মোহিনী তোমাকে মন্দারে বাঁধি সমুদ্র মন্থনে।

১১

সেদিন গলির কৃষ্ণচূড়ায় ফুল
আকাশে স্বচ্ছ হাসির ইন্দ্রধনু।
করোনিকো কোনো ভুল
তুমি নেমে এলে
স্বপ্নে বিলালে তনু
শূন্যের সাততলা থেকে এই শহরের ঘরে এলে
বাস্তবিকের নির্ভয়ে অবহেলে।
আকাল বছরে কৃষ্ণচূড়াও ম্লান
গলিতে গলিতে আয়তচক্ষু হাড়
ফেরারী কতো না প্রাণ
তোমার দু চোখে তোমার মানসে সাড়
জাগায় নীল পাহাড় মেলে ধরে ফাল্গুন
জীবনেরই আহ্বানে
শহরে শূন্যে মেলায় নদীর পাড়
সেতু বেঁধে দেয় আষাঢ় ও ফাল্গুন
শূন্যতূণীর ফাল্গুনী ম্রিয়মাণ
তাই কি কিরাত আকাশ রুধ্যমান
মানুষের সম্মানে ?
মোছাও ঘোচাও কৃষ্ণচূড়ার শোক
গলির মোড়েই ছড়াও ইন্দ্রধনু
প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক
আকাশ যেমন পাহাড় যেমন স্বাধীন সমাজে জীবন যেমন
তোমার বাহুতে হৃদয় তনু-অতনু
তোমার বাহুতে ধরেছি ইন্দ্রধনু
তোমার চুলেই আলুলিত বেণী কৃষ্ণচূড়ার ফুল।

১২

প্রলাপে প্রলাপে বুঝি নাচে ক্ষ্যাপা বসন্ত আকাশ।
জীবনের তেপান্তরে বাউল হাওয়ার হাঁকে হাঁকে,

বেলি মল্লিকার শুভ্র প্রণিপাত পায়ে দলে দলে
চৈতালী-ঘূর্ণার রাজা নাচে একা মরীয়া গাজনে !
দোল পূর্ণিমার স্মৃতি বৈশাখীতে শ্মশানে ছড়ায়,
মড়কে মড়ক ঢাকে, ছিন্ন ভিন্ন শূন্যে হাহাকার !
বাতাসে ভিখারী মারী, মাটি গুটি, শূন্যে হাহাকার !
আসন্ন-নিপাত ধূম্রলোচন যে বসন্ত-আকাশ,
শারদ-পূর্ণিমা স্মৃতি, রাস আর মায়া না ছড়ায়,
ডুবে যায় শত শতাব্দীর স্মৃতি কবন্ধের হাঁকে ।
পিশাচ সিদ্ধের ভিড়ে ডাকিনীরা মেতেছে গাজনে !
সর্বভূতে মলে যায় চিত্ত যায় চণ্ডী পায়ে দলে—
কমলে কামিনী কিম্বা নটরাজ নাচে পায়ে দলে
শতদল চিত্ত শত সহস্র হৃদয়ে হাহাকার !
মেলে না পার্বতী-পরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে,
হিরণ্ময় পাত্র ভাঙে চোরে চোরে, উলঙ্গ আকাশ ।
তাই বুঝি থেকে থেকে ভৈরব ভ্রূকুটিভঙ্গে হাঁকে,
সতীর অস্থির অস্থি বিশ্বময় দুহাতে ছড়ায়,
তাই কি প্রলাপনাটে সমনামে ঘরোয়া ছড়ায়,
অন্নদা পৃথিবী হাসে থেকে থেকে, যতো পায়ে দলে
মৃত্যুরা ছড়ায় মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয় পিনাকীর হাঁকে,
তাই কি মরে না মাতা, মহাচীনে থামে হাহাকার ?
তাই তো হাড়িপা হানে অন্ধরাজে, উদ্যত আকাশ ;
হীরার দাসত্বে সারা দেশ কাঁদে ক্রান্তির গাজনে,
তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে থেকে ক্ষুধার্ত্ত গাজনে
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছড়ে ছড়ায়,
তাই ধর্মরাজ মৃত্যু, তাই মাতে মহিষ আকাশ,
প্রাণতীর্থে জনস্রোত মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে
শূন্যে শূন্যে ভ'রে তোলে শূন্যের সরকারী হাহাকার—
জীবনই মৃত্যুর বলি, শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে !
ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে,

সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত ঊর্মিল গাজনে
বিকচ ভবিষ্যে ফোটে মাথুর, কদম্বে হাহাকার ;
অকাল বোধনে চণ্ডী সেতুবন্ধে আশ্বাস ছড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ে পায়ে। মনসার শত চর দলে
নাগ পাশ ছিঁড়ি, মনে আশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশ।
প্রাণ দাও হে আকাশ
বিদ্যুতে বজ্রের হাঁকে হাঁকে
প্রাণের আকাশ দলে
রিমিঝিমি শান্তির গাজনে
ঝুলন ঝুলায় শ্যাম !
ছড়ায় সে অন্য হাহাকার ॥

গুজরাটী বারমাসী

বারোমাস পত্রিকা—বৈশাখ ১৩৬১

কৃষক-কবি রূপা কনবীর 'বারমাস্যা'

[পল্লীকবি রূপা কনবীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুজরাটের এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন]

প্রার্থনা : সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারি বিনতি
কনবী কেরা দুঃখনী কহু কথায় জো।
দে দুঃখ ঢালী অবনীনা আধার তু ;
অমথী রাখো তমে রাম রেহি বায় জো।
সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারি বিনতি ॥

বারোমাস্যা (১) : চড়ে বাদলা মাস আষাঢ়ো আওতো
মেঘ তন্থু তো পড়বা মাড়ে নীর জো ;
রাশ পরোনো কনবী কেরা হাথমা
ভিজি জায়ছে কনবী কেরু শরীর জো

২

শ্রাবণ মাসে মেহুলো বরষে শরবড়ে
　　　　লোদবদ পলড়ী জায় নব নে নার জো ;
দীকরাণী বহু সসরা পাসে জই কহে,
　　　　"সসরাজী কাই বারো ভাঙ্গর জার জো।"

৩

ভলে আবিয়ো ভাদর মহিনো হবে,
　　　　কনবী কেরী নারী লদবদ থায় জো,
চার তনো ভারো মাথে জেনী গলে,
　　　　ছে'য়া কেড়ে বড়তা পলতী যায় জো।

৪

আসোসা আশা তো রাখী অতি ঘনী
　　　　বাট জোয়লো মেঘ বরসবা কাজ জো ;
জার বাজরী ডুড়ে আবী বেসবা,
　　　　ভাঙ্গর পানি বিনা শুকায়ে আজ জো।

৫

কাত্তিক মা ওখরাতদার তে আবিয়ো ;
　　　　কবে আস্কড়ো সীমমাহ তৈয়ার জো,
"এক সিঙ্গ কে কণ নব কাই উপাড় শো"।
　　　　এবী রায়তনী আজ্ঞা নো সার জো।

৬

মাগশর মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী,
　　　　পেহেলো হপতো ওখরারা মণ্ডায় জো ;
মুখী তলাটী চোবে বেসে জই চড়ী
　　　　কনবী বিচারো বহুরীতে কুটায় জো।

৭

পোষে বীজো পাক রবীনে খায়ছে
　　　　রুণা কালা কাটি যায় সমাজ জো ;

ছে আ সমে

পন তে মা এজ নবী চলাবা কাজ জো।

আবো মাঘ মহিনো রুড়ী রীতথী,

লীলা কচ সৌ খেতর তো দেখায় জো,

বাজানো জে কর তে সঘলো আপিয়ো ;

পন মাথাপর হীম তন্থু ভয় থায় জো।

ফাগুন মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী

হীমে খহুনো কীধো পুরো নাশ জো

"চালো আপন সটি যে" পণ শার কামন্থু,

মুখিয়ে মুকী চোকী চারে পাস জো।

১০

"চোরে তো সৌথায় একটা চৈত্রমা ;

মাগে" লাবো কর জেতম পর থায় জো,

কাস্তনারী বিধবানী মজুরী লে লুন্ঠি

সর্বে জোর জুলমথী লুন্ঠি জায় জো।

১১

জমিনদার বৈশাখে আবীনে লুটে,

গায় ভেসনা দুধ দহীন্থু জে কায় জো ;

ছায় বিনা ছৈয়া সৌ লেবল বহু করে

পন পাপিয়ো চালু লুট মায় জো।

১২

জেঠ মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী

চীড়াই গয়ে লো কনবী খন্দো খায় জো ;

সম খাতানে আশা তেনে আপতা

খেতর মা খাতরতে স্থরবা জায় জো।

অনুবাদ :—

প্রার্থনা—হে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো। কনবী কেরার দুঃখ বর্ণনা কচ্ছি—আমাদের দুঃখ দূর করো, তুমিই অবনীর আধার; রাম, তুমিই আমাদের রেখেছ, তাই আছি। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো॥

(১) আষাঢ় মাস আসতেই মেঘ দেখা দেয়। মেঘ তনু থেকে জল পড়তে আরম্ভ হয়। কনবী ও কেরা হাতে রাশ আর পাচন গ্রহণ করে, কনবী করুর শরীর জলে ভিজে যায়।

(২) শ্রাবণ মাসে মেঘ থেকে বৃষ্টি মাঝে মাঝে হয়; নরনারী পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। পুত্রবধূ শ্বশুরের কাছে গিয়ে বলে, "শ্বশুরমশাই, কিছু শস্য বপন করুন।"

(৩) ভাদ্রমাসে খুব ভাল বিষ্টি হয়। কনবী কেরার নারী জলে ভিজে যায়। তৃণসমষ্টি ভেদ করে বিষ্টির জল ক্রন্দনরত বালকের মাথায় পড়ে ভিজিয়ে দেয়।

(৪) আশ্বিন মাসে অনেক আশা রাখি যে, মেঘ থেকে বিষ্টি বর্ষিত হবে। জোয়ার এবং বাজরী মাথায় তুলে নেওয়া হয়। জলের অভাবে ধান শুকিয়ে যায়।

(৫) কাতিক মাসে রাজকর্মচারী এসে গাঁয়ের প্রান্তে বসে হিসাব তৈরী করলো—"এক কণা শস্য কেউ মাঠ থেকে তুলো না"—এই প্রকার রাজার আজ্ঞা শোনো।

(৬) অগ্রহায়ণ মাস ভালভাবেই এলো। খাজনার প্রথমবারের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রধান এবং তহসিলদার গাড়ীতে চড়ে সহরে চলে গেল। কনবীর অনেক দুঃখ সহ্য করতে হ'ল।

(৭) পৌষমাসে দ্বিতীয়বার শস্য বপন করা হয়। কাপাসের গুটি ফুটতে আরম্ভ করে। সেই সময় পুরাতন যা কিছু দূর করা হয়েছে। কেবল নূতনের জন্যে কাজে সবাই প্রবৃত্ত হয়েছে।

(৮) মাঘমাস ভালভাবেই এলো। ক্ষেতগুলো শ্যামল দেখাতে লাগলো। রাজার খাজনা সবই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের মাথার ওপর হিমকণা ভয় দেখাচ্ছে।

(৯) ফাগুন মাসও ভালভাবে এলো। হিমে সমস্ত শস্য নষ্ট করে দিয়েছে। 'চল পালিয়ে যাই'? কিন্তু কেমন করে? চারিদিকে মোড়ল পাহারা বসিয়েছে।

(১০) চৈত্রমাসে সকলে সহরে একত্র হয়। বলে, "তোমার ওপর যে খাজনা ধার্য হয়েছে, আনো।" নিরাশ্রয়া বিধবা নারীর উপার্জন লুটে নেয়। সবই জোর করে কেড়ে নেয়।

(১১) বৈশাখ মাসে জমিদার এসে গরু-মহিষের দুধ দই সব লুটে নিয়ে যায়। দুধ মাখন বিনা ছেলেপুলেরা ক্রন্দন করে, কিন্তু পাপীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য জোর করে নিয়ে চলে যায়।

(১২) জ্যৈষ্ঠমাস ভালভাবেই এলো। ক্রুদ্ধ কনবী শান্ত হয়ে যায়। তারা বিধাতার কাছে প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করে এবং ক্ষেত্রে চাষ করতে যায়।

প্রেম-লিপি

নৃত্যকৃষ্ণ বসু, 'কাব্য-দীপালি'—
শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত।

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহুরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পক বাসে বসন্তের বাসরভবন ;
লবঙ্গ কলিকা ঘ্রাণে লালস বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি শিহরিবে মৃদু সমীরণ ;
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন
অজ্ঞাতে নয়ন-জলে ভাসিবে নয়ন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

আষাঢ়ে নিশীথকালে সজল জলদজালে
হয় যবে মুহুর্মুহু দলমল দামিনী ফুরণ,
বিজন শয়ন পরে একা শুয়ে শূন্য ঘরে
মরমে উচ্ছ্বসি উঠে মরমের গভীর বেদন,
তিমিরে মগন সব অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব
চারি পাশে ঝম ঝম বৃষ্টি বরিষণ ;—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

আশ্বিনে আকাশ গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায়
শরতের শুভ্রশশী শুভ্রহাসি বিকাশে যখন ;

সরসে কহ্লার-বনে নগ্ন শোভা নিকেতনে
তরল লহরী সনে খেলা করে তরল কিরণ,
সুদূরে স্বপন প্রায় চকোর ডাকিয়া যায় ;
কেঁপে উঠে প্রকৃতির প্রস্ফুট যৌবন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

হায়ণে হেমন্ত বাণী সোহাগে বুকেতে টানি
রাশি রাশি ব্রীহি যব—গুচ্ছে গুচ্ছে অপূর্ব শোভন,
যতদূর দৃষ্টি চলে দেখেন সুকুতূহলে
শসের লহর-লীলা, পক্বশীর্ষে কষিত কাঞ্চন,
হেরি সে মূরতি ধীর কৃষি-বধূ মুছে নীর
সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

পউষে প্রথম যবে গোলাপ-কুমারী সবে
সরমে রাঙ্গিয়া উঠে অরুণের লভিয়া চুম্বন,
শুভ্র হিয়া শুভ্র বাস কুন্দমুখে ফুটে হাস
ধরিত্রী কসিয়া লয় নিজ কাঁধে কুহেলি বসন ।
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে লয়ে বুকে
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

ফাল্গুনে বসুধা রাণী প্রথম যৌবন মানি
প্রথম মুকুল দুটি রাখে কোথা করিয়া গোপন,
বিহ্বল সৌরভ তার ছায় ক্রমে চারিধার
বসে থাকে উদাসিনী আপনাতে আপনি মগন ;
উন্মুক্ত অলক রাশ শিথিল বুকের বাস
টানিয়া লইতে বুকে হয়না স্মরণ—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

এরূপে জীবনে যবে প্রমোদ প্রফুল্ল রবে—
বীণার ঝঙ্কারে হবে প্রতিধ্বনি-ধ্বনিত ভুবন ;

প্রকৃতির স্নেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ
জাগাইবে মর্ম্মমাঝে তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন।
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সহস্র সাধনে সাধা
পিরীতের সরোবরে অমিয় মন্থন,
হে সুন্দর, আসিও তখন!
অন্তিমে মৃত্তিকা-পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে
সরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিঁধিবে যখন;
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হবে না শেষ
দহিবে সৌন্দর্য-তৃষ্ণা অন্তর্দাহী স্ফুলিঙ্গ মতন;
বারেক বিমুক্ত প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন,
হে সুন্দর, আসিও তখন।

'চির মিলন'

শ্রীকালিদাস রায়—'ঋতুমঙ্গল'

নিদাঘে তোমারে, স্বামী, কেমনে ছাড়িব আমি
বধি' মোর চিত্ত-চাতকীরে?
ও চরণছায়া বিনা কেমনে বাঁচিবে দীনা
দাহ সহি' ভিতরে বাহিরে?
পাখাখানি ধরি করে বসিয়া শিয়র 'পরে
কর বঁধু যদি না ব্যজন,
শীতল আঙুলগুলি না বুলালে রসতুলী,
জ্বলে' যাবে বিনিদ্র নয়ন।
ঘন ঘোর বরষায় বিরহ কি সহা যায়?
ও কথা কয়ো না প্রিয়তম,
দুর্যোগ আঁধার রাতে বিশ্বসাথে ঝঞ্ঝাবাতে
কাঁপিব যে দীপশিখা সম।
গৃহখানি নিরজন শুনি মেঘ গরজন
আতঙ্কে যে শিহরিবে কায়।

দূরে যদি রহ তুমি কাহারে আঁকড়ি চুমি'
অভয় লভিব বল হায় ?
শরতের দিনে প্রভু ছাড়িতে কি পারি কভু ?
বিশ্ব গায় মিলনের সাম,
কোটরে নিকুঞ্জে নীড়ে নীরে তীরে গিরিশিরে,
কোথাও না বিরহের নাম।
উৎসব-বাঁশরী বাজে গেহে গেহে হিয়া মাঝে,
সবে চুমে প্রিয়ের বয়ান,
জনগণ কোলাহলে মায়ের দেউল তলে
মোর কিগো হবে বলিদান ?
হেমন্তের দিনে বঁধু হে মোর জীবন-মধু,
তোমারে ছাড়িব কোন্ দুখে ?
শ্যামে ভরে' যাবে ধরা রাসে বিশ্ব রসভরা,
মোরি শ্যাম রহিবে না বুকে ?
শেফালি পড়িবে ঝরি, আমি বা কাহারে ধরি ?
দূর্বাসম হবে মোর দশা।
নয়ন-কমলে মোর দলিবে নীহার-লোর।
হিমে কান্ত একান্ত ভরসা।
হে নাথ শীতের দিনে বাঁচিব কি তোমা বিনে ?
কেবা দিবে আশা তাপ আলো ?
হে মোর অরুণ নব, করুণা-কিরণ তব
মুখে চোখে যদি নাহি ঢালো,
ভালে গণ্ডে উষ্ণ শ্বাস তপ্ত চুমা বাহুপাশ
বিনা আর বাঁচিব কি হায় ?
ও হৃদি-কুলায় ছাড়া পাখী হবে প্রাণহারা
পালক উড়িবে আঙিনায়।
বসন্ত-বাসরে, সখে মল্লীচম্পা-কুরবকে
গাবে অলি মিলনমঙ্গল।

তুমি যদি কাছে রহি ব্যাকুল কামনা সহি
এ যৌবন না কর সফল,
এত যদি কর ঘৃণা, কি গতি আমার, বিনা
দীঘির গভীর কালো জল।
কোকিল মরিবে কেন? আমারে পাঠায়ো যেন
পত্রপুটে ফণীর গরল।

'মধুমালা'

বারমাসী—আশুতোষ ভট্টাচার্য

অগ্রাণ

কেন বা ভাঙালে ঘুম? বাহিরে যে এখনো আঁধার!
বুঝিবা সোনালি রোদ ফুটে নাই পূবের আকাশে;
অলস আঁখির পাতা ঘুমের আবেশে মুদি' আসে,
এখনি ঘরের কাজে বাহিরিতে হ'বে কি তোমার?
জানেলা খুলিয়া আজি দেখি' যাও কি শোভা উষার,—
কিশোরী কলিকা ফুটে অতসীর হিমেল বাতাসে
সবুজ পাতার বিলে সাদা লাউফুল ডোবে ভাসে,
শাখার আঙুলে যেন সজিনার ভরেছে তুষার!
দুপুরে আসিও তবে ঘরে না রহিলে গুরুজন,
ভরিয়া ধানের গাদা ছোট'রা খেলিবে লুকোচুরি,
আমরা বসিব দোঁহে খুলিয়া পূবের বাতায়ন,
দেখিব, সরিষা-ক্ষেতে মেঠো মেয়ে জ্বালে ফুলঝুরি!
আকাশ কলাই-ফুলে মুখছবি হেরিবে আপন,
দিনের স্বপনে চোখে জাগিবে দূরের বনপুরী।

পৌষ

রুধিলে কি বাতায়ন, এখনি আঁধার হ'ল দেখি?
এ' ঘরে পশিবে বলি' রজনীর শীতল বাতাস?

সর কুয়াসা নামে ঘিরি' দূর সাঁঝের আকাশ ;
দেখ না, তাহার বুকে এখনি তারকা ফুটেছে কি ?
খুলি' হের বাতায়ন, আকাশে কে গেল বুঝি লেখি',
একটি চাঁদের লেখা, আঁকা বাঁকা রূপালি আভাস ;
ফুলের আতর-ভরা রজনীর সুরভি-নিশাস,
লাগিবে তোমার গায় ; শুনিয়া অবাক মানিলে কি ?
...... ইত্যাদি

'পথের চাকুরী'

মরীচিকা কাব্য—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বৈশাখ চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল।
দুপ'রে দারুণ রোদে
মাদুরে নয়ন মোদে—
কবিসনে কবিপ্রিয়া প্রেমে মশগুল !
আমি কি করি ?
যা'-তা' উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ত্রুটি
'বাই-সাইকেলে' উঠি—
সাড়ে-দশ ক্রোশ ছুটি ;—এই চাকুরি !

জ্যৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা-বিকল,
ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাই সিকল' !
শুকায় সরিৎ কূপ,
ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ,
ডানে বাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাই নাই জল।
আমি কি করি ?
যত মোড়লে ধরি,
হেঁকে কই শুন সবে—

'এ গাঁয়ে ইঁদারা হবে,
কত চাঁদা দেবে ?'—মোর এই চাকুরি !

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে যেয়াদা
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা !
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !

আমি কি করি ?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে'
যোগাই যে চায় তারে কলসি দড়ি !

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া ;
নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া।
অবিরল ঝরে জল,
কবিদল চঞ্চল,
পাকা পথে থাক্ দেওয়া সাজানো খোয়া।

দো-চাকা দাঁড়ে,
'বর্‌ষাতি'টি ঘাড়ে,
পন্ পন্ চলে' যাই,
পড়ি-পড়ি—সামলাই,
নিজে ভিজে সুখে রাখি চাকুরিটারে !

ভাদ্রেতে ভদ্রতা চলে নাক আর,
কাদায় দো-চাকা ঠেলা—বিষম ব্যাপার !
উপায় গরুর গাড়ী,
—হোক্ না শ্বশুর বাড়ী !
ঘাটে বাটে ধানে পাটে বানে একাকার।

সেবন করি
চা—এবং বড়ি ;
কোন্ পথে কত জল ?
বন্ধ কি চলাচল ?—
তদন্তে প্রাণান্ত ;—এই চাকুরি !

আশ্বিনে আস্‌মানে আলোর খেলা,
নদীকূলে কাশফুলে সাদার মেলা ।
প্রবাসী স্ববাসে আসি',
উভয়তঃ কত হাসি ;
আগমনী গায় বাঁশী ভোরের বেলা ।

তারি বিকেলে,
শোভি 'বাই-সিকেলে' ।
আমি কভু তার 'পরে ।
সে কভু আমাতে চড়ে,
রাখি এ চাকুরিটারে এ ওরে ঠেলে !

কার্ত্তিকে চারদিকে পেকে উঠে ধান,
মাঝপথে ছুটে মোর দ্বিচক্র-যান ।
উড়ে ধূলি ঘুরে চাকা
অঘ্রাণ দেয় দেখা,
শীতে হিমে আসে জমে' কুলিদের প্রাণ ।

ভোরে বেরিয়ে,
আর কত ঘুরি হে !
পাগলা খেজুর গাছে,
এত রসও জমে' আছে !
'কুমার'—কুমারী পিয়ে গলা জড়িয়ে ।

অঘ্রাণ পেয়ে ত্রাণ ক্রমে দিল পাশ ;
আমা ছাড়া সকলেরই এল পোষ মাস ।

ছুটে' ছুটে' দিক ভুল,
ফুটে সর্ষের ফুল !
কুয়াশায় ঢাকা গায় মাঘের প্রকাশ।
আমি কি করি,
সেই পা-গাড়ি চড়ি,
পথগুলি দেখি ঘাঁটি,
মাটি বিনা হয় মাটি,
কভু ছুটি কভু হাঁটি, এই চাকুরি !

ফাল্গুন ঝাল-নুন দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই যার পড়ে কাটা ঘায় !
হায় হায় উহু আহা,—
'তুঁহু' সব চায় দোঁহা,
কুহুকুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধুবায় !
আশঙ্কা কি ?
মোর পরণে থাকি ;
শ্রীচরণে সু-ভীষণ
ঘুরে দু' সুদর্শন,
খাদ মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি !

চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল,
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—উঠেনি আসল !
ধূ ধূ করে চারিদিক,
তখনো ডাকিছে পিক—
নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল।
আমার যা হয়—
কহ-তব্য তা নয়।
ক্রিং ক্রিং—সর' ভাই,
নহে যে আছাড় খাই !
যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয় !*

* এগুলির কোন কোনটির সাহিত্যধর্ম এবং বিরহব্যঞ্জক সুরটিও উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) আখ্যান বা বর্ণনামূলক বারমাস্যা

মনসামঙ্গল—ষষ্ঠীবর দত্ত

মনসার বারমাসী

"আমি না জীয়াইমু চান্দের সুন্দর গো,
ও পাত্র, নেতাই, বল সুন্দরী দেশে যাউকা।
লখাইর অস্থি জলেতে পালাউকা গো॥

সংসারের জীব যত ইতি স্রজিলেক প্রজাপতি—
আমি নহি তনু গড়িবারে।
বেহুলার মড়া না দিও আমারে গো॥

দেবের দেব মহেশ্বর গণপতি তার কুঙর
সেই হনে হইছে ছেদ মাথা।
আপনে সাতাইয়ে তানে না পারে রাখিতা গো॥

কামদেব ভস্ম করি না জীয়াইলা ত্রিপুরারি
রাত্রিদিনে দেবে স্তুতি করে।
রতিকন্যা কান্দিল বিস্তর গো॥

মুনি-শাপে তনু ছাড়ি (কান্দে) লক্ষ্মী-সরস্বতী নারী
যত্ন করিলা জীয়াইবার।
সেই তনু না হৈল সঞ্চার গো॥

রাবণ মৈল রামের বাণে ধরিয়া দুই চরণে
মন্দোদরী করিল মিনতি।
তারে না জীয়াইলা রঘুপতি গো॥

মথুরার রাজা কংসবর বধিলেক গদাধর
মাতুল সম্বন্ধ তান সনে।
তানে না জীয়াইলা নারায়ণে গো॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে গেলু চান্দের যে বাড়ী:
মোরে পূজে সুনকা সুন্দরী॥
চান্দের কি করিলু অপচয়।
পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া চান্দে সব কৈল ক্ষয় গো॥

আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথি।
সবে পূজে সানন্দিত মতি॥
পথে ঘাটে বৈসাইল থানা।
পুরীর মধ্যে যাইতে মোরে কৈল মানা গো॥
শ্রাবণ মাসেতে হইল গাঙ্গে নয়া পানী।
মোর নাগে কেলী করে ভাটি আর উজানী॥
চান্দের কি করিলু অপচয়।
নাগগণ মারিয়া চান্দে সব কৈল ক্ষয় গো॥
ভাদ্র মাসের দিনে ত্রিদশের পূজা।
সবানে পূজিলা চান্দ রাজা॥
হাঁটিয়া আইলু বড় পাইলু দুঃখ।
তথাপি না চান্দে ফিরি চাইল মোর মুখ গো॥
আশ্বিন মাসের দিন নব দুর্গার পূজা।
সবানে পূজিল চান্দ রাজা॥
চান্দে মোরে না দেয় পুষ্পপানী।
মোরে গালি পাড়ে চান্দে—লঘুজাতি কানী গো॥
কার্তিক মাসেতে গেলু জালু মালুর ঘরে।
সুনকায় পূজিল আমারে॥
হেমতালে চান্দে মোরে মারে।
কাঁকালি ভাঙ্গিল মোর বাতুয়া সদাগরে॥
অগ্রায়ণ মাসেত চান্দে মোরে পাইল পথে।
বেয়াইন বলিয়া মোর ধরে বাম হাতে॥
মোর ঝিউ বিয়া কৈল চান্দের কোন পুতে গো॥
পৌষ মাসের দিন হইল পুষ্পবাড়ী।
হুঙ্কারে পুড়িলু চান্দের বাগান বাড়ী॥
উঝায়ে জুড়িল মন্ত্রবাণ।
জীয়াইল পোড়া বাগোয়ান গো॥
মাঘ মাসেতে মুই গেলু চান্দের বাড়ী।
মোরে পূজে সুমুকা নাগরী॥

কনকা বলিয়া মোরে ধরে।
পরিহাস্য ছলে চান্দে দুঃখ দিল মোরে গো॥
ফাল্গুন মাসেত মুই বাপের আজ্ঞা পাইলু।
বাক্যের টনকে চান্দের ছয় পুত্র খাইলু॥
সুন্দকায়ে কান্দিয়া করুণা।
তথাপি বাদুয়া চান্দে না চিনে আপনা গো॥
চৈত্র মাসেত হইল বসন্তের বাও।
চান্দের ডুবাইলু চৌদ্দ নাও॥
কৃপা করি না মারিলু তাতে।
কুবুলা পাইল পদ্মপাতে গো॥
বৈশাখ মাসেত রে লখাইয়ে বিয়া করে।
গালি পাড়ে চান্দ সদাগরে॥"
শ্রীষষ্ঠীবর কবি ভণে।
নেতার সাক্ষাতে পদ্মা বলে দুঃখ মনে গো॥

শীত ছ'মাসী—

কাত্তিকি শীত আসে রাতি কি।
মগুশিরি শীত করে সিরি সিরি।
পুষ শীত করে ভুষ্ ভুষ্।
মাঘ শীতর বড় রাগ্।
ফগুণ শীত করে দ্বিগুণ।
চইত শীত যাই বোইত।

পল্লীগীতি সঞ্চয়ন, পৃঃ ৫৫১
কুঞ্জবিহারী দাস

বারমাসী খাদ্য—

পুষ-মাসে মূলা মুড়ি খাইবাকু মিঠা
ঘন আউটা পাট-কপুরা চকটা, পোড় পিঠা।
মাঘ মাসে মকর মিঠা কেটুতলে সিম্
ফগুণে দিগুণ মিঠা বাইগণে নিম্।

চইতে শ্রীফল মিঠা খাইথিলে রাম
বৈশাখ মাসে খাইথিলে সঁজ মাছরে আম্ব।
জেষ্ঠরে পাচিলা আম্ব আষাড়ে কণ্ঠাল
শ্রাবণে তাল ভাদরে নূআ চুড়া গুড়।
অশিনরে ঘিঅ পিঠা কাত্তিকে হবিষ
মগুশিরে নূআ ভাত চুঙ্গুড়ি মাছরস।
বারমাসরে বার খাইলু আউ খাইবু কী ?
পখাল ভাতরে বাইগণ পোড়া খেচাড়ি ভাতরে ঘি।

(বালেশ্বর)

পঃ গীঃ সঃ—পৃঃ ৫৫১

(ঙ) ব্যক্তিগত দুঃখ-দারিদ্র্যমূলক বারমাস্যা

ফুল্লরার বারমাসী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুটী তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতব খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পাও পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আটে খুঁয়ার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধা সারি॥

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খায় করে উপবাস॥
আষাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু ক্ষুদ কুড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত তুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়ায় আইসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আটদিকে জল॥
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলি দানে॥

উত্তম বসনে বেশ করিয়া বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥

কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে॥

কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥

নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥

দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
জানু ভানু কৃষাণু শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্ব জন।
তুলা তনুপাৎ তৈল তাম্বুল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥
হরিণ বদলে পাই পুরাণা খোসালা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজঝটি।
আঁধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে।
পীড়িত তপস্বিগণ বসন্ত বাতাসে॥
শুন মোর বাণী রমা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধিনী॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
ক্ষুদসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
কতবা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥

দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীরে মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥
বনিতা পুরুষ দোহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥
দারুণ দৈব দোষে দারুণ দৈব দোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন ষোল কোশে ॥

ফুল্লরার বারমাসী

চণ্ডীমঙ্গলের গীত—দ্বিজ মাধব

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শুন যত মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে।
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে ভূমি পরে ॥
সবিনয় বাক্য মোর শুন লো সুন্দরি
কোন সুখের লাগি হইবা ব্যাধের নারী ॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধাএ আকুল হয়্যা লোটাই আমি ক্ষিতি ॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারি দিগে চাই।
হেন সাধ করে মনে অন্য বনে যাই ॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে হাটু পানী ॥
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুই জনে ॥
ভাদ্র মাসেতে কন্যা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেন কালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার।
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি অর্কের কুমার ॥

আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়॥
বীণা বাঁশি বাজায় কেহ কেহ গায় গীত।
অন্নের কারণে প্রভু সদায় চিন্তিত॥
গিরি সুতা-সুত-মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়াতে পরশী নাহি কহিবারে দুঃখ॥
উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গাএ নাহি বল।
ক্ষুধায় আকুল হয়্যা খাই বন-ফুল॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে শীত অতিশয়।
জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ তনু শরীরে না সয়॥
শয়ন মৃগের চর্ম্মে চর্ম্মের বসন।
শীতেতে কাঁপিয়া ঘরে বঞ্চি দুই জন॥
পৌষ মাসেতে কন্যা হেমন্ত দুস্তর।
শীত ভয়ে প্রাণ কাঁপে নাহিক অম্বর॥
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাঁপে ঘন ঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন॥
মাঘ মাসেতে কন্যা গরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে শীত শোষয়ে শোণিত॥
খৈয়া বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবিজালে॥
ফাল্গুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি।
নিজ পরিবার লয়্যা সখার সঙ্গতি॥
কামিনী করয়ে কেলি প্রভু লয়্যা পাশে।
হেন সমে যায় বীর অরণ্য প্রবাসে॥
মধু মাসেতে কন্যা শুন মোর কথা।
রবির উত্তাপে মোর দগধয়ে মাথা॥
দুঃখিত যে বীরমণি অন্তরে কি সুখ।
ভিন্ন রমণীর বীর নাহি চাহে মুখ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে।
উত্তর না দিলা দুর্গা ফুল্লরার বচনে॥

খুল্লনার বারমাস্যা

চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দরাম

প্রথম জ্যৈষ্ঠেতে গেলা গড়াতে পিঞ্জর।
প্রবলা সতিনী মোর হৈল স্বতন্তর॥
ছাগল রাখিতে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
খুঞা পরাইয়া নিল যত আভরণ॥
আষাঢ়ে গগনে মেঘ উড়িল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড।
সকল পূরিল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥
ছাগল চরাই গিয়ে পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে॥

* * *

বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিন দিন ব্যতীতে লহনা দেয় তেল॥

* * *

অনশন ব্রত করি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি॥
রামা পরে অলংকার রামা পরে অলংকার।
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার॥

* * *

মার্গশীর্ষ মাসে ধান কাটয়ে সংসারে।
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে॥
* * *
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
* * *
শয়ন ঢেঁকিশালে নাথ শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা—জ্বালে॥
... ... ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল —ষষ্ঠীবর দত্ত

বেহুলার অষ্টমাসী

"শুন গো, মনুসা মাও গো, মহাদেবের ঝি।
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি॥
বৈশাখ মাসেত, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে।
কাল রাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে॥
রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু।
ইষ্টমিত্র বাপ ভাই ফিরিয়া না চাইলু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত, মাও গো, ভাসিলু সাগরে।
দারুণ জ্যৈষ্ঠের খরায় বজ্র ভাঙ্গি পড়ে॥
প্রাণনাথ স্মরি, মাও গো, চক্ষের পড়ে পানী।
শুকুনা কাষ্ঠেত যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
আষাঢ় মাসেত, মাও গো, গাঙ্গে নয়া পানী।
প্রভুরে খাইতে আইল অরণ্যের বাঘুনী॥
আত্মমাংস কাটি, দেবি, যুগাইলু আহার।
ছাড়িয়া পলাইল বাঘে বুঝি ব্যবহার॥
শ্রাবণ মাসেতে, দেবী গো, ঝড় বরিষণ।
স্বামী নাহিক যার নিষ্ফল জীবন॥

সাগরে ভাসিয়া আমি বর্ত্তির ঘাটে আইলু।
বর্ত্তির সঙ্গ পাইয়া, মাও, তোমারে পূজিলু॥
ভাদ্র মাসেতে, দেবী গো, বাদুলী ঘন হইল।
জুক, পোক, মশা, মাছি সমাইয়ে বাস লৈল॥
জুক, পোক, মশা, মাছি গো, সমাইয়ে লৈলা ঘর।
মুই অভাগী ভাসিলু, মাও, গণ্ডকী সাগর॥
আশ্বিন মাসেতে, মাও গো, নেতার ঘাটে আইলু।
রজকীর রূপ ধরি কাপড় ধুইলু॥
বড়ের কুমারী হইয়া না বাসিলু ভিন।
নেতার ঘাটেতে ছিলু সমস্ত আশ্বিন॥
কার্তিক মাসেতে, মাগো, ত্রিদশের মেলে আইলু।
নর্ত্তকীর বেশ ধরি দেবতা মানাইনু॥
অগ্রায়ণ মাসেতে, দেবী গো, মাগিয়া লৈলু বর।
জীয়াইয়া দেও, মাও, দুর্লভ লক্ষ্মীধর॥"
শ্রীষষ্ঠীবর কবি গো, মনসা দেবীর বর।
অষ্টমাসী গাইলা কন্যা পদ্মার গোচর॥

মনসা-বিজয় —বিপ্রদাস

মনসার বারমাস্যা

ডক্টর সুকুমার সেন সম্পাদিত

কৌরাগ

নর হৈয়া মন্দ বলে চাঁদো দুষ্ট পাপ
শুন লো বেহুলা তোরে কহি দুঃখ তাপ।
বৈশাখে আমারে পূজে সনকা বাণ্যানি
লঙ্ঘিয়া আমার ঘট বলে মন্দ বাণী।
জ্যৈষ্ঠে আমারে লোক করে অভিষেক
সর্বক্ষণ মন্দ বলে সহিব কতেক।
নীরস সকল রামা মঞ্জরিত শাখী
চূত পূগ পনস সুত সম্ভ্রমে লোক সুখী।

শালি-রূপ হইয়া গেনু চাঁদো বিত্তমান
নাথরা কাটিয়া হরি লৈনু মহাজ্ঞান।
নিরমল দশ দিশ তড়িত আকার
ধন্বন্তরি নামে দুষ্ট বলে দুরাচার।

গোয়ালিনী সহীরূপে ধন্বন্তরি বধি
আষাঢ়ের জতো দুঃখ কহিনু অবধি।
হেরো বলি বেহুলা গো অবধান কর
ধনা মনা নামে দুই মালির কুমার।

বধিয়া আনিনু দুষ্ট অরিষ্ট প্রবল
শ্রাবণের দুঃখ তোরে কহিল সকল।
অনুক্ষণ চাঁদো নিন্দা করে ভাদ্র মাসে
তার পুরী নাগ মোর না জায় তরাসে।

ছয় পুত্র বধে তার কালি নাগিনি
তমু মন্দ বলে চাঁদো দুরাচার বাণী।
আশ্বিনে চণ্ডিকা-পূজা করে সর্ব লোক
হতো দুঃখী জন আদি আনন্দ কৌতুক।

বিমুখ হইয়া নাহি দেয় ফুল-পানি
ইন্দ্রের সভায় তোমা হর্‍্যা গিয়া আনি।
কার্তিকে হিমন্ত রিতু উত্তর পবন
শিয়রে বসিয়া তাঁরে কহিনু সপন।

সপনে কহিয়া চাঁদো পাঠানু পাটনে
কালিদহে দেখাইনু মহানাগগণে।
অগ্রহায়ণ মাসে চাঁদো পাটনে প্রবেশে
মায়ামোহে বন্দী করি থুইনু সেই দেশে।

মিত্র-ভোলে মোর নিন্দা পাসরে তথাই
দ্বাদশ বৎসর অপমান নাহি পাই।
শীতেতে কম্পিত লোকে পৌষে নিবসে
চাঁদোর সিয়রে বসি কহি উপদেশে।

কালাদহে ডুবাইনু সপ্ত মধুকরে
নানা দুঃখ দিয়া চাঁদো আনিনু দেশেরে।
মাঘ মাসে মাসি রূপে কৈনু অনুবন্ধ
চাঁদোরে বুঝায়ে তোমা করিনু সম্বন্ধ।
ছলিল তোমারে আমি মুকুতা সহরে
লোহার কলাই সিজাইয়া দিলা তোরে।
প্রথম বসন্ত রিতু প্রবেশে ফাগুণ
সদাই চাঁদোর মত সহিব নিন্দন।
মোরে অহংকার করি বাঁধে লহু-ঘর
হেন মন করে চাঁদো বধি প্রাণেশ্বর।
চৈত্র মাসে হর-পূজা করে সর্ব লোকে
মোর নাম জেই লয় তারে নাহি দেখে।
প্রথম বৈশাখে তোমা বিভা করাইল
লোহার বাসরে কালি লখাই দংশিল।
বেহুলা জুড়িয়া কর বলে সবিনয়
প্রভু জীয়াইয়া দেবী পাঠাও আমায়।

'সীতার বারমাসী'

সৌরভ পত্রিকা [বিংশ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা,
ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৪০]
কেদারনাথ মজুমদার প্রবর্ত্তিত—

সাত পাঁচ সখী বইসা গো জোড়-মন্দির ঘরে।
এক সখী কহে কথা গো জিজ্ঞাসে সীতারে॥
তুমি যে গেছলা গো সীতা এই বনবাসে।
কোন্ কোন্ দুঃখ পাইয়াছিলা গো কোন্ কোন্ মাসে॥
আমার দুঃখের কথা গো কহিতে কাহিনী।
কহিতে কহিতে গো উঠে জলন্ত আগুনী॥
জনম-দুঃখিনী সীতা গো দুঃখে গেল কাল।
রামের মত পতি পাইয়া গো দুঃখেরি কপাল॥

এ কত দিনের কথা শুন সখীগণ।

*　　　*　　　*

বৈশাখ মাসেতে দিন রে অরণ্য প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভু রামের গো সন্ন্যাসীর বেশ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিন রে রবির বড় জ্বালা।
হাটিয়া যাইতে প্রভুর গো বদন হইল কালা॥
পাষাণে ঠেকিল পদ গো রক্ত পড়ে ধারে।
দুঃখিত হইয়া প্রভো গো সীতার অঙ্গে বাতাস করে॥
পদ্ম পত্রে জল আনে গো ঠাকুর লক্ষ্মণ
কতক্ষণ প্রভুর কোলে গো ছিলাম অচেতন॥
...　　　...　　　...　ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের সীতার বারমাস্যা

রাবণবধের পর অযোধ্যাগত সীতা উর্মিলার অনুরোধে বারমাসের বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন।—

আইল বৈশাখ মাস রবির কিরণ।
খর তেজে পোড়ে পদ হিঙ্গুল বরণ॥
ভাদরে উদর জ্বালা সহিতে না পারি।
দিন গেলে মিলে রামে ফল দুই চারি॥
সেই ফল মূল মোরা করিতাভ ভক্ষণ।
উপবাসে থাকিতেন দেওর লক্ষ্মণ॥
আইল ফাগুন মাস বসন্তের বায়।
ক্ষণে ক্ষণে সীতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়॥
অশোকের বন নহে শোকের কানন।
অভাগী সীতার কেনে না হয় মরণ॥
...　　　...　　　...　ইত্যাদি

মলুয়ার অষ্টমাসী

ময়মনসিং-গীতিকা

আষাঢ় মাস হীরাধরের আশার আশে যায়।
বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করি উপায়॥
শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঢ়ি হইছে॥
ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা॥
আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে।
এও মাস গেল বাপের পূজার আন্দেসে॥
কার্ত্তিক মাসেতে পাইব কার্ত্তিক সমান বর।
মন নাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর॥
আগণ মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা॥
পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ॥
মাঘ মাসে করমি আইল হীরাধরের বাড়ী।
একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি॥

হোলিআ বারমাসী

পল্লীগীতি-সঞ্চয়ন
—কুঞ্জবিহারী দাস

আত্থ মার্গশির মাস হোইলা প্রবেশ
পিতাসত্য পালি রাম গলে বনবাস
শিশির সময় বস্ত্র ভূষণহিঁ নাহিঁ
বহুত কষণ বনে পাইলে বেণি ভাই
কি পরি রহিবে রাম লক্ষ্মণ যোগীন্দ্র
কৌশল্যা কান্দই হো।

পৌষ মাসে হেম জাড় দেহ শুখি যাই
কেমন্তে রহিবে বনে বেণি জাই
বৃক্ষমূলে আশ্রম করিবে তিনি জণ
বৃক্ষর বকল আনি হোইবে ভূষণ
কি কষ্ট ন দেলু কৈকেয়ী মো রঙ্কুণীর ধন।
মাঘ মাসে শিশির, হুঅই অধিক
কেণে ছাড়িগল মোর রঙ্কুণীর ধনলোক
মকর উৎসব মহাপুণ্য সে বনর
স্নাহান করন্তে রাম গঙ্গারে মোহর
কি দণ্ড বিহিলু মরে বিধাতা পেশিলু বনর।
ফাল্গুণ মাসরে ফগু খেলন্তি ঘরে ঘরে
এমান ছাড়িণ রাম বুলিলে বনরে
অর্ঘ্যর চন্দন দেহে ন হোই লেপন
এমান ছাড়িণ রাম বিভূতি ভূষণ
শিরে জটা বান্ধি বীর লক্ষ্মণ চলিলে ঘোরবণ হো।
নিষ্ঠুর করই দেহ কহিলি যা সত
শরীরু অনর্গল বহুযাই ঝাল
বৃক্ষমূলে বসিথিবে মোর বেণিবাল
বৃক্ষপত্র শয্যা করি যোগীন্দ্র কাটুথিবে কাল হো।
বইশাখ মাসরে খরা বহুত কাটই
ঝংজা বতাস পবন নিরন্তরে বহি
বনস্তকু পশি ফলমূল যে আণিব
করিণ একান্তে তিনি জন যে ভুঞ্জিব
বহু বন আণিণ জানকী-তৃষা নিবারিব হো।
জেষ্ঠে বনকু গলা মো জেষ্ঠ নন্দন
সঙ্গতে ঘেণিণ পুণি জানকী লক্ষ্মণ
নানা পক্বফল বহু করিবে চয়ন
মৃগভার বোহি বহু আসিলে লক্ষ্মণ
বনবাস কষ্টবিহি বিহিলা ভগারি হেলা পুণ হো।

আষাঢ় মাসরে গরজই মেঘ
যেমনে রাব দিঅন্তি বনরে বনবাঘ
দশ দিশ ন দিশই অন্ধকার মহী
বৃক্ষমূলে কুটী করিথিবে বেণিভাই
পত্রশয্যা করি দিন কাটিবে নিরতে উদা ভূঁই হো।
শ্রাবণ মাসরে জল বরষে অনুক্ষণ
জীব জন্তুমানে বসা লোড়ুথান্তি পুণ
ঘর ঘাটি নাহিঁ কহিঁ রহিবে পুত্র মোর
অন্ন বিহনে আয়ুষ হানি হোইব তাঙ্কর
কিপরি বনরু ফল আণিবে করিবে আহার হো।
ভাদ্রব মাস যে পুণি হোইলা পরবেশ
সুনির্মল দিশই আকাশ দশদিশ
অতি সুকুমারী জনক দুহিতা
বনবাস কষ্ট আণি দেলুরে বিধাতা
কি দণ্ড বিহিলু পরে বিধাতা আণিণ কান্তে কান্তা হো।
আশ্বিন মাসরে হুএ পুআঁরিআ জহ্ন
একাকরি ছাড়িগলু মো রঙ্কুণির ধন
নানা কউতুকরে সে রাহাস করুথান্তা
বনবাস কষ্ট আণি দেলুরে বিধাতা
এতে বোলি রাণী কান্দই করিণ পুত্র চিন্তা হো।
কার্তিক মাস যে পুণি হোইলা বারমাস
বনবাস ভোগ কলে রঘুকুল ঈশ
শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গতে ঘেণিণ
কইবর্ত দয়ানিধি করই রঞ্জন
ক্ষিতিরে কর প্রসারি তো পাদে রহু মন হো।*

---

* এগুলিরও কোন কোনটির কিছু কিছু সাহিত্য-সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয়।

(চ) পুজা বা অর্ঘ্যমূলক বারমাস্যা

দোলি বারমাসী

পল্লীগীতি-সঞ্চয়ন, পৃঃ ১৯৫
—কুঞ্জবিহারী দাস

আন্ত মার্গশিরে মাস,
নিকুঞ্জ বনরে কুঞ্জ বিহারী লো
মাতিছন্তি দোলি রস।

পৌষ মাসে ধমু মুআঁ,
মচ মচ ডাকে দোলি দউড়ি লো
পটাপরে হেলে ঠিআ।

মাঘ মাস বরকোলি
রাধা মাধবত খেলন্তি দোলি
সখীএ মারন্তি তালি।

ফগুণে ফগু চাচেলি
বৃন্দাবণে লাগিঅছি কচেরী
পিচকারি মরামরি।

চৈত্র মাসে আম্ব কষি
বজান্তে মোহন মোহন বংশী
মোহিত বরজবাসী।

বৈশাখে খরা তাতি
দোলি ঝুলণকু চান্দিনী রাতি
চূআ চন্দনরে মাতি।

জ্যেষ্ঠ মাসে গীরিষ্ম
সে মাসে শেষরে রজ মউজলো
দোলি খেলে ঘণশ্যাম।

আষাঢ়ে রথ যাতরা
দোলি খেলি সারি চড়িলে দোলি
যশোদা দুঃখ পাশোরা।

শ্রাবণে ঝুলণ কুঞ্জে
রাইমণি নীল-মণি রতন লো
অষ্টসখী মধ্যে বিজে।

ভাদ্রবরে ভাবগ্রাহী
ভাই বলরাম সঙ্গতে নেই
কদম্বে দোলন্তি যাই।

আশ্বিনে কুআঁরী চান্দ
জল নিরিমল ফুটে কমল
দোলি খেলে আদি কন্দ।

কার্ত্তিকে আকাশ দীপ
জালি দিএ সবু মনর পাপ
ন বাধে শোক সন্তাপ।

পদ্মতোলা বারমাসী

(পটিআ, কটক)

পঃ গীঃ সঃ, পৃঃ ৫৯৩

আত্ত যে মগুশির বহিলা শিশির কংসর ছএল
রাধার তনু জরজর কি গোবিন্দ হরি।
পুষে যে নারায়ণ হোইলে অভিষেক
বৃষে বা নন্দিনী কি ঘেনি

রামর অভিষেক দেখিলে নগ্রলোক
ব্রহ্মা করিলে যজ্ঞধ্বনি
কি গোবিন্দ হরি।
মাঘরে মাধব পুরুণা মাধব বিষ উড়াই দেল হরি
ধুলিআ নাগ মারি দূরকু দেল যে ঘউড়ি
কি গোবিন্দ হরি।
... ... ইত্যাদি

বারমাসী

ফগুণে গোবিন্দ ব্রাহ্মণ স্বর্গ ধরি
বলি কি চাপিলে পাতালে
কি গোবিন্দ হরি।
চইত্রে শিরীধর অন্ধকু দেলে চক্ষুদান
কি গোবিন্দ হরি।
বৈশাখে চন্দন ত্রাহি করিবে জনার্দন
কি গোবিন্দ হরি।
জেষ্ঠে বলিয়ার গ্রীষ্ম শীতল লোড়স্তি ভগবান
কি গোবিন্দ হরি।
আষাঢ়ে গুণ্ডিচা জাত বিজয়ে তিনি রথ
সংগতে বলরাম ভাই গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা
আগরে বলভদ্র ভউনী সুভদ্রা তা পছে
হটিআ কহ্লাই
কি গোবিন্দ হরি।
শ্রাবণে গিরিধারী রত্ন কঠাউ মাড়ি কপালে শোহে পদ্মচিতা
কি গোবিন্দ হরি।
ভাদবরী মাসে প্রভুঙ্ক জনম পুতনা প্রাণে কলহত
কি গোবিন্দ হরি।
আশিন মাস হোইলে ফুল বেশ কি গোবিন্দ হরি
কার্ত্তিক বারমাসী কাথরে কুম্ভ ধরি রাধিকা হইলে প্রবেশ
কি গোবিন্দ হরি।

(পটিআ, কটক)
পঃ গীঃ সঃ

বারমাসী-অর্ঘ্যপ্রদান

—রামাই পণ্ডিত

কোন্ মাসে কোন্ রাশি।
চৈত্র মাসে মীন রাশি॥
হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিত্য॥

হাতপাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি।
সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কম্নি॥
গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি।
সন্ন্যাসী গতি যাইতি গাএন বাএন তুআরী তুয়ার পাল।
ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবে সুখ মুকতি।
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার।
দাতা দানপতির বিঘ্ন যাব নাশ॥

কোন্ মাসে কোন্ রাশি।
বৈশাখ মাসে মেষ রাশি॥
হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্য॥
হাত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানী।
সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কম্নি॥
গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি সংস্থর ভোক্তা আমনি।
সন্ন্যাসী গতি যাইতি গাএন বাএন তুআরী তুআর পাল।
ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি।
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার।
দাতা দানপতির বিঘ্ন যাব নাশ॥

কোন্ মাসে কোন্ রাশি।
বৈশাখ গেলে জৈঠ মাস বৃষ রাশি॥
হে হরিহর বার ভাই বার আদিত্য॥
হাত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প-পানী।
সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কম্নি॥
গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি।
সন্ন্যাসী গতি যাইতি গাএন বাএন তুয়ারী তুয়ার পাল।
ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি।
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার।
দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাশ॥

... ... ইত্যাদি।

(ছ) মিলনমূলক

সুশীলার বারমাসী

—ভবানীশঙ্কর দাস

চণ্ডীমঙ্গল

অগ্রাণেতে নাগেশ্বর কাল উপস্থিত।
হেন সমে যাইতে বল নহে যে উচিত॥
আনন্দেতে নানা রস করহ অশন।
বিচিত্র পালঙ্কোপরে করহ শয়ন॥
শুন শুন প্রাণনাথ না যাও দেশেতে।
আমারে লইয়া আনন্দে বঞ্চহ সিংহলেতে॥
মাঘ মাসে তেন রূপ হিমের সঞ্চার।
না পারিবা প্রাণনাথ দেশে যাইবার॥
আমা সঙ্গে সুখে প্রভু বঞ্চহ রজনী।
আজ্ঞা কর আনি এথা তোমার জননী॥
ফাল্গুনেতে হরির উৎসব সবে করে।
নানা রঙ্গ করে লোকে প্রতি ঘরে ঘরে॥
আবির খেলাও প্রভু আমার সঙ্গতি।
কি কারণে যাইবারে চাহ প্রাণপতি॥
মধুমাসে মনসিজ-সখা উপস্থিত।
পিক সর্ব্বে নাদ করে অতি সুললিত॥
বৈশাখেতে নানা পুষ্প ফুটে ডালে ডালে।
গ্রথিয়া মোহন মালা দিব তোমার গলে॥
নিত্য বাত করিলাম লইয়া চামর।
নিজ রাজ্যে না যাইও শুন প্রাণেশ্বর॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে লোকচক্ষুর আতপ অত্যন্ত।
গন্ধ লেপি দিব অঙ্গে শুন প্রাণকান্ত॥
শাশুড়ীরে আনাইব এই সিংহলেতে।
এথাতে বঞ্চহ প্রভু কি কার্য্য দেশেতে॥

আষাঢ়েতে বর্ষাকাল হয় উপস্থিত।
হেন সমে যাইতে দেশে না হয় উচিত ॥
রাজ-ভোগ দ্রব্য প্রভু করহ ভোজন।
খট্টার উপরে নাথ করহ শয়ন ॥
শ্রাবণেতে নিত্য নিত্য মেঘে করে ঝড়।
দেশে যাইতে উচিত না হয় প্রাণেশ্বর ॥
আমি চাতকিনী-নারীর জন্মিছে পিপাসা।
কাদম্বিনী রূপে মোর পূর্ণ কর আশা ॥
ভাদ্র মাসে হেথা থাকি কর নানা রঙ্গ।
সুখের সময়ে সুখ কেন কর ভঙ্গ ॥
আশ্বিনেতে আনন্দে ভবানী কর পূজা।
মশানেতে তোমারে রক্ষা কৈলেন দশভুজা ॥
তাহান উৎসব কর আনন্দিত মনে।
চিন্তা না করিও কান্ত রাজ্যের কারণে ॥
শিখীশ্বর মাসে সুখে বঞ্চ প্রাণকান্ত।
দাসী প্রায় তুয়া পদ সেবিব নিতান্ত ॥
আমি বহি জনকের পুত্র নাহি আর।
তোমারে করিবে নৃপ সিংহলাধিকার ॥
যোষা বাক্য শুনি সাধু দিলেক উত্তর।
চণ্ডিকা ভাবিয়া গায় দাস শ্রীশঙ্কর ॥

সুশীলার বারমাসী

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

চণ্ডীকাব্য

বৈশাখ বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহি সয় ॥
চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি।
সামলী গামছা দিব সুগন্ধী কস্তুরী ॥

পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া দ্বিজের পূরাও অভিলাষ॥
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
শীতল চন্দন দিব চামরের বায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পূরিলে উদর নাথ পাকা আম্ররসে॥
আকাশে গর্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নবজলে মদমত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর।
শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥
আষাঢ় সুখের হেতু আষাঢ় সুখের হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥
সঙ্কট সময় বড় ধারাধর শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ॥
জলধারা বরষিয়ে আট দিগে ধায়।
বিনোদ-মন্দিরে থাক না চলিহ নায়॥
পূরিব অভিলাষ পূরিব অভিলাষ॥
মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একবার আট দিগে জল॥
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি।
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী॥
মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস।
আর না করিহ প্রভু উজাবনী আশ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিবে হরিষে।
যোড়শোপচারে অজা গাড়র মহিষে॥

তত ধন দিব আমি যত দেহ দান।
সিংহলের লোকে যত করিবে সম্মান॥
আমি কহিয়া রাজায় আমি কহিয়া রাজায়।
আনাইব তোমার জননী সৎমায়॥
বৃষ্টি টুটিয়া আইল কাতিক মাসে।
দিবসে দিবসে হয় হিম পরকাশে॥

তুলি পাটনেত করাইব নিয়োজিত।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত॥
পুণ্য কার্তিক মাস পুণ্য কার্তিক মাস॥
দান দিয়া পূরিহ দ্বিজের অভিলাষ॥
সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে।
ধান চালু মুগ মাষ পূরিব আওয়াসে॥

রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার॥
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার যার নাহি চাস॥

পৌষ তুলি পাতি তৈল তাম্বূল তপনে।
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥
শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধুপান আদি উপহারে॥

সুখে গোঙাইবে হিম সুখে গোঙাইবে হিম।
উজ্জাবনী নগর বাসিবে যেন নিম॥
মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করে স্নান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥

মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন॥
মাঘ ঋতু কুতূহলে মাঘ ঋতু কুতূহলে।
শীতল যোগাব আমি বিহান বিকালে॥

ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোল-মঞ্চ আমি বাঁধিব রচনে ॥
হরিদ্রা কুমকুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
আগু দোল করিয়া গাওয়াব নিত নিত ॥
সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত ॥
মধু মাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মধুকর মালতীর পীয়ে মকরন্দ ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে ॥
মোহন মধু মাসে মোহন মধু মাসে।
সুখের মন্দিরে থাক না যাইহ বাসে ॥
সুশীলার অভিলাষ শুনি সদাগর।
হেট মুখ করি তারে দিলেন উত্তর ॥
সর্ব্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।
বারমাস্যা গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জায়সী গ্রন্থাবলী

—রামচন্দ্র শুক্ল-সম্পাদিত

ষড়-ঋতু-বর্ণন-খণ্ড

(নায়ক রত্নসেন ও নায়িকা পদ্মাবতীর সুখভোগ)

প্রথম বসন্ত নবল ঋতু আই। সুঋতু চৈত বৈশাখ সোহাই ॥
চন্দন চীর পহিরি ধরি অংগা। সেন্দুর দীন্হ বিহঁসি ভরি মংগা ॥
কুসুম হার ঔর পরিমল বাসূ। মলয়াগিরি ছিরকা কবিলাসূ ॥
সৌর সুপেতী ফূলন ডাসী। ধনি ঔ কন্ত মিলে সুখবাসী ॥
পিউ সংজোগ ধনি জোবন বারী। ভৌঁর পুহুপ সংগ করহিঁ ধমারী ॥
হোই ফাগ ভলি চাঁচরি জোরী। বিরহ জরাই দীন্হ জস হোরী ॥
ধনি সসি সরিস, তপৈ পিয় সূরূ। নখত সিংগার হোহিঁ সব চূরূ ॥

জিন্হ ঘর কন্তা ঋতু ভলী, আব বসন্ত জো নিত্ত।
সুখ ভরি আবহিঁ দেবহরৈ, দুঃখ ন জানৈ কিত্ত॥
ঋতু গ্রীষ্ম কৈ তপনি ন তহঁা। জেঠ অসাঢ় কন্ত ঘর জহঁা॥
পহিরি সুরঙ্গ চীর ধনি ঝীণা। পরিমল মেদ রহা তন ভীনা॥
পদমাবতি তন সিঅর সুবাসা। নৈহর রাজ, কন্ত-ঘর পাসা॥
ঔ বড় জূড় তহঁা সোবনারা। অগর পোতি, সুখ তনে ওহারা॥
সেজ বিছাবন সেঁার সুপেতী। ভোগ বিলাস কহিঁর সুখ সেঁতী॥
অধর তমোর কপুর ভিমসেনা। চন্দন চরচি লাব তন বেনা॥
ভা আনন্দ সিংঘল সব কহূঁ। ভাগবন্ত কহঁ সুখ ঋতু ছহূঁ॥
দারিউ দাখ লেহিঁ রস, আম সদাফর ডার।
হরিয়র তন সুঅটা কর জো অস চাখন হার॥
রিতু পাবস বরসৈ, পিউ পাবা। সাবন ভাদেঁা অধিক সোহাবা॥
পদমাবতি চাহত ঋতু পাঈ। গগন সোহাবন, ভূমি সোহাঈ॥
কোকিল বৈন, পাঁতি বগ ছূটী। ধনি নিসরঁা জনু বীর বহূটী॥
চমক বীজু, বরসৈ জল সোনা। দাদুর মোর সবদ সুটি লোনা॥
রঙ্গ-রাতী পীতম সঙ্গ জাগী। গরজে গগন চৌকি গর লাগী॥
সীতল বুঁদ, উচ চৌপারা। হরিয়র সব দেখাই সংসারা॥
হরিয়র ভূভি, কুসুম্ভী চোলা। ঔধনি পিউ সংগ রচা হিণ্ডোলা॥
পবন ঝকোরে হোই হরষ, লাগে সীতল বাস।
ধনি জানৈ যহ পবন হৈ, পবন সো অপনে আস॥
আই সরদ ঋতু অধিক পিয়ারী। আসিন কাতিক ঋতু উজিয়ারী॥
পদমাবতি ভই পূনিউ-কলা। চৌদসি চাঁদ উঈ সিংঘলা॥
সোরহ কলা সিংগার বনাবা। নখত-ভরা সুরুজ সসি পাবা॥
ভা নিরমল সব ধরতি অকাসূ। সেজ সঁবারি কীন্হ ফুল-বাসূ॥
সেত বিছাবন ঔ উজিয়ারী। হঁসি হঁসি মিলহিঁ পুরুষ ঔ নারী॥
সোন-ফূল ভই পুহুমী ফূলী। পিয় ধনি সোঁ, ধনি পিয় সোঁভূলি॥
চখ অংজন দেই খংজন দেখাবা। হোই সারস জোরী রস পাবা॥
এহি ঋতু কন্তা পাস জেহি, সুখ তেহি কে হিয় মাহঁ।
ধনি হঁসি লাগৈ পিউ গরৈ, ধনি-গর পিউ কৈ বাহঁ॥

ঋতু হেমন্ত সঙ্গ পিএউ পিয়ালা। অগহন পুস সীত সুখ-কালা॥
ধনি ঔ পিউ মহঁ সীউ সোহাগা। দুহুঁনহ অংগ একৈ মিলি লাগা॥
মন সৌঁ মন, তন সৌঁ তন গহা। হিয় সৌঁ হিয়, বিচহার ন রহা॥
জানহুঁ চন্দন লাগেউ অংগা। চন্দন রহৈ ন পাবৈ সংগা॥
ভোগ করহিঁ সুখ রাজারাণী। উন্হ লেখে সব সিষ্টি জুড়ানী॥
জূঝ দুবৌ জোবন সৌঁ লাগা। বিচহুঁত সীউ জীউ লেই ভাগা॥
দুই ঘট মিলি একৈ হোই জাহীঁ। ঐস মিলহিঁ, তবহুঁ ন অঘাহীঁ॥
হংসা কেলি করহিঁ জিমি, খূঁদহিঁ কুরলহিঁ দোউ।
সীউ পুকারি কৈ পার ভা, জস চকই ক বিছোউ॥
আই সিসির ঋতু, তহাঁ ন সীউ। জহাঁ মাঘ ফাগুণ ঘর পীউ॥
সৌর সুপেতী মন্দির রাতী। দগল চীর পহিরহিঁ বহু ভাঁতী॥
ঘর ঘর সিংঘল হোই মুখ জোজু। রহা ন কতহুঁ দুঃখ কর খোজু॥
জহঁ ধনি পুরুষ সীউ নহিঁ লাগা। জানহুঁ কাগ দেখি সর ভাগা॥
জাই ইন্দ্র সৌঁ কীন্হ পুকারা। হৌঁ পদমাবতি দেস নিসারা॥
এহি ঋতু সদা সঙ্গ মহঁ সেবা। অব দরসন তেঁ মোর বিছোবা॥
অব হসি কৈ সসি সূরহি ভেঁটা। রহা জো সীউ বীচ সো মেটা॥
ভএউ ইন্দ্র কর আয়সু বড় সতাব যহ সোই।
কবহুঁ কাহু কে পার ভই কবহুঁ কাহু কে হোই॥

অনুবাদ :—

প্রথম এলো বসন্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বড়ই মধুর লাগছে এই ঋতুটি। রমণীর পরিধানে চন্দনবর্ণের শাড়ী, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, চারিদিক গন্ধে আমোদিত। শয্যা পুষ্প-আস্তীর্ণ। রমণী ও কান্ত শয়নগৃহে মিলিত হ'ল। এদিকে নায়িকার যৌবন-উদ্যানে প্রিয়তমের আগমন, অন্য দিকে ফুলে ফুলে ভ্রমরের মধুপান। রমণী যেন চাঁদ, আর তার প্রিয় যেন সূর্য। সূর্যের সান্নিধ্যে চাঁদের প্রসাধনরূপী নক্ষত্র সব অন্তর্হিত হ'ল। যে গৃহে কান্ত, সেই ঘরেই বসন্ত।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গরমও কষ্টকর বোধ হয় না, যদি প্রিয় ঘরে বিরাজ করে। এই সময়ে রমণীরা লাল রঙের কাপড় পরে। তাদের দেহ পরিমলে সুবাসিত থাকে। পদ্মাবতীরও শরীর ছিল শীতল ও সুবাসিত। তাম্বূল ও ভীমসেনী

কর্পূরে তার অধর ছিল লাল। দেহে চন্দন লাগিয়ে শীতল বিলাসগৃহে শুভ্র শয্যার উপরে সে দিনরাত পতির সঙ্গে বিলাসে রত ছিল।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাস অধিকতর মধুর বলে বোধ হয়, যদি প্রিয় কাছে থাকে। কোকিলের ডাক শোনা যায়, মেঘের কোলে কোলে শ্রেণীবদ্ধ বকেরা উড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পৃথিবীতে যেন সোনা বর্ষিত হচ্ছে। ব্যাঙ ও ময়ূরের ডাক শোনা যাচ্ছে। প্রিয়ের সাহচর্যে প্রেমরসে নিমগ্ন রমণী গভীর রাতে আকস্মিক মেঘগর্জনে চমকে প্রিয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করে। পৃথিবী শ্যামল সবুজরূপ ধারণ করেছে। রমণীও ফুলের সজ্জা পরিধান ক'রে প্রিয়ের সঙ্গে দোলনা তৈরী করছে।

আশ্বিন-কার্তিকের উজ্জ্বল আলোয় শরৎ ঋতুকে বড়ই মধুর লাগছে। পদ্মাবতীর মুখে পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য। ধরিত্রী থেকে আকাশ পর্যন্ত সব নির্মল হয়ে গেছে। শয্যা রচনা করে তার উপরে ফুলের চাদর বিছানো হয়েছে। উজ্জ্বল মধুর রাতে শুভ্র শয্যায় স্ত্রী ও পুরুষ হেসে হেসে মিলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবী বুঝি সোনার ফুলে ভরা। প্রিয়া ও প্রিয়তম পরস্পরের ভালোবাসায় আত্মবিস্মৃত। এই ঋতুতে যে নারীর পতি নিকটে, সেই সুখী।

অগ্রহায়ণ-পৌষ এলো। কিন্তু যে রমণীর গৃহে প্রিয়তম রয়েছে, তার শীত কোথায়? নর-নারীর মনে মন এবং দেহে দেহ নিরত। তাঁদের পক্ষে যেন সমস্ত পৃথিবী ভরেই মিলনসেতু রচিত হয়েছে। পরস্পরের যৌবনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। উভয়ের মধ্যে পড়ে শীত বেচারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। যেমন সরোবরে হাঁসের জুড়ি খেলা করে, তেমনিভাবে খেলা করছে রাজা-রাণী।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রিয়ের সান্নিধ্যে শীত আর লাগছে না। এখন শীতও যেন আরামপ্রদ। পতিপত্নী রাতদিন লেপের অভ্যন্তরে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। যেখানে বালা এবং তার প্রিয় একত্র আছে, সেখানে শীত লাগে না। শীত গিয়ে ইন্দ্রের কাছে নালিশ করলে যে, পদ্মাবতী আমাকে তার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঋতুতে আমি বরাবর তার সঙ্গে শয়ন করতাম, কিন্তু এখন আমাকে দেখা মাত্রই তাড়িয়ে দেয়। ইন্দ্র উত্তর দিলেন—"কখনও একের প্রভুত্ব হয়, কখনও অন্যের—এই তো রীতি।"

রাজস্থানী-বারমাস্যা

"ঢোলা মারুরা দোহা"

লেখক—অজ্ঞাত

রচনাকাল-পঞ্চদশ শতাব্দী

গ্রীষ্ম

থল তত্তা লূ সাঁমুহী, দাঝোলা পহিয়াছ।
ম্হাঁকউ কহিয়উ জউ করউ ঘরি বইঠা রহিয়াহ॥

বর্ষা

জিণ রুতি বগ পাওস লিয়ই ধরণি ন মেলহই পাই।
তিণ রুতি সাহিব বল্লহা কোই দিসাওর জাই॥

শীত

সীয়ালই তউ সী পড়ই, উন্হালই লূ বাই।
বরসালই ভুঁই চীকণী, চালণ রুত্তি ন কাই॥

বসন্ত

আরী সর রস আঁমলী, ত্রিয়া করই সিণাগার।
জিকা হিয়া ন ফাটহী, দূর গয়া ভরত্তার॥*

ভাবানুবাদ :—

গ্রীষ্ম

স্থলভাগ তপ্ত হয়ে আছে; সামনে 'লূ' বইছে; হে পথিক, তুমি (যদি মারুর দেশে এই ঋতুতে যাও তো) দগ্ধ হয়ে যাবে। আমি যা বলছি, তাই করো, ঘরে বসে থাকো।

বর্ষা

যে ঋতুতে বৃষ্টির জন্যে বকগুলোও পৃথিবীর উপর পা রাখতে চায় না, হে প্রিয় স্বামী, সেই ঋতুতে কেউ কোথাও পা বাড়ায়?

শীত

গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া চলে, বর্ষাকালে পথ কর্দমাক্ত হয়, শীতকালে তো প্রবল শীত পড়ে; সুতরাং হে প্রিয়, কোন ঋতুই তোমার যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

[এই চারিটি ঋতুর বর্ণনাই আছে।]
এ ধারার মধ্যেও সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের পরিচয় নগণ্য নয়।

বসন্ত

সেই মধুর কাল এসেছে, যখন স্ত্রীলোকেরা শৃঙ্গারে ব্যস্ত থাকে। এই সময়ে যার স্বামী দূর দেশে চলে যায়, তার হৃদয় কি বিদীর্ণ হয় না ?

(জ) বিরহমূলক

সিংহভূপতির চাতুর্মাস্য

—পদকল্পতরু

মোর বন বন শোর শুনত বাঢ়ত মনমথ-পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল অবহুঁ গগন গম্ভীর ॥
দিবস রয়না আ-রি সখি কৈছে মোহন বিনে যাওয়ে ॥
আওয়ে শাওন বরিখে ভাওন ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর-শর ছুটত রে কৈছে জীয়ে বিরহিণী নারি ॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো কাকো কহি ইহ দুখ।
নিভরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি ছুটয়ে মদন-কন্দুক ॥
ছুহ আশিন গগন ভাখিণ ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন চতুর মাসকি বোল ॥

বিরহ—চাতুর্মাস্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরয়ে ॥
পাখীজাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথা।
মোর প্রাণ নাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিব রে বরিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাশ ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥

কত না সহিব রে কুসুম শরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্নু সমে কর মেলা॥
ভাদর মাসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবে কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

গৌরাঙ্গ বারমাসী

চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালকবৃদ্ধ যুবা॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত গুঞ্জরে মধুপে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাব কিরূপে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥
বৈশাখে চম্পক লতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা॥

কুমকুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন্ ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু পদাম্বুজ রাতা ॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশি দিন।
ছট ফট করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ-হিয়া।
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাতুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি কিছু কর অবধান ॥

ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা ॥

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত-সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে॥
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল বহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লেহ নিজ-পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা

চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্মদিনে।
উদ্বর্ত্তন তৈল স্নান কর গৃহাঙ্গণে॥
পিষ্টক পায়স পুষ্প ধূপদীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে॥
তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল্য-বৃদ্ধ-যুবা॥
চৈত্র চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে।
শুনিঞা জে প্রাণ করে তা কইব কাকে॥
প্রচণ্ড উদ্ভট বাত তপ্ত সিকতা।
কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাদাম্বুজ রাতা॥
গৌরাঙ্গ প্রভু তোমার নিদারুণ হিয়া।
গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া॥
বৈশাখ চম্পক মালা নূতন গামছা।
দিব্য-ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁছা॥
চন্দনচর্চিত অঙ্গ সরু পৈতা কান্ধে।
রূপ দেখিঞা কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে॥
ও গৌরাঙ্গ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্রে।
তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ সমুদ্রে॥
বসন্তে কোকিল পক্ষ ডাকে কুহু কুহু।
তোমা না দেখিঞা মূর্চ্ছা জাই মুহুর্মুহু॥
চুতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে।
তুমি দূর দেশে আমি জুড়ায় কার কোল॥
মোরে না যাইয় ভাণ্ডিঞা।
মনের পোড়ানি কারে কহিব ভাঙ্গিঞা॥

জ্যৈষ্ঠমাসে সুবাসিত জলে স্নান করাইব।
দিব্য ধৌত সরু বস্ত্র অঙ্গে পরাইব ॥
গঙ্গাজল চামরে চৌদিকে দিব বা।
হৃদয়ে তুলিঞা থুব দুখানি রাঙ্গা পা ॥
আমি কি বলিতে জানি।
বিশাল কাণ্ডেতে জেন বিকল হরিণী ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাতুরীর নাদ।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ ॥
মেঘের শব্দ শুনি ময়ূরের নাট।
কেমনে বঞ্চিব আমি নদী আর বাট ॥
মোরে সঙ্গে লয়ে জাএ
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাএ ॥
শ্রাবণে সলিল-ধারা ঘনে বিদ্যুলতা।
কেমনে বঞ্চিব আমি রহিব আর কোথা ॥
লক্ষ্মীবিলাস গৃহে পালঙ্কী শয়নে।
সে সব চিন্তিতে আমি না জীব শ্রাবণে ॥
প্রভু তুমি বড় দয়াবান্।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥
ভাদ্রে ভাস্বর তাপ সহনে না জাএ।
কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগাএ ॥

জার প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি থাকে ঘরে।
প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত শিরে ॥

বিষম ভাদ্রের খরা।
জীয়ন্তেই মরা প্রাণনাথ নাহি জারা ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দিত মহি।
কান্ত বিনু সেই দুঃখ কার প্রাণে সহি ॥
শরত সমএ শোভা নদীআ নগরী।
গৌরচন্দ্র রমণী তারকা সারি সারি ॥

মোরে কহ উপদেশ।
জথা তথা থাক প্রভু করিহ উদ্দেশ॥
কাৰ্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয় বা।
করঙ্ক কৌপীনে কত আচ্ছাদিবে গা॥
কত পুণ্য করিয়া হইলা গো তোমার দাসী।
ইবে অভাগিনী হব হেন প্রায় বাসি॥
তুমি সর্বভূতে অন্তর্যামী।
তোমার সম্মুখে আমি কি বলিতে জানি॥
হেমন্ত নূতন ধান্য জগত প্রকাশে।
সর্বসুখময় গৃহ কি কার্য সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোট শ্বেত সকলাত কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতলে॥
তুমি সর্বজীব অধিকারী।
কত সুখ বিনোদ হঞা দণ্ডধারী॥
পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে শীত তিলেক না থাকে॥
তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জ্বলে পাশে।
নানা সুখ আমোদ করহ গৃহবাসে॥
পৌষে প্রবাস শীত তোমার না সহে।
কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাস ধর্ম নহে॥
মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খায়।
শ্রীভাগবত পঢ় আর শিষ্যের পঢ়ায়॥
বলি বৈশ্য শ্রাদ্ধ কর ভূদেব আচার।
পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার॥
বিষম মাঘ মাসের শীতে।
কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিতে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী জত কৈল নিবেদন।
দৃকপাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ॥

গোপিকার বারমাসী

—ভাগবত, নরসিংহদাস।

কহিয় কানুরে হংস কহিয় কানুরে।
অভাগিনী গোপী তার মনে নাহি স্মরে॥
শুন হংসবর তোরে করি নিবেদন।
বার মাসের সুখ দুঃখ করহ শ্রবণ॥
পাইল অগ্রাণ মাসে নবীন পীরিতি।
কাত্যায়নী ব্রত করি পাইল কৃষ্ণপতি॥
একে একে গোপীগণ বন্দিল চরণ॥
সেই মাসেতে হইল প্রেমের অঙ্কুর।
এত কি জানিব দুঃখ দিবেক অক্রুর॥
আইল পৌষ মাস হিমের প্রভাবে।
শীত বলি নাহি জানি কৃষ্ণের উন্মাদে॥
সখী চারি পাঁচ মেলি কাখে কুম্ভ করি।
যমুনায় ভরিতাঙ জল চাঁদ-মুখ হেরি॥
জলকোল গতাগতি করি ঐ ছলে।
সখী সব হইতাঙ জড় কদম্বের তলে॥
শীত বলি না জানিতাঙ শ্যাম সঙ্গে রয়্যা।
এই পৌষে মরে তারা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
একে সে বিরহ-জ্বালা হিম করে তায়।
কহিয় শ্যামেরে তারা বড় দুঃখ পায়॥
মাঘ মাসে থাকিতাঙ নানান কৌতুকে।
আপনি হইয়া দানী রহিত রাজপথে॥
শ্যাম সঙ্গে মাঘ মাসে রহিতাঙ বসিয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পসরা সাজিয়া॥
অই ছলে কৃষ্ণে বেড়ি রহিতাম বসিয়া।
কত রস কথা কৃষ্ণ কহিত হাসিয়া॥

ক্ষীর ছানা নবীন দিতাঙ চাঁদ মুখে।
এই রূপে বিহার করিতাঙ নানা সুখে॥
এই মাঘ মাসেতে কান্দিয়া দিবানিশি।
আর না শুনিব বাঁশী কদম্বতলে আসি॥
সুখদ কদম্বতলা কালিন্দীর কূল।
প্রাণনাথ বিনে দেখি আন্ধার গোকুল॥
সেই সে ফাগুণ মাসে সখী সব সঙ্গে।
দিবা নিশি নাহি জানি থাকি নানা রঙ্গে॥
সেই শ্যাম বন্ধুরে বেড়িয়া গোপীগণে।
আবির কুসুম চুয়া সুগন্ধি চন্দনে॥
দোলনীতে বসাইয়া দোলায় শ্যাম রায়।
কোন কোন গোপী অঙ্গে চামর ঢুলায়॥
বীণা আদি নানা যন্ত্র করিয়া সুতান।
আনন্দে মাতিয়া গোপী কৃষ্ণগুণ গান॥
সে সব সুখের দিন ইবে গেল দূরে।
ফাল্গুনেতে কিবা করে শ্যাম মধুপুরে॥
সেই সব লীলা রস যেঞি মনে পড়ে।
নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জ্বালে॥
... ... ইত্যাদি।

কমলার বারমাসী

—ময়মনসিংগীতিকা

"পোষ গেল-মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ॥
শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়।
এইরূপে আস্তেব্যস্তে মাঘ মাস যায়॥
একদিনের কথা বলি কি কাম হইল।
দধির পশরা লইয়া গোয়ালিনী আইল॥

এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী।
দধি বেচিতে দেখ আইল আপনি॥
হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে।
পরা-দস্ত সাক্ষী করি সভার বিদ্যমানে॥
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে॥

"আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার॥
ধনু হাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
বেহুড়া যুবতী ঘরে না দেখে উপায়॥
ভ্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায়॥
আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়।
কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায়॥
শব্দে শুনা যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি।
এত দুঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী।

"আইল রাজার চর বাপের আগে কয়।
রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়॥
হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী।
বাপ চলিল মোর পুরী আন্ধাইর করি॥
যাইবার বেলা বাপে দুঃখিনীরে কয়।
কত দিনে আসি মাও না জানি নিশ্চয়॥
সাবধানে থাক্য মাগো দিবসরজনী।
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি॥
বাপ বিদেশে গেলে পুরী অন্ধকার।
চারিদিগ দেখি যেন খোয়ার আকার॥
আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুর্গাপূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা॥

ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়॥
মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
কারুয়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর॥
পাড়া-পড়সি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি।
ঘরের কোনায় লুকাইয়া আমি কান্দ্যা মরি॥

মায়ে ঝিয়ে কান্দি ঘরে গলা ধরাধরি।
বৈদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী॥
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
রাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল॥
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
আমার বাপ হইল বন্দি কোন অপরাধে॥

"বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়।
'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়
সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে।
বৈদেশে চলিল ভাই বাপের সন্ধানে॥
মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধূলায় পড়িয়া।
কার পূজা কেবা করে না দেখি ভাবিয়া॥
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায়।
বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায়॥

"বৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি।
পুষ্প ফুটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুঞ্জরি॥
ফুল দোলে পূজা আদি কহিতে বিস্তর।
আর বার পত্র আসে মায়ের গোচর॥
পিতা পুত্র দুইজন বন্দী পরবাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বসুমাতা ভাসে॥
অভাগী কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া।
কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধা হিয়া॥

কোন বা দেবেরে পূজলে বাপ-ভাইয়ে পাব।
মায়ের ঝিয়ের দুঃখের কথা কার কাছে কইব॥
ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর।
তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর॥
মায় গিয়া ধন্না দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।
তার পরের কথা কহি সভার গোচরে॥
"জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল।
রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল॥
মায়ে করে ষষ্ঠীপূজা পুতের লাগিয়া।
প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দুঃখে কান্দে হিয়া॥
মায়ের স্নেহের ডুঙ্গা পড়িয়া রহিল।
পুত্রেরে ডাকিয়া মায় বিলাপ জুড়িল॥
এক হস্তে মোছি আমি চক্ষের যে পানি।
সান্ত্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী॥
"এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল।
রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল॥
এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই।
বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর ভাই॥
নিজেরে বাসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী।
মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী॥
দিন গোঙরিয়া যায় সন্ধ্যা আসে বাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বুক যায় ভেসে॥
পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানার কড়ি॥
"আষাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি।
মামার বাড়ীতে কান্দি দিবস রজনী॥
ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই।
আশায় বান্ধিয়া বুক রজনী গুয়াই॥

এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
বৈদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল॥
"দুখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা।
কারে বা কহিব আমি এই দুঃখের কথা॥
আগুনের উপরে যেন জ্বলিল আগুনি।
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী॥
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্মসভার আগে।
ছাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিরাগে॥
"সন্ধ্যা গোঙরিয়া যায় না দেখি উপায়।
একেলা হাওরে পড়ি করি হায় হায়॥
মামার বাড়ীর অন্ন আর না খাইবাম আমি।
গলায় কলসী বান্ধ্যা ত্যজিব পরাণি॥
সাপে না খাইল মোরে বাঘে নাইসে খায়।
কোথায় যাইয়া লুকাই মুখ না দেখি উপায়॥
দেবেরে ডাকিয়া কই, আশ্রা দিতে মোরে।
কেবা আশ্রা দিবে মোরে এই অন্ধকারে॥
চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাসি যায়।
আইঞ্চল ধরিয়া মুছি পানি না ফুরায়॥
না দেখি পন্থের কায়া জোর আখির জলে।
তরাইতে দরদী নাই বিপদের কালে॥
সাত জন্মের সুহৃদ মোর মৈষাল বন্ধু ছিল।
গোয়ালায় যাইবার কালে পন্থে দেখা হইল॥
জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান।
তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান॥
মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া।
এইখানে পাইলাম সুখের আছরা॥
এই ত মইষাল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর।
জাতিকুল বাচাইল দুঃখ করল দূর॥

একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা।
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা॥
শ্রাবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিষণ।
বিলের মাঝে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন॥
কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার।
মৈষালের বাসে দেখা হইল তাহার॥
পরিচয় চাইল মোর রাজার কুমার।
একদিন পরিচয় দিবাম তাহার॥
সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা।
আর কিছু কই আমি করমের কথা॥
"ভাও ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল।
অন্তরে ফুটিল মোর সোণার কমল॥
কার্ত্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া।
পরাণে আমি দগ্ধ হৈল হিয়া॥
মনে প্রাণে সঁপিলাম পরাণ তার পায়।
আমার পরাণ বন্ধু ধরে লইয়া যায়॥
উপায় না দেখি কান্দি কই মনের কথা।
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা॥
"চলিল সোণার পান্সি ভরা নদী দিয়া।
সিলুয়ারী বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়া॥
কত দিনে আসিলাম এইত রাজার পুরে।
দাসী হইয়া আসি আমি রাণীর দুয়ারে॥
মনের আগুন মোর মনে জ্বলে নিবে।
আর কত দিন দুঃখ পরাণে সহিবে॥
মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়।
সদাকাল আছি আমি ধইরা রাণীর পায়॥
"একদিন শুনি নগরের মধ্যি থানে।
ঢাক-ঢোল বাজে আর নাচে সর্বজনে॥

দাস দাসীগণ যত আনন্দে অপার।
অঙ্গেতে বসন পড়ে যা আছে যাহার ॥
কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়াস্থা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে ॥
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা।
শক্তিশেলে হাণে বুকে নিদারুণ ব্যথা ॥
বাপের বাড়ির মণ্ডপ শূন্যি কেবা পূজা করে।
অভাগিনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে ॥
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিনী মায়।
আমার দুঃখের কথা কইতে না জুয়ায় ॥
এক দণ্ড না দেখিলে হইত পাগলিনী।
সন্ধ্যা বেলা ছাইড়া আইলাম আমি অভাগিনী।
ভাদ্রমাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে।
দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে ॥
গাঙ্গে দিয়া বাইয়া যায় দৌড় বাইছা নাও।
কোন্ বা দেশে রইলা মোর অভাগিনী মাও ॥
দিনের বেলা ঝরে আঁখি রাইতের অন্ধকার।
ভাদ্রমাসের চান্নি গেল রুসনাইর বাহার ॥

ভাদ্রমাসের চান্নি দেখায় সমুদ্রের তলা।
সেও চান্নি আন্ধাইর দেখ্যা কান্দিছে কমলা ॥
"ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে।
আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে ॥
বাপের মণ্ডল খালি রইল কেবা পূজা করে।
বাপ ভাই মুক্ত হোক দুর্গা মায়ের বরে ॥
কাত্তিক মাসেতে দেখ কার্ত্তিকের পূজা।
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা ॥
সারারাত্রি হুলামেলা গীত বাদ্যি বাজে।
কুলের কামিনী মত অবতরঙ্গে সাজে ॥

সেইত কার্ত্তিক গেল আগণ আইল।
পাকা ধানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল ॥
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া ॥
জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে ॥
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পরাণ।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ ॥
বাপ কোথায় মাও কোথায় কোথায় গুণের ভাই।
এই সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখি ঠাই ॥
কান্দিয়া কাটাই নিশি মোছি চক্ষের পানি।
এইখানে সাক্ষী করি এই রাজার রাণী ॥
"এক দিন শিরে তৈল মাখিয়া রাণীরে।
কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে ॥
ঢাক-ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে।
আজিগো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে ॥
কালীপূজা হয় আজি কালীর মন্দিরে।
নরবলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে ॥
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া।
নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া ॥
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি।
বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি ॥
"সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে।
শীঘ্র করিয়া স্নান করাই রাণীরে ॥
রাণী করে সাজা পারা যাইব দেবের বাড়ী।
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী ॥
আঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়নের পানি।
উপায় না দেখি মোর আমি অভাগিনী ॥

"হেন কালে সাক্ষী মোর আসিল মন্দিরে।
রাজপুত্র আসি মোরে জিজ্ঞাসা যে করে॥
বিয়া কর কন্যা মোরে রাখ মোর প্রাণ।
আমি কহিলাম মোর পূর্বের সন্ধান॥
'আজি কেন রাজার পুরে আ নন্দের রোল।
কি সেরলাগিয়া এত বাজে ঢ ক-ঢোল॥'
কহিলা রাজার পুত্র মনেতে ভাবিয়া।
'কালীপূজা করে বাপে নরবলি দিয়া॥'
"কেবা নর কেবা পূজে কারে দিব বলি।
সকল জানিয়া আমি হইলাম পাগলী॥
'এইত আমার দিন হইল উদয়।
এইবার দিলাম রে কুমার মোর পরিচয়॥
সঙ্গে লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায়।
নরবলির বাদ্য যথা কোচেরা বাজায়॥' "

ষাণ্মাসিকী গীতি

কঙ্ক ও লীলা—ময়মনসিং গীতিকা

"দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী-বকুল॥
মধু-লোভে যাওরে উড়ে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
বহু দিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী॥
নানা দেশে যাওরে ভ্রমর আর পুষ্প-মধু খাও
কৈও কৈও লীলার কথা যদি লাগাল পাও॥
কৈও কৈও বঁধুর আগে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল॥
"দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে।
আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে॥

গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল।
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।
এমন না কালে বঁধু গেল দেশান্তর॥
না কইয়া না বইলারে বঁধু হইলা বৈদেশী।
মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল ঝইরা হৈল বাসী॥
বিনা সুতে হার গাঁথি মালতী-বকুলে।
প্রাণের বঁধু নাহি ঘরে দিব কার গলে॥
কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে।
গাঁথা মালা বাসি হইলে প্রাণে বড় লাগে॥
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও।
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে জানাও॥
"নূতন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ॥
গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার রোল॥
এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয়॥
কোকিল কোকিলা মাগে বসন্ত বিদায়।
আমার বঁধু এমন কালে রইয়াছে কোথায়॥
নূতন বৎসর আইল মনে নব আশা।
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা॥
জ্যৈষ্ঠ মাস জ্যেষ্ঠরে সকল মাসের বড়।
ফলে-ফুলে তরু-লতা দেখিতে সুন্দর॥
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।
মন সাধে ডালে বসি বিহঙ্গ সকল॥
নানা গীতি গায়রে তারা নানান ফল খায়।
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায়॥

নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর।
কান্দিয়া সুধাইলে কেহ না দেয় উত্তর ॥"
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জ্বলন্ত অনল।
ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল ॥
'আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা-সম্ভাষণে ॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা ॥
হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে ॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাচিয়া ॥
শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী ॥
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়।
আমার বঁধুর তারা লাগাল নি পায় ॥
এতকাল ছিল রে লীলা বড় আশার আশে
সাধুর তরণী বাহি বঁধু আইব দেশে ॥
কত দিন বাঁচেরে প্রাণ আশায় ধরিয়া।
দুই মাস গেল লীলা কান্দিয়া কন্দিয়া ॥
"কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ুর-ময়ুরী নাচে ধরিয়া পেখম ॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা ॥

জলেতে কমল ফুটে আর নদী-কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল
দিন-রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি॥
থাউরি বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥
"রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্রধরি মাথে।
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে॥
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী॥
শুনরে বিরহী পাখী আরে পাখী পাইতাম তোমায় কাছে।
কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে॥
কি কব দুঃখের কথা কইতে না জুয়ায়।
দেশে না আসিল বঁধু বর্ষ বহি যায়॥
দিন যায় ক্ষণ রে যায় না মিটিল আশ।
এইরূপে কান্দিয়া গেল লীলার ছয় মাস॥
বিচিত্র-মাধব কঙ্কের সন্ধান করিয়া।
কঙ্কেরে লইয়া সঙ্গে আসিবে ফিরিয়া॥"

মহুয়া

ময়মনসিং-গীতিকা

মহুয়ার সন্ধানে নদের চাঁদের ভ্রমণ

যেইখানে বসিয়া কন্যা করিত রন্ধন।
তথায় বইসা নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন॥

ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস।
এইখানে আছিল কন্যা ফাল্গুন-চইতের মাস॥
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ না মাস গেল এই মতে।
কাইন্দা বেড়ায় নদীয়ার ঠাকুর উচানীচা পথে॥
আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এইরূপে যায়।
পূবেতে গবুজিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়॥
ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে।
দিন রাইত নদীয়ার ঠাকুর খুঁজে নানান মতে॥
বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায়।
খালি মণ্ডপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকুরের দায়॥
মাও রইল বাপ রইল রইলরে সোদর ভাই।
মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া রজনী পোয়াই॥
কাত্তিক মাসে কার্ত্তিক বরত পুত্রের লাগিয়া।
আক্ষি ঘোর হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া॥
আগুণ মাসে অল্পশীত কংসাই নদীর পাড়ি।
লাগাল পাইল নদীয়ার চান্ মহুয়া সুন্দরী॥
সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥

দেওয়ান ভাবনা

ময়মনসিং গীতিকা

সুনাইর বারমাসী

একেলা ঘরেতে সুনাই কেবল সঙ্গে দাসী।
এইখানে শুনিয়ো সুনাইর বারমাসী॥
আষাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পান্সীখানি॥
একেলা ঘরেতে রইল সুনাই যুবতী।
সুনাই কান্দিয়া কয় শুন সল্ল্যা দূতী॥

আষাঢ় মাস গেল দূতী এই না আশার আশে ।
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে ॥
শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিল গো আমার মনের আশা ॥
ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকন তাল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে (সুনাইর) গেল যৈবন কাল ॥
আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেশে ।
না আইলা প্রাণের বন্ধু দুর্গামায় পূজিতে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি ।
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি ॥
আইলনারে পরাণের বন্ধু কার্ত্তিক মাস যায় ।
বাইরে কান্দে দাস দাসী ঘরে কান্দে মায় ॥
আঘন মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা।
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না মিটিল আশা ॥
পৌষ মাসে পোষা আঙ্কি অঙ্গ কাপে শীতে ।
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে ॥
পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল।
বসন্তে যৌবন-জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল ॥

কি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসন্তের জ্বালা ।
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী একেলা ॥

চৈত মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালী ।
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী ॥

চৈত মাস যায় দূতী বচ্ছর হইল শেষ ।
একদিন না বান্ধিলাম অভাগীর চিকণ কেশ ॥

একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া ।
মধুর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥

গায়েতে পড়িল……যৈবন হইল কালি ।
কোন কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম।
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈষ্ঠমাস্যা ঘাম॥
তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী॥

বারমাসী

শিবায়ণ—রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র

রম্ভা-দুর্গার সংবাদ

প্রথমে হেমন্ত ঋতু মার্গশীরষে।
গগনে নির্মল চাঁদ তুষার বরিষে॥
ইক্ষু ধান্য আদি শস্যে সুধা দেন শশী।
নীর ক্ষীর দুই এই ঋতুতে প্রশংসি॥
সুন্দরী নাগ শুন বক্তার বচন।
বিবেকী পুরুষে মান কর অকারণ॥
পৌষে প্রবল শীতে শয্যার বিলাস।
খট্টায় শয়ন অট্টালিকায় নিবাস॥
ঘৃত মধু পান করি দ্বিগুণ আহার।
নানা বর্ণে চীর পরি নানা অলংকার॥
শুনি সারসের ধ্বনি শুনি সারসের ধ্বনি।
কিরূপে পোহাও তুমি দীঘল রজনী॥
মাঘেতে নিদাঘ নাহি না সহে বিচ্ছেদ।
গাঢ় আলিঙ্গন দুঁহে শয়ন অভেদ॥
কুন্তলে লোটন গন্ধ তৈলের সুবাস।
সুপূর কর্পূর পাকা পান রসবাস॥
তুমি হরের বনিতা তুমি হরের বনিতা।
শিশির সময়ে কেন এ রসে বঞ্চিতা॥
ফাল্গুণে দ্বিগুণ কাম দুঃখ নাহি টুটে।
বনে দববাহন মনেতে অগ্নি উঠে॥

অলক তিলক লিখি কস্তুরী কুমকুমে।
স্বেদ নাহি হয় নিধুবন পরিশ্রমে॥
তুমি বিলাসকুশলা তুমি বিলাসকুশলা।
নিশি চন্দ্রে মসী কেন করিল বিফলা॥
মধুমাসে মধুব্রত মত্ত মকরন্দে।
আমোদ করিল বন কুসুমের গন্ধে॥
বসন্ত সহায় করি আইসে মদন।
মলয় পবন কারে না দেই কদন॥
শুনি কোকিলের কুক শুনি কোকিলের কুক।
বিরহিণী জনের বিদীর্ণ হয় বুক॥
মাধবে মাধ্বীক গন্ধ বহে সমীরণ।
উদকে উদয় করে কমলের বন॥
চন্দনে করিয়া চিত্র অলংকার লিখি।
তনসুক পরি কুচে না সহে কঞ্চুকি॥
প্রাণ কি বলে কামিনী প্রাণ কি বলে কামিনী।
বসন্তে বঞ্চিলে তুমি কিরূপে যামিনী।
জ্যৈষ্ঠে নারিকেল মিষ্ট আম্র পনস।
বিলাসিনী জন ভোগ করে নানা রস॥
শীতল মুক্তার হার রাখি মাত্র কুচে।
জলযন্ত্র মন্দির কাহারে নাহি রুচে॥
এই সময় নিদাঘ এই সময় নিদাঘ।
আলিঙ্গন দানে জানি স্বামীর সোহাগ॥
আষাঢ়ে মদন বাড়ে চাতকের ডাকে।
পাসরণে স্মরণ করায় পিউ পাকে॥
আমলকী স্নানের কষাএ বাস কেশে।
ব্যজনে বিচিয়া সিঞ্চি চন্দনের রসে॥
দেহে নাহি সহে চীর দেহে নাহি সহে চীর।
সংসারে শীতল মাত্র স্বামীর শরীর॥

নানাবর্ণে শ্রাবণে গগনে দেখি মেঘ।
অধিক হৃদয়ে বাড়ে মদন উদ্বেগ॥

দিকে দিকে সৌদামিনী অশনি ঝঙ্কার।
সঘনে বরিষে নিশি ঘোর অন্ধকার॥

শুনি ঘনার গর্জন শুনি ঘনার গর্জন।
শঙ্কর বিহনে গ কেমন করে মন॥

ভাদ্রে ভদ্রক নাহি ভেকের নিনাদে।
মন বান্ধা না যায় মউর লাগে বাদে॥

সমুদ্র মিলনে চলে নদী বেগবতী।
প্রবাসে প্রাবৃট্‌কালে পাঠাইলে পতি॥

এই দুরন্ত বরিষা এই দুরন্ত বরিষা।
কোকের করুণা যত তত বাড়ে নিশা॥

আশ্বিনে নির্মল জল নির্মল চন্দ্রমা।
সরিতের শোভা যেন কন্যা মনোরমা॥

বালুকা লোহিত সিত সিন্দুর চন্দন।
রাজহংস কুল মালা সফরী ভূষণ॥

তুমি ঈশ্বরবল্লভা তুমি ঈশ্বরবল্লভা।
দেখিলে মোহিবে চাঁদ কুমুদের শোভা॥

কার্ত্তিকে কপোত কেক করে কলরব।
শরৎ সম্ভব যত পুষ্পের সৌরভ॥

বিবর উদ্দেশে ভ্রমে ভ্রমর ভবনে।
নির্মল প্রাঙ্গণ পথ রঞ্জিত খঞ্জনে॥

ভণে রামকৃষ্ণ দাস ভণে রামকৃষ্ণ দাস।
একাকিনী কেমনে বঞ্চিলে বারমাস॥

হিন্দী সাহিত্য

বীসল দেব রাসো

রচয়িতা—দ্বাদশ শতাব্দীর কবি নাল্‌হ

নায়িকা রাজমতীর বারমাস্যা

চালিয়উ উলগাণউ কাতিগ মাস।
ছোড়ীয়া মন্দির ঘর কবিলাস।
ছোড়ীয়া চউবারা চউখণ্ডী।
তঠই পন্থ সিরি নয়ণ গমাইয়া রোই।
ভূখ গঈ ত্রিশ উচটী।
কহি ন সখীয় নীঁদ কিসী পরি হোই॥

শ্লোক-৬৭

মগসিরিয়ই দিন ছোটা জী হোই।
সখীয় সন্দেসউ ন পাঠবই কোই।
সন্দেসই হী বজ্জ পড়িয়উ
উঁচা হো পরবত নীচা ঘাট।
পরদেসে পর ভুঁই গয়উ।
তঠই চীরীয় ন আবই ন চাল এ বাট॥

৬৮

দেখি সখী হিও লাগউ ছই পোস।
ধণ মরতীয় কো মত্‌ দীয়উ দোস।
তুখি দাধী পঞ্জর হুঈ।
ধান ন ভাবএ তজ্যা সিরি নহাণ।
ছাহড়ী ধুপ ন আলিঙ্গই।
দেখতাঁ মন্দির হুয়উ মসাঁণ॥

৬৯

মাহ মাস ইসীয় পড়ই ঠঠার।
দাধা হুঈ বনখণ্ড কী ধা হো ছার।

আপদহস্তী জগ দহিয়উ।
ম্‌হাকী চোলীয় মাহি থী দাধউ ছই গাত্র।
ধনীয় বিহুণী ধণ তাকিজই।
তূস্তউ উবইগউ রে আবিজ্যো করহ পলানি।
জোবন ছত্র উমাহিয়উ।
ম্‌হাকী কনক কায়া মাহে ফেরবী আণ॥

ফাগুণ ফরহরিয়া কম্পিয়া রুখ।
চিতহ চমকিয়উ নিসি নীদঁ ন ভূখ।
দিন রায়া রিতু পালটী।
ম্‌হাঁকউ মূরখ রাউ ন দেখই আই।
জীবউ তউ জোবন সখী।
ফরহরই চিহুঁ দিসি বাজই ছই বাই॥

চেত্র মাসই চতুরঙ্গী হহে নারি।
প্রীয় বিণ জীবিজই কিসই অধারি।
কঞ্চুয়উ ভীজই জণ হসই।
সাত সহেলীয় বইঠী ছই আই।
দন্ত কবাডিয়া নই নহ রঙ্গিয়া।
চালউ সখী আপে খেলণ জাই।
আজ দীসই সু কাল্‌হে নহীঁ।
ম্‌হে কিউঁ হোলী হে খেলন জাঁহ।
উলগাঁণই কী গোরড়ী।
ম্‌হাঁকী আঙ্গুলী কাঢ়তাঁ নিগলী জই বাঁহ॥

বইসাখই ধুর লুণীজই ধান।
সীলা পানী অরু পাকা জী পান।
কনককায়া ঘট সীঁচিজই।
ম্‌হাকউ মূরখ রাউ ন জাণই সার
হাথ লগামী তাজ ণউ।
উভউ সেবই রাজ দুআরি

দেখি জেঠাণী হিঅ লাগউ ছই জেঠ।
মুহ কুমলাণা নই সুক গয়া হোঠ।
মাস দিহাড়উ দারুণ তবই।
ধণ কউ হে ধরণি ন লাগএ পাউ।
অনল জলই ধণ পরজলই।
হংস সরোবর ছঁড়ি গয়উ ঠাঁউ॥ ৭৪

আসাঢ়ই ধুরি বাহুড়িয়া মেহ।
খলহলিয়া খাল নই বহ গঈ খেহ।
জই রি আসাঢ় ন আবই।
মাতা রে মইগল জেউ পগ দেই।
সদা মত্ওয়ালা জেউ ঢুলই।
তিহি ঘরি উলগ কাই করেই॥ ৭৫
শ্রাবণ বরসই ছই ছোটীয় ধার।
প্রীয় বিণ জীবি জই কিসই অধারি!
সহু কোই খেলই কাজলী!
তঠই চিড়ীয় কমেড়ীয় মণ্ডিয়া আস।
বাবহিয়উ প্রীয় প্রীয় করই।
মোনই অণখ লগাবই হো শ্রাবণ মাস॥ ৭৬

ভাদ্রবই বরিসই ছই গুহির গম্ভীর।
জলথল মহিয়ল সহু ভর্য়্যা নীর!
জাণে কি সায়র উলট্য়উ।
নিসি অঁধারীয় বীজ খিবাই।
বাদল ধরতী সিয়উ মিলা।
মূরখ রাউ ন দেখই জী আই।
হুঁ তী গোসামী নই একলী।
তুই দুখ নাল্হ কিঁউ সহণা জাই॥ ৭৭
আসোজই ধণ মণ্ডিয়া আস।
মণ্ডিয়া মন্দির ঘর কবিলাস।

ধউলিয়া চউবারা চউখণ্ডী।
সাধণ ধউলিয়া পউলি পকার।
গউখ চড়ী হরথী ফিরই।
জউ ঘর আবিস্থই মন্দ ভরতার॥ ৭৮

অনুবাদ :—

আমার স্বামী রাজভবন ত্যাগ করে চলে গেছেন এই কাতিক মাসে, আর আমি তাঁরই প্রতীক্ষায় কেঁদে কেঁদে চোখ নষ্ট করে ফেলেছি। আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। বলো সখি, ঘুম আমার কী করে আসে।

অগ্রহায়ণ মাসে দিনগুলি ছোট হয়ে যাচ্ছে। সখি! আমার স্বামী এখনও কোন সংবাদ পাঠান নি। তিনি রয়েছেন বিদেশ-ভূঁইএ। সেখানে যেতে কত পর্বত ও নদীনালা। সে দেশ থেকে এখানে না আসে কোন চিঠি, এ দেশ থেকে সেখানে না যায় কোন মানুষ।

দেখ সখি, পৌষ তো এসে গেল। মুখে আমার অন্ন রোচে না। স্নান তো অনেক দিন হলো ছেড়ে দিয়েছি। এখন শীত-গ্রীষ্ম, ভালমন্দ বোধ আর আমার কিছুই নেই। গৃহ যেন দেখতে দেখতে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে আমি কঙ্কালে পরিণত হয়েছি। যদি মরে যাই, এই অভাগীকে দোষ দিও না, সখি!

মাঘ মাসে এত শীত পড়ছে যে, তুষারপাতের ফলে বনানী নষ্ট হয়েছে। বিরহ-দগ্ধ অভাগিনীর দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎই দগ্ধ মনে হচ্ছে। স্বামিবিহীন স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। হে পতি! তুমি একবার আমার কনক-শরীরে মিলিত হয়ে আবার চলে যেও।

ফাল্গুন এসেছে। তরুলতাগুলি কাঁপতে শুরু করেছে। রাতে আমার ঘুম নেই; আমার ক্ষুধা নেই। ঋতু বদলে গেছে, এখনকার দিনগুলি বড় সুন্দর। কিন্তু আমার মূর্খ রাজা এসে একবার দেখছে না। যদি বেঁচে থাকি, তবেই তো যৌবনের সুখ পাবো। সখি! চারিদিকে ফাল্গুন এসে গেছে; ঐ শোন পবনের সন্ সন্।

চৈত্র মাসে সকল নারীই রঙ-বেরঙের কাপড় পরেছে। কিন্তু বিরহিণী নারী প্রিয়তমকে ছেড়ে কার আশ্রয়ে বেঁচে থাকবে? সখীরা এসে আমায় ঘিরে ধরে বলছে—"চলো সখি, আমরা একটু হোলী খেলে আসি। যে বয়স আজ

াছে, কাল তা আর থাকবে না।" আমি বলছি—"আমি যে প্রোষিত-ভর্তৃকা-
ারী, আমি কী করে হোলী খেলতে যাবো?"

বৈশাখে ধান কাটা হচ্ছে। এই তো শীতল জল ও পাকা পানের সময়।
ানার মত গাছগুলিকে ঘড়ার জলে অভিষিঞ্চিত করা হচ্ছে। মূর্খ রাজা
ামার কোন মূল্যই বুঝলো না। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে সে উড়িষ্যার
জ্বারে সেবা করছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস এসে গেছে। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে আমার মলিন মুখ ও শুকনো
াট নিয়ে তপ্ত মাটিতে আর চলতে পারছি না। চারিদিকে যেন আগুন
লছে, আর সেই আগুনে জ্বলে মরছে বিরহিণী নারী।

আষাঢ় মাসে মেঘ আবার ফিরে এসেছে। চারিদিকের নিম্নভূমি জলে
রিপূর্ণ। প্রমত্ত মেঘ মদগর্বিত হাতীর মত আকাশের এদিক-ওদিক বিচরণ
রছে। কিন্তু আমার স্বামী এখনও এলো না। জানি না, বিদেশের ঘরে বসে
া কী করছে!

শ্রাবণ মাসে শুরু হলো ধারা বর্ষণ। প্রিয়তম বিনা কার আশ্রয়ে আমি
চে থাকবো? সকলেই কাজরী খেলায় রত। কপোতী আশায় বুক বেঁধে
াছে, পাপিয়া পিউ পিউ করে ডাকছে। আমার মনে কিন্তু কিছুমাত্র নেই।

ভাদ্র মাসে গভীর গম্ভীর বর্ষা শুরু হলো। সমস্ত জগৎ জলে প্লাবিত। যেন
মুদ্রের জল উথলে উঠেছে। অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘগুলি
ন জলের ভারে নেমে এসে মিলিত হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে। তৎসত্ত্বেও মূর্খ
জা এসে একবার আমার অবস্থা দেখছে না। একে তো আমি নারী, তার
পর একাকিনী; এ দুঃখ কী করে সইবো?

আশ্বিন মাসে মন আশান্বিত হলো। স্বর্গতুল্য রাজভবনখানিকে সাজিয়ে
ছিয়ে বাতায়নের পাশে বসে রইলো বিরহিণী নারী। মনে তার হর্ষ, তার
ী স্বামী বোধ করি এবার ফিরে আসবে।

পদমাবত্

রামচন্দ্র শুক্ল-সম্পাদিত

[নাগমতী বিয়োগখণ্ড]

চঢ়া অসাঢ়, গগন ঘন গাজা। সাজা বিরহ দুন্দ দল বাজা॥
ধূম, সাম, ধৌরে ঘন ধাএ। সেত ধজা বগ-পাঁতি দেখাএ॥

খড়্গ-বীজু চমকৈ চহুঁ ওরা। বৃন্দবান বরসহিঁ ঘন ঘোরা॥
ওনই ঘটা আই চহুঁ ফেরী। কন্ত! উবারু মদন হৌঁ ঘেরী॥
দাতুর মোর কোকিলা, পীউ। গিরৈ বীজু, ঘট রহৈ ন জীউ॥
পুষ্প নখত সির উপর আবা। হৌঁ বিনু নাহ, মন্দির কো ছাবা?
অদ্রা লাগ, লাগি ভুই লেঈ। মোহিঁ বিনু পিউ কো আদর দেঈ

জিন্হ ঘর কন্তা তে সুখী, তিন্হ গারৌ ঔ গর্ব।
কন্ত পিয়ারা বাহিরৈ, হম সুখ ভূলা সর্ব॥

সাবন বরস মেহ অতি পানী। ভরনি পরী, হৌঁ বিরহ ঝুরানী॥
লাগ পুনরবসু পীউ ন দেখা। ভই বাউরি, কহঁ কন্ত সরেখা॥
রকত কৈ আঁসু পরহিঁ ভুই টূটী। রেঙ্গি চলীঁ জস বীরবহুটী॥
সখিন্হ রচা পিউ সঙ্গ হিণ্ডোলা। হরিয়ারি ভূমি, কুসুম্ভী চোলা॥
হিয় হিণ্ডোল অস ডোলৈ মোরা। বিরহ ঝুলাই দেহ ঝকঝোরা॥
বাট অসূঝ অথাহ গম্ভীরী। জিউ বাউর, ভাফিরৈ ভঁভীরী॥
জগ জল বূড় জহাঁ লগি তাকী। মোরি নাব খেবক বিনু থাকী॥

পরবত সমুদ অগম বিচ, বীহড় ঘন বনঢাঁখ।
কিমি কৈ ভেঁটৌঁ কন্ত তুম্হ? না মোহি পাঁবন পাঁখ॥

ভা ভাদোঁ দূভর অতি ভারী। কৈসে ভোঁর রৈনি অঁধিয়ারী॥
মন্দির সূন পিউ অনতৈ বসা। সেজ নাগিনী ফিরি ফিরি ডসা॥
রহৌঁ অকেলি গহে এক পাটী। নৈন পসারি মরৌঁ হিয় ফাটী॥
চমক বীজু, ঘন গরজি তরাসা। বিরহ কাল হোই জীউ গরাসা॥
বরসৈ মঘা ঝকোরি ঝকোরী। মোর দুই নৈন চুবৈঁ জস ওরী॥
ধনী সুখৈ ভরে ভাদোঁ মাহাঁ। অবহুঁ ন আএন্হি সীচেন্হি নাহাঁ
পুরবা লাগ ভূমি জল পূরী। আক জবাস ভঈ তস ঝূরী॥

থল জল ভরে অপূর সব, ধরনি গগন মিলি এক,
জনি জোবন অবগাহ মহঁ দে বূড়ত, পিউ! টেক॥

লাগে কুবার, নীর জগ ঘটা। অবহূঁ আউ, কন্ত! তন লটা॥
তোহি দেখে, পিউ! পলুহৈ কয়া। উতরা চীতু, বহুরি করময়া॥
চিত্রা মিত্র মীন কর আবা। পপিহা পীউ পুকারত পাবা॥
উআ অগস্ত, হরিত-ঘন গাজা। তুরয় পলানি চঢ়ে রন রাজা॥

স্বাতি বুঁদ চাতক মুখ পরে। সমুদ্র সীপ মোতী সব ভরে ॥
সরবর সঁবরি হংস চলিআএ। সারস কুরলহিঁ, খঞ্জন দেখাএ।
ভা পরগাস, কাঁস বন ফুলে। কন্ত ন ফিরে, বিদেসহি ভুলে॥
বিরহ-হস্তি তন সালৈ, ঘায় করৈ চিত চুর।
বেগি আই, পিউ! বাজহু, গাজহু হোই সদুর ॥
কাতিক সরদ-চন্দ উজিয়ারী। জগ সীতল, হোঁ বিরহৈ জারী॥
চৌদহ করা চাঁদ পরগাসা। জনহুঁ জরৈঁ সব ধরতি অকাসা॥
তন মন সেজ করৈ অগিদাহু। সব কহুঁ চন্দ, খএউ মোহিঁ রাহু॥
চহুঁ খণ্ড লাগৈ অঁধিয়ারা। জৌঁ ঘর নাহীঁ কন্ত পিয়ারা॥
অবহু, নিঠুর! আউ এহি বারা। পরব দেবারী হোই সংসারা॥
সখি ঝুমক গাবৈঁ অঙ্গ মোরী। হোঁ ঝুরাবঁ বিছুরী মোরি জোরী॥
জেহি ঘর পিউ সো মনোরথ পূজা। মো কহ বিরহ, সবতি দুখ দূজা॥
সখি মানৈঁ তিউহার সব গাই, দেবারী খেলি।
হোঁ কা গাবৌঁ কন্ত বিনু, রহী ছার সির মেলি॥
অগহন দিবস ঘটা, নিসি বাঢ়ী। দুভর রৈনি, জাই কিমি গাঢ়ী?
অব যহি বিরহ দিবস ভা রাতী। জরৌঁ বিরহ জস দীপক-বাতী॥
কাঁপৈ হিয়া জনাবৈ সীউ। তৌ পৈ জাই হোই সংগ পীউ॥
ঘর ঘর চীর রচে সব কাহুঁ। মোর রূপ-রঙ্গ লেইগা নাহু॥
পলটি ত বহুরা গা জো বিছোই। অবহুঁ ফিরৈ, ফিরৈ রঙ্গ সোই॥
বজ্র-অগিনি বিরহিন হিয় জারা। সুলুগি-সুলুগি দগধৈ হোই ছারা॥
যহ দুখ-দগধ ন জানৈ কন্তু। জোবন জনম করৈ ভগসন্তু॥
পিউ সৌ কহেহু সন্দেসড়া। হে ভৌঁরা! হে কাগ!
সো ধনি বিরহৈ জরি মুঈ, তেহি ক ধুআঁ হম্হ লাগ॥
পূস্ জাড় থর থর তন কাঁপা। সুরুজ জাই লঙ্কা-দিসি চাঁপা॥
বিরহ বাঢ়, দারুন ভা সীউ। কঁপি কঁপি মরৌঁ, লেই হরি জীউ॥
কন্ত কহাঁ লাগৌঁ ওহি হিয়রে। পন্থ অপার, সুঝ নহিঁ নিয়রে।
সৌঁর সপেতী আবৈ জুড়ী। জানহু সেজ হিবঞ্চল বূড়ী॥
চকই নিসি বিছুরৈ, দিন মিলা। হোঁ দিনরাতি বিরহ কোকিলা॥
রৈনি অকেলি সাথ নহিঁ সখী। কৈসে জিয়ৈ বিছোহী পখী॥

বিরহ সচান ভএউ তন জাড়া। জিয়ত খাই ঔ মুএ ন ছাঁড়া॥
রকত ঢুরা মাঁসু গরা, হাড় ভএউ সব সংখ।
ধনি সারস হোই ররি মুই, পীউ সমেটহি পংখ॥

লাগেউ মাঘ, পরৈ অব পালা। বিরহা কাল ভএউ জড়কালা॥
পহল পহল তন রূঈ ঝাঁপৈ। হহরি হহরি অধিকৌ হিয় কাঁপৈ।
আই সূর হোই তপু, রে নাহা। তোহি বিনু জাড় ন ছুটৈ মাহা॥
এহি মাহ উপজৈ রসমূলূ। তূ সো ভোঁর, মোর জোবন ফূলূ
নৈন চুবহিঁ জস মহবট নীরূ। তোহি বিনু অঙ্গ লাগ সর-চীরূ॥
টপ-টপ বূঁদ পরহিঁ জস ওলা। বিরহ পবন হোই মারৈ ঝোলা॥
কেহি ক সিংগার, কো পহিরু পটোরা। গীউ ন হার, রহী হোই ডোরা॥
তুম বিনু কাপৈ ধনি হিয়া, তন তিনউর ভা ডোল।
তে হি পর বিরহ-জরাই কৈ চহৈ উড়াবা ঝোল॥

ফাগুন পবন ঝকোরা বহা। চৌগুন সীউ জাই নহিঁ সহা॥
তন জস পিয়র পাত ভা মোরা। তেহ পর বিরহ দেই ঝকঝোরা॥
তরিবর ঝরহি ঝরহিঁ বন ঢাখা। ভই ওনন্ত ফুলি ফরি সাখা॥
করহিঁ বনসপতি হিয়ে হুলাসূ। মো কহঁ ভা জগ দূন উদাসূ॥
ফাগু করহিঁ সব চাঁচরি জোরী। মোহি তন লাই দীন্হ জস হোরী
জৌ পৈ পীউ জরত অস পাবা। জরত-মরত মোহিঁ রোষ ন আবা
রাতি-দিবস সব যহ জিউ মোরে। লগৌ নিহোর কন্ত অব তোরে॥
যহ তন জারোঁ ছার কৈ কহোঁ কি 'পবন! উড়াব'।
মকু তেহি মারগ উড়ি পরৈ কন্ত ধরৈ জহঁ পাব॥

চৈত বসন্তা হোই ধমারী! মোহিঁ লেখে সংসার উজারী।
পঞ্চম বিরহ পঞ্চসর মারৈ। রকত রোই সগরোঁ বন ঢারৈ॥
বুড়ি উঠে সব তরিবর-পাতা। ভীজি মজীঠ, টেসূ বন রাতা॥
বৌরে আম ফরৈঁ অব লাগৈ। অবহুঁ আউ ঘর, কন্ত সভাগে॥
সহস ভাব ফূলোঁ বনসপতী। মধুকর ঘূমহিঁ সঁবরি মালতী॥
মোকহঁ ফূল ভএ সব কাঁটে। দিষ্টি পরত জস লাগহিঁ চাঁটে॥
ফির জোবন ভএ নারঙ্গ সাখা। সুআ—বিরহ অব জাই ন রাখা॥

ঘিরিনি পরেবা হোই, পিউ! আউ বেগি, পরুটূটি।
নারি পরাএ হাথ হৈ, তোহ বিনু পাব ন ছূটি॥

ভা বৈসাখ তপনি অতি লাগী। চোআ চীর চন্দন ভা আগি॥
সূরুজ জরত হিবংচল তাকা। বিরহ-বজাগি সৌঁহ রথ হাঁকা॥
জরত বজাগিনি করু, পিউ! ছাহাঁ। আই বুঝাউ, অঁগারনৃহ মাহাঁ॥
তোহি দরসন হোই সীতল নারী। আই আগি তেঁ করু ফুলবারী॥
লাগিউঁ জরৈ, জরৈ জস ভারূ। ফির ফির ভূঁজেসি, তজেউঁন বারূ॥
সরবর-হিয়া ঘটত নিতি জাঈ। টূক টূক হোই কৈ বিহরাঈ॥
বিহরত হিয়া করহু, পিউ! টেকা 'দীঠি-দবঁগরা মেরবহু একা॥

সকবঁল জো বিগসা মানসর বিনু জল গএউ সুখাই।
কবহুঁ বেলি ফিরি পলুহৈ জৌ পিউ সঁ ীচৈ আহ॥

জেঠ জরৈ জগ, চলৈ লুবারা। উঠহিঁ ববগুর পবহিঁ অংগারা
বিরহ গাজি হনুবন্ত হোই জাগা। লঙ্কা-দাহ করৈ তনু লাগা॥
চারিহু পবন ঝকোরৈ আগী। লঙ্কা দাহি পলঙ্কা লাগী॥
দহি ভই সাম নদী কালিন্দী। বিরহ ক আগি কঠিন অতি মন্দী॥
উঠৈ আগি ঔ আবৈ আঁধী। নৈন ন সুঝ, মরৌ দুঃখ-বাঁধী॥
অধজর ভইউ, মাঁসু তনু সুখা। লাগেউ বিরহ কাল হোই ভূখা॥
মাঁসু খাই সব হাড়নৃহ লাগৈ। অবহুঁ আউ; আবত সুনি ভাগৈ॥

গিরি, সমুদ্র, সসি, মেঘ, রবি সহি ন সকহিঁ বহ আগি।
মুহমদ সতী সরাহিএ, জরৈ জো অস পিউ লাগি॥

অনুবাদ :—

আষাঢ় মাস এসে গেছে। আকাশে মেঘগর্জন করতে লাগলো। বিরহ যুদ্ধের আয়োজন করেছে এবং তার সেনাবাহিনী এসে গেছে। ধূম্রবর্ণ, কালো এবং সাদা মেঘ সৈনিকের মত আকাশে দৌড়াতে লাগলো। বকের দল শ্বেত পতাকার ন্যায় দেখা গেল। বিদ্যুৎ চারিদিকে তলোয়ারের মত চমকাতে লাগলো। মেঘ ফোঁটা-রূপী বাণ বর্ষাতে লাগলো। চারিদিকে মেঘ ঝুঁকে আসছে। হে কান্ত, মদন আমাকে ঘিরেছে, আমাকে বাঁচাও। ব্যাঙ্, ময়ূর, কোকিল, পাপিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে। এখন এ দেহে আর প্রাণ থাকবে না। পুষ্যা নক্ষত্র মাথার উপর এসেছে। আমি স্বামিবিহীন, কে আমার মন্দির ছাইয়ে দেবে? আর্দ্রা লাগতেই বিদ্যুৎ ভূমিস্পর্শ করেছে,

প্রিয় বিনা আমাকে কে আদর করবে? যাদের ঘরে কান্ত আছে, তারাই সুখী, তাদেরই গৌরব, তাদেরই গর্ব। আমার প্রিয় স্বামী বাইরে, কাজেই আমি সব সুখ ভুলেছি।

শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি হচ্ছে—মুষলধারে বৃষ্টি, কিন্তু আমি বিরহে শুকিয়ে যাচ্ছি। পুনর্বসু আরম্ভ হলো, প্রিয় কি দেখে নি? চতুর প্রিয় কোথায়, সেই চিন্তায় আমি ব্যাকুল। চোখের জল মাটিতে ঝরছে।···আমার সখিরা তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে দোলনায় দুলছে, সবুজ পৃথিবী দেখে তারা লাল রঙের পরিচ্ছদে দেহ ভূষিত করেছে। আমার হৃদয় বিরহের আঘাতে দোলার ন্যায় দুলছে। গহন ও গম্ভীর পথ, আমার পাগল প্রাণ পতঙ্গের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, পৃথিবী জলে ডুবে গেছে, মাঝি নেই বলে আমার নৌকা চলছে না। আমি ও আমার প্রিয়ের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আছে পর্বত, দুস্তর সমুদ্র, নির্জন অরণ্য। হে প্রিয়, তোমার সঙ্গে কীভাবে মিলিত হবো? আমার যে পা-ও নেই, পাখা-ও নেই।

ভরা ভাদ্র মাস অত্যন্ত দুর্ভর হয়ে উঠেছে। অন্ধকার রাত কী করে কাটাই? মন্দির শূন্য, প্রিয় অন্যত্র বাস করছে। শয্যা-সর্প বারবার আমায় দংশন করছে। পাটী অবলম্বন করে আমি একাই পড়ে আছি, নিদ্রাহীন আমার চোখ; হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকে এবং মেঘ গর্জন করে আমায় ভয় দেখাচ্ছে। বিরহ কাল হয়ে আমায় গ্রাস করছে। ঝর ঝর করে মঘা বর্ষাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ঝর ঝর করে জল পড়ছে আমার দুচোখ দিয়ে। ধনী (বালা) ভরা ভাদ্রে শুকিয়ে যাচ্ছে; হে স্বামি, তুমি এখনও এসে কেন সিঞ্চন করো না? উচ্চ স্থানও জলের দ্বারা পূর্ণ, পৃথিবী ও আকাশ মিশে এক হয়ে গেছে। হে প্রিয়, যৌবনের অগাধ জলে নিমগ্ন বালাকে আশ্রয় দাও।

আশ্বিন মাস এসে গেছে, পৃথিবীতে জল হ্রাস পাচ্ছে; হে প্রিয়, বিদেশ থেকে এবার ঘরে ফিরে এসো; তোমাকে দেখে আমার কৃশ দেহ আবার ভরে উঠবে, সুতরাং তুমি তোমার উদাসীন চিত্তকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনো। অগস্ত্যের আবির্ভাবে মেঘ গর্জন করতে লাগলো। রাজারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের আয়োজন করছে। চিত্রার বন্ধু চন্দ্রমা মীন রাশিতে এসে গেছে। কোকিলা পিউ পিউ বোলে আপনার প্রিয়কে পেয়েছে; হে প্রিয়, এমন দিনে তুমিও ঘরে এসো। স্বাতীর ফোঁটা চাতকের মুখে পড়েছে। সমুদ্রে ঝিনুক

মোতীতে ভরে গেছে; হাঁস সরোবরে ফিরে এসেছে। সারস ও খঞ্জনপাখী দেখা যাচ্ছে। মাঠের চারিদিকে কাশফুল ফুটেছে। কিন্তু হে প্রিয়, তুমি বিদেশে গিয়ে এমনভাবে আমাকে ভুলে আছ যে ফিরে আসার নাম করছে না; বিরহে আমার দেহ ক্ষীণ, হে প্রিয়, তুমি এসে আমাকে বাঁচাও।

কার্তিক মাসে শারদ চন্দ্রের জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবী শীতল হয়েছে, কিন্তু আমি বিরহের আগুনে জ্বলছি। চৌদ্দ কলায় পূর্ণ চাঁদ প্রকাশমান, আমার মনে হচ্ছে, যেন পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সবই জ্বলে যাচ্ছে; শয্যা আমার দেহে ও মনে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করে। সকলের পক্ষে যে চাঁদ, চাঁদ; আমার কাছে সে রাহু। ঘরে আমার প্রিয় স্বামী নেই বলে চারিদিক অন্ধকার মনে হচ্ছে। হে নিঠুর, এখন পৃথিবীতে দীপাবলী উৎসব, অন্ততঃ এই সময়ে তুমি চলে এসো। সখীরা অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে 'কূমক' গাইছে, আর বিরহিণী আমি শুকিয়ে মরছি। যাদের প্রিয়তম কণ্ঠলগ্ন, তারা কাতিকী পূর্ণিমায় সপ্তর্ষিমণ্ডলী পূজা করে। সখীরা গান গেয়ে দীপাবলী উৎসবের আনন্দে মত্ত। আমি প্রিয় ছাড়া কি সেই খেলায় যোগ দিতে পারি?

অগ্রহায়ণ মাসে দিন ছোট হয়ে গেছে এবং রাত বড় হয়েছে। আমার দুঃখ অসহনীয়। এই দীর্ঘ রাত কী করে কাটবে? এখন তো বিরহিণী নারীর পক্ষে দিনও রাত হয়ে গেছে। আর সে বিরহে দীপশিখার ন্যায় জ্বলছে। শীতের প্রবল প্রতাপে হৃদয় কাঁপছে; প্রিয় যদি কাছে থাকে, তবেই শীতের কষ্ট দূর হয়; ঘরে ঘরে সকলে শীতবস্ত্র বের করেছে। আমার বসন-ভূষণের সাধ স্বামীর সঙ্গেই চলে গেছে। তিনি যদি আবার ফিরে আসেন, তবে আমার মনেও আবার রঙের পরশ লাগবে। শীতলতা আগুন হয়ে বিরহিণীর হৃদয় দগ্ধাচ্ছে; ধিকি ধিকি জ্বলে জ্বলে হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কান্ত কি জানে যে বিরহের আগুনে আমার জীবন-যৌবন ভস্ম হয়ে যাচ্ছে? হে ভ্রমর, হে কাক, আমার প্রিয়ের কাছে এই সংবাদ নিয়ে যা—তোমার প্রিয়া বিরহে পুড়ে গেছে।

পৌষ মাসের শীতে আমার শরীর থর থর করে কাঁপছে। এই সময়ে সূর্যও ঠাণ্ডার ভয়ে লঙ্কার দিকে (দক্ষিণে) সরে যায়। বিরহে শীত আরও বেশী মনে হচ্ছে। স্বামী কোথায় যে আমি তার বক্ষ-লগ্ন হয়ে থাকবো? পথ অফুরন্ত, কাছের বস্তুও আমি দেখতে পাই না। এই নিদারুণ শীতে চখা-চখীও রাতের বদলে দিবাভাগেই মিলিত হয়, কিন্তু আমি কিবা দিন কিবা রাত সর্বদাই

কোকিলের মত প্রিয়কে ডেকে চলেছি। রাতে একাই থাকি, সখীও কাছে থাকে না। আমি কী করে বাঁচবো?

মাঘ মাস শুরু হয়েছে। বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। এই শীতে বিরহ কাল-স্বরূপ। হে প্রিয়, তুমি এসে সূর্যের ন্যায় আমার দেহকে তপ্ত করো তা না হলে এই মাঘের শীত যাবে না। এই মাসে গাছে গাছে নবীন রস জন্মায়। আমার যৌবন-পুষ্পের রস পানকারী ভ্রমর তো তুমিই। (এখন বিরহে আমি দগ্ধ হচ্ছি ; এর পরে কি তুমি আমার শ্মশান-কৃত্য করবার জন্যেই আসবে?)

ফাল্গুনের প্রথম দিকে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগলো—দারুণ শীত কিরূপে সহ্য করি? আমার শরীর হলুদ রঙের পাতার ন্যায় হয়েছে। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, শাখাগুলি পত্রহীন। আবার গাছে গাছে নতুন পল্লব বিকশিত। কিন্তু আমার চোখে সংসার দ্বিগুণ দুঃখময়। সকলে নৃত্যগীতের দ্বারা হোলী উৎসব পালন করছে, আমার হৃদয়ে কে যেন হোলীর আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার এইভাবে দগ্ধ হওয়া যদি তার ভাল লাগে, তবে জ্বলে জ্বলে মরে যেতেও আমার ক্ষোভ নেই। দিন রাত আমি এই কথাই ভাবি, হে প্রিয়, তোমার হৃদয়ে যেন লেগে যাই। এই শরীর পুড়িয়ে ছাই করে দেবো আর বলবো—হে বায়ু, এই ছাইগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাও। আমি হয়তো এইভাবে প্রিয়ের চরণপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় পাবো।

চৈত্র মাসে বসন্তোৎসব। কিন্তু আমার কাছে সমস্ত পৃথিবী শূন্য। বিরহিণী কোকিলা পঞ্চমস্বরূপে 'পিউ পিউ' ডাকে যেন পঞ্চশর নিক্ষেপ করছে। আমের 'বোল' ধীরে ধীরে ফলে পরিণত হচ্ছে ; হে আমার প্রিয়, এখনও আমার কথা মনে করে ঘরে ফিরে এসো। বনে বনে হাজার হাজার ফুল ফুটেছে। ভ্রমর চলে এসেছে মালতীর কাছে। কিন্তু আমার কাছে ফুল কাঁটার তুল্য বেদনা-দায়ক।

বৈশাখ মাসে নিদারুণ তাপ। গায়ের কাপড় আগুন বলে মনে হচ্ছে। জ্বলন্ত সূর্য হিমালয়ের দিকে যেতে যেতে সে দিকে না গিয়ে আমার দিকে তার রথ ছুটিয়ে আসছে। হে প্রিয়, বজ্রাগ্নি জ্বলছে, তুমি এসে ছায়া দাও। তোমাকে দেখলেই এই অভাগিনী শীতল হবে। তুমি এসে আগুনের স্থানে ফুলের বাগান রচনা করো। সরোবরের ন্যায় আমার হৃদয় প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। একদিন টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যাবে। হে প্রিয়, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত পৃথিবী উত্তপ্ত। লূ চলছে। বিরহের জ্বালা তুষানলের মত বড়ই দুঃসহ। লঙ্কা দগ্ধ করে সে আগুন এসে পালঙ্ক স্পর্শ করছে। আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের মাংস শুকিয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত কাকের মত বিরহ তাকে গ্রাস করছে। প্রিয়তম, তুমি এখনও এসো। তোমার আমার কথা শুনলেই ও পালিয়ে যাবে।

উড়িয়া সাহিত্য

দোলি বারমাসী

আন্ত মগুশির হেলা, যুবাকালে কান্ত বিদেশ গলা লো;
আমকু অনাস্থা কলা।
পুষ মাসে যেউ রাতি কান্ত থিলে মোর লগান্তে কতি লো
বিহি দেলা কি বিপত্তি।
মাঘ মাসে যেউ জাড় কান্ত থিলে মোর লগান্তে কড় লো;
বিহিকলা ছাড় বাড়।
ফগুণে দোল গোবিন্দ, চাঁচেরি খেল যে বড় আনন্দ লো;
বিধাতা হোইলা মন্দ।
চইত্রে ফুটই মল্লি কহি যাইথিলে আসিবে বোলি লো
পথ চাহিঁ চাহিঁ মলি।
বৈশাখর যেউ খরা সেহি খরে কান্ত চালিবে পরা লো
নয়নুঁ বহুছি ধারা।
জেষ্ঠরে আম্ব পণস খাইতে নাহান্তি কেহিঁ মণিষ লো
সবু ত লাগুচি বিষ।
আষাড়ে মেঘ ঘড়ঘড়ি, কেতে মুঁ সহিবিডাহুক রড়ি লো
নারঙ্গ পড়ুচি ঝড়ি।
শ্রাবণে ঘোর বরষা, সবু জীবজন্তু খোজন্তি বসা লো
জীবন-কু নাহিঁ আশা।
ভোহুএ ফোটই কিআ প্রাণধনঙ্কর এড়ে নির্মায়া লো
পোড়ি যাউ তাঙ্ক দয়া।

অশ্বিনে কুআঁরী ওহ্ন পশা খেলিবাকু হেউছি মন লো
দইব কলা সপন।
কার্ত্তিক মাসটি হেলা কান্ত যে মোর বাহুড়ি নইলা লো
ঝুরি দিন ন সরিলা।

পল্লীগীতি-সঞ্চয়ন, পৃঃ ৫৫৬

বারমাসী

আঘ্য মগুশুর হেলা
একালরে কান্ত বিদেশ গলা গো বিদেশ গলা
সুনা দেহ চুনা কলা।
পুষ মাসে বড় জাড়
ধনমণি থিলে লগাস্তে কড় গো লগাস্তে কড়
বিহি কলা ছাড়বাড়।
মাঘ মাসে বড় রাতি
ধনমণি থিলে লগাস্তে ছাতি গো লগাস্তে ছাতি
সুখে পাউথান্তা রাতি।
ফগুনে দোল গোবিন্দ
ফগু খেলু থান্তে পরমানন্দ গো পরমানন্দ
ধন্য প্রভু তোর ছন্দ।
চইত্রে ফুটই মল্লী
চুআ চন্দনকু মুঁ তেজ্যা কলি গো মুঁ তেজ্যা কলি
সুনা দেহ চুনা কলি।
বৈশাখে ফুটই খরা
প্রাণধন থিলে আসন্তে পরা গো আসন্তে পরা
নয়নুঁ বহুছি ধারা।
জেষ্ঠরে পাচই আম্ব
আন্তঠাকু ধন চিটাউ দেব গো ধন চিটাউ দেব
যেতে দূরে রহিথিব।

আষাঢ়ে মেঘ ঘড়্ঘড়ি
কেমন্তে বঞ্চিবি মুঁ ছার নারী গো
জীবন যাউছি ছাড়ি।
শ্রাবণে ধারা বরষা
ধনমণি থিলে খেলন্তে পশা গো খেলন্তে পশা
বিহি কলা লোকহসা।
ভাদ্রবে ফুটই কিআ
ধনমণি ছাতি এড়ে নির্দ্দয়া গো এড়ে নির্দ্দয়া
নাহিঁ তাঙ্ক ঠারে মায়া।
আশ্বিনে কুআঁরী জহ্ন
নব যউবন হোইলা ক্ষীণ গো হোইলা ক্ষীণ
বিহি কলা হীনিমান।
কার্ত্তিক মাসটি সার
বিদেশু আসিলে মোহ নাগর গো মোহ নাগর
মো চিত্ত হইলা থির।

(কেউঝর)
পঃ গীঃ সঃ, পৃঃ ৫৪৯

পাঞ্জাবী সাহিত্য

কন্তমহেলী

দা

[বারাঁ-মাহ]

ক্রিত

সুন্দরী কর্ত্তা

গ্রন্থের নাম—

"কন্ত মহেলী"

অর্থাৎ কান্ত বিরহিণী

লেখক—ভাই বীরসিংহ

চেত

চড় পিআ চেত্তর সুহারা,
খিঠী আঁ রগন হবাঈঁ,

বাগীঁ খিড়ীআঁ বহারাঁ।
খুসীআঁ ডুল্হডুল্হ পঈআঁ।
কন্তে আন হুনাঈ
কোঈ কুচ তিআরী ;
উড় গ এ হথাঁ দে তো ত্তে,
দিল দীআঁ দিল বিচ রহী আঁ।
হাএ! চেতর মহীনে
কন্তে কীত্তী তিআরী ;
লীতে তরলে বতেরে
পেশ কোঈ ন গঈআ।
চড়্ পিআঘোড়ে তে মাহী
বনকে ঢোল সিপাহী,
তুর গয়া দূর মুহী মঁী,
মঁ্যায় বিচ ডোবাঁ দে পঈ আঁ।

বৈশাখ

রোদিআঁ আগঈ বিসাখী
সায়ঁ চাউ ন কোঈ,
ঘর ঘর সীরে তে মণ্ডে,
চুল্হে অগঁ ন পঈআ।

জেঠ

চড় পিআ জেঠ, রে কন্তা!
তপীআঁ ভো-আঁ তে রারাঁ,
অন্দর ধুখদা বিছোড়ে
ছেজে লুছ্লুছ্ রহীআঁ।
লোআঁ মঁ্যায়নু চা খল্লঁী,
জেঠা! অরজাঁ হাঁ করদী,
তত্তী বাউ দা ছোলা—
লগ্গে সাঁঈ ন দেহীআ।

হাড়

চঢ়িআ হাড়োঁ মহীনা,
বাঁরা ভট্ঠ তপেন্দে
লন্দে কারাঁ তে চিড়ীআঁ
ম্যাঁয় রধ সহিকদী পঙ্গীআঁ।
হিক দুখ অপনা রিছোড়া,
দুজে মাহী দী চিন্তা,
ঘুট সবরাঁ দে পী পী
রিচ হারয়া দে পঙ্গীআঁ।
তেরে বীরাঁ তে ছাতে
অদোঁ জান্দে নী ধুপ্‌পে,
ত্যায় নূঁ তুরদিয়াঁ নূঁ ছতরী
কাহনু ল্যায়্ ম্যাঁয়্‌ন দঙ্গীআ
সূরজ! তপীও না উথে
জিথে পীআ গিআ রে!
ল উ! ঠণ্ঢীআঁ হে রগনা
জিথে জিন্দী ম্যাঁয় গঙ্গীআ।
ছাইআ মিহরাঁ দী পাঙ্গঁ
মেরে সুহনিআ ররবা!
'মাহী-দেশ' জে গরমী
প্যায়ন্দী ল্যায় ল্যায় কে ছঙ্গীআঁ

সাবন

চড়িয়া সারন-মহীনা
সহীআঁ পীঘাঁনে পাঙ্গীআঁ।
সূলাঁ রজন কলেজে
ছিক্কী মঞ্জী তে পঙ্গীআঁ।
সহীআঁ টুম্বদীআঁ আ আ
'উঠ নী সাবেঁ নী আএ';

অনীও ! মাহী রি হুণী
দুখাঁ মার মুকঈআঁ।
টুর গিআ দেস বিদেসাঁ
ছড় কে হাই ইকল্লী ;
রো রো হোঈ হাঁ ছল্লী
জীউন্দী কাহনূ হাঁ রহীআঁ।

ভাদরোঁ

আগিআ ভাদোঁ মহীনা
রাতাঁ কালীআঁ আঈআঁ,
উঠদে বদল বী কালে,
কড়কাঁ বিজলী দীআঁ পঈআঁ।
ত্যায়নূ সাঁই দীআঁ রথাঁ
জিথে হোবেঁ তু কন্তা !
হুন পর মোড় মুহাড়াঁ
মার দরদাঁ নে লঈআঁ।

অস্সু

চড়িয়া অস্সু মহীনা—
রাতাঁ ঠরদীআঁ জারন
ধুপ্‌পাঁ ভাটীআঁ দিন নূ ;
তেরে ফিকরাঁ ম্যায়্‌ পঈআঁ
জেড়ে দেসাঁ ম্যায়্‌ মাহী
শাল্লা ধুপ্পাঁ ন পারী।
মাহীআ ! মোড় ল্যায়্‌ রাগাঁ
সারী সদকে হো রহীআঁ।
আজা আজা রে কন্তা !
আ কে দেখ পিআরী—
তেরে গম নে ন চোড়ী
রত্তী রত্ত ন রহীআ।

কত্তক

চড়িয়া কত্তক মহীনা
ঘর ঘর জগদে নে দীবে ;
রো রো ভিজদী এ অঙ্গী
তানেঁ দেঁদীআঁ স হীআঁ :
(তেরা কন্ত অনো খা
(নী পরদেস গি আ এ !
(কঙ্গআঁ হো রাঁ দে গ এ নে
'খেড়ন সারীআঁ পঙ্গআঁ।'

কিসনূ আখ সুনারাঁ,
মেরী প্রীত অরল্লী,
বিচ্ছড় জীউ হীন সকাঁ,
দিসদী জীউঁদী কিউ পঙ্গআঁ।

সুহনী রুত গুলাবী
খারন পীবন হন্ঢারন
ভাবেঁ সভ কুছ চঙ্গেরা-
মানন সারীআঁ সহীআঁ।

ম্যায়নূ ভাবে ন মূলোঁ
বাঝোঁ কন্ত পিআরে,
খিচ্চাঁ প্যান্ অগন্মী,
হুলাঁ হোলাঁ খা লঙ্গআঁ !

মঘর

রোঁ দিআঁ মঘ্ঘর আ পহুঁচা
রুত্তাঁ ঠন্ঢীআঁ অঙ্গিআঁ
ভ্রাএ লেফ তুলাঈআঁ
কন্তাঁ রালীআঁ সহীআঁ।

ঢট্ঠী কুঞ্জ জিউ তাঁরোঁ।
আপনে কন্তোঁ। রিচ্ছুনী
লুচ্ছাঁ। তড় ফাঁ তে লুচ্ছাঁ।
কূকাঁ কূক কুরল ঈ আঁ!

পোহ

আইআ পোহ দা মহীনা,
রো রো ভিজ্জেজ নী ভোচ্ছন ;
পালা ভন্নদা এ হড় হুন
জিন্দাঁ। সুসদীআঁ পঈআঁ।

কেহড়ে দেস গিউ রে!
ছড কে হাই ইকল্লী!
আপ্ কীহ পিআ করন্তাঁয়?
কোঈ সার ন পঈআ।

পোহ দীআঁ বীতন ন রাতাঁ
লম্মীআঁ পঙ্খ পহাড়ীঁ
দিস্সন চন্দন তারে,
ডর ডর উঠদীআঁ পঈআঁ।

সহীআঁ সদ্দনে আঈআঁ
'চলনী লোহী রিখাঈএ
'গম্মে রেখনী চলদে
ঠাহ ঠাহ গোলী দী ঠহীআঁ।

'পালা মার মুকাঈএ
'পোহ নূঁ খোহ কে ভজাঈএ
'সারে কূক কে চরখে
'নি ধাঁ মোড় লিঅঈ আঁ।'

কন্ত ! তেরে বিনা হায়্
স্থম্রা রেহড়া তে খেড়া,
হোইআ দেশ বিগানা,
রিছড়ী রিলপ্দী পঈ আঁ।

হাএ, কন্তা পিআরে !
ম্যাঁয় বিন ত্যায়নূঁ ম্যাঁয়্ সাঈআঁ।
কদে উদর উদাসী
দস পঈআ ন পঈআ ?

মাঘ

চড় পিআ মাঘোঁ মহীনা
স্থকে নৈন ন সাডে।
বদল ভরিআঁ দে রাঙ্
অথাঁ ভরীআঁ হী রহীআঁ।

ছাড়ে পালে নে খন্ত নে
রুওাঁ নারন দী অঙ্গ আঁ
বেলাঁ বূটিয়াঁ দী আঁ অক্থাঁ
হুন তাঁ ভরভর অঙ্গআঁ।

ঐ পর রোইআ 'রিছোড়া'
সাডা অক্থীঁ ন ভরকে,
নৈন স্থকদে ন সাডে
রোঁদী বুক্কীঁ হাঁ রহীআঁ।

স্থক স্থক হোঈ হাঁ তীল্লা,
আ কে রেখ থাঁ কন্তা !
তেরে বাছোঁ পি আরে !
হুন তাঁ স্থক্কী হী পঈআঁ।

আকে রেশ খাঁ বূটা
ছড গুলাব গিউঁ বেঁ
রহ গঈ সুক্কী এ ডালী
সারী ছম্বী ম্যাঁয়্ পঈআঁ।

ফগন

১২। কন্ত ফির পঈ সুহারী,
পহুঁচ বসন্ত পিআ রে,
আগিআ ফগ্গন মহীনা
পীলী হোই ম্যাঁয়্ পঈআঁ।

সহীআঁ ফাগ রচাএ
সানূঁ সদ্দনে আঈআঁ
মেহনে দেঁদীআঁ তানে
নালে লাড লডঈআঁ ;

'উঠ কে চল পউ খাঁ ভ্যায়নী !
'দেখন কান হী টুর পউ'
'ভলা দিল পরচীরী
'ধ্যান হোর থে পঈআ।'

হাই কন্ত পিআরে !
হাই জিন্দ দী এ জিন্দে !
হাএ কিথে গিয়া এঁ ?
কোঈ দস্সনা পঈআ।

ফগ্গণ বীতন তে আইআ
সাঁঈঁ সোই ন আঈ ;
সখর লখীআঁ সাঈআঁ !
সখর হোঈ ম্যাঁয়্ পঈআঁ।

হোশ চল্লীউ সাঙ্গীআঁ !
তেরে মগরে হী টুগুন,
সথর লখীআঁ যাঙ্গীআঁ ।
সথর হোই ম্যাঁয় পঙ্গীআঁ ।

ফগন দা অন্ত

বৈঠা বৌন সির্হানে
হথ মথে তে ধরিআ
জিন্দ কুমকে এ লান্দা ।
জীউ জীউ রব্বা ম্যাঁয় পঙ্গীআঁ ।

ছুক ছুক কৌন এ রেঁহদা ?
এহ তাঁ নৈন পিআরে,
ইহ তাঁ মাহী দীআঁ ছাতাঁ,
ছাতাঁ মাহী দীআঁ পঙ্গীআঁ ।

আহো আহোণী সহীউ !
আ গিআ মাহী নী মেরা ।
তেরে বাঝোঁ ম্যাঁয় মাহী !
ম্যাঁয় তাঁ ম্যাঁয় হী ন রহীআঁ ॥

ভাবানুবাদ :—

চৈত্র

সুমধুর চৈত্রমাস এসেছে ; মিষ্টি হাওয়া বইছে। বাগানে যেন খুসী উছলে পড়ছে। প্রিয় এসে বললে—আমার যাত্রার আয়োজন হয়েছে ? হায়, চৈত্রমাসে কান্ত চলে গেল, আমি অনেক প্রার্থনা করেছি, কোন কথাই সে শুনলো না। আমার মনের কথা মনেই রইল।

বৈশাখ

বৈশাখ এলো। ঘরে ঘরে খীর ও মণ্ডা খাওয়ার ধুম চলেছে, কিন্তু আমার ঘরে আগুন জলেনি।

জ্যৈষ্ঠ

হে প্রিয়, জ্যৈষ্ঠ সমাগত। বাতাস ও ভূমি উত্তপ্ত। বিরহে আমার হৃদয় দগ্ধ। শয্যা শূন্য। 'লু' আমাকে দগ্ধ করছে। কিন্তু হে জ্যৈষ্ঠ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—আমার প্রিয় যেখানে আছে, সেখানে তপ্ত হাওয়া পাঠিও না।

আষাঢ়

আষাঢ় মাসে মনে হয়, বারোটা আগুনের ভাটি জ্বলছে। পাখীরাও শ্রান্ত। একে তো আমার বিরহজনিত দুঃখ, তার উপর প্রিয়ের চিন্তা। এমন অগ্নিতুল্য রোদের মধ্যে তুমি একটি ছাতা নিয়ে যাওনি কেন? হে সূর্য, আমার প্রিয় যেখানে গিয়েছে, সেখানে উত্তাপ দিও না। লু! আমার প্রিয়ের বাসভূমিতে তুমি শীতল হ'য়ে যেও।

শ্রাবণ

শ্রাবণ মাসে সখীরা এসে বলছে—'ওঠো সখী, শ্রাবণ এসে গেছে।' কিন্তু হে আমার অন্ধ প্রিয়, তুমি কি আমার দুঃখ দেখতে পাও না? তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছো, আমার বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন?

ভাদ্র

ভাদ্র মাসের কালো রাত্রি এসে গেছে। কৃষ্ণ মেঘ আকাশে উড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং সঙ্গে মেঘের কড়্ কড়্ আওয়াজ। তোমার আসার পথের দিকে তাকিয়ে দীপ জ্বেলে রেখেছি, কিন্তু তুমি এপথে আসছো না।

আশ্বিন

আশ্বিন মাসে দিনে প্রখর রোদ, তোমার গায়ে যেন রোদ না লাগে। হে প্রিয়, তুমি চলে এসো। তুমি এসে দেখ, তোমার বিরহজনিত ব্যথা তোমার প্রিয়কে কীভাবে নিষ্পেষিত করছে।

কার্তিক

কার্তিক মাসে ঘরে ঘরে দীপ জ্বলছে। কেঁদে কেঁদে আমার অঙ্গ ভিজে গেল। সখীরা এসে বলছে—'সত্যই, তোর স্বামী বড় অদ্ভুত।' আমি কার

মুখ চাপা দেবো? সত্যই তো আমার পতি অসাধারণ। সুন্দর ঋতুতে সকলেই আনন্দে মত্ত, আমার কিন্তু স্বামীকে ছাড়া কিছুই ভাল লাগছে না।

অগ্রহায়ণ

শীতের কাল অগ্রহায়ণ এলো। তুলো দিয়ে সকলে লেপ তৈরী করছে। সখীরা সকলেই কান্ত-সহিতা, কিন্তু দলের একটি পাখী কান্ত-বিযুক্তা।

পৌষ

পৌষমাসে কেঁদে কেঁদে আমার ওড়না ভিজে গেল। খুবই শীত পড়েছে। আমাকে একা ফেলে তুমি কোন্ দেশে গেলে? পৌষের দীর্ঘ রাত কাটতে চায় না। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই দেখা যায় না। সখীরা আমাকে ডাকতে এসে বলছে—'চলনা রে, 'লোহী' (পৌষ-উৎসব) দেখে আসি।' কিন্তু হে প্রিয়, তুমি না থাকাতে দেশও আমার কাছে বিদেশ মনে হচ্ছে। হায় কান্ত, তোমার খবর না পেয়ে আমার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত।

মাঘ

মাঘ মাসে আমার চোখ আর শুকোচ্ছে না। আমার চোখে যেন বর্ষার মেঘ এসে জমেছে। তুমি এসে দেখ, যাকে সুন্দর গোলাপের মত রেখে গিয়েছিলে, সে এখন শুকনো একখানি কাঠিতে পরিণত হয়েছে।

ফাল্গুন

ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মধুর বসন্ত সমাগত। সখীরা ফাগ খেলার জন্য আমাকে ডাকতে আসে—"বোন, চল আমাদের সঙ্গে," হায় প্রিয়, হায় আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি কোথায় গেলে? কোন খবরই তোমার পাচ্ছি না।

ফাল্গুনের শেষে

কে আমার শিয়রে বসে আমার হাত তুলে ধরেছে? এ কে? এই তো আমার প্রিয়ের চোখের চাহনি। ওগো আমার সখীরা, ভাখ এসে, আমার প্রিয় এসে গেছে। হে প্রিয়, তোমাকে ছাড়া আমি আর আমি ছিলাম না।

আসামী সাহিত্যে

Asamiya Sahityar Chaneki

Vol. I

Hem Chandra Goswami

বারমাহী গীত

(ক) মধুমতীর গীত

অঘোণর মাহতে নাকাটিলা পাত।
খাবলৈ নাপালা প্রভু নবান ধানর ভাত॥
আঘোণর মাহতে নারীর উত্তপতি।
হাতত তম্বুরা লৈ নামিল সরস্বতী॥
পুহর মাহত পূরণর জীয়ারী
স্বামী সবে ভক্তি করে ভাগ্যবতী নারী॥
মাঘর মাহতে ধরমর তিথি।
ডাক দালিম শ্রীফল খাইতে নেদে বিধি॥
তুলি পারে গারু পারে আতি বিপরিত।
তাতে বহি মধুমতী জুরিলেক গীত॥
তুলি পারে গারু পারে সোণর সিংহাসন।
তাতে বহি মধুমতী জুরিলা ক্রন্দন॥
ফাগুণর মাহত ফাল্গুর রাতরি।
দেউলর ওপরত দেউল তুলিয়া মগরি॥
তার ওপরত নাগপাশ জরি।
ধরণীত পরি কান্দে সুমরি সুমরি॥
সকল সাউদে ফাগু মারে রান্ধি ভাত খাই।
মই নারী অভাগিনী থাকোঁ পরর মুখ চাই॥
বনর বহুরা পখী সিও থাকে জোরে।
মই অভাগিনী থাকো অকলশরে॥

বনর বহুয়া পখী সিও বান্ধে বাহা ঘর।
মই নারী অভাগিনী থাকো অকলশর ॥
চৈতর মাহত পকি সবে বেল।
সেই বেল লৈ স্বামী বণিজক গেল ॥
বণিজক গৈ স্বামী কিবা পালে নিধি।
ডাক দালিম শ্রীফল থাইতে নেদে বিধি ॥
বৈহাগর মাহত ডাউকী কান্দয়।
ডাউকীর কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয় ॥
বৈহাগর মাহত কুলিয়ে করে বার।
কুলির কান্দন শুনি হুজুরাই গায় ॥
জেঠর মাহত আবৈ ধানর বারা।
ডাউকীর কান্দন শুনি শরীর ভৈলা জ্বরা ॥
জেঠর মাহতে জেঠর বারে থর।
যাকে বোলো আপোন অপোন সেয়ে হয় পর ॥
আষাঢ়র মাহত আহরে আহু ধান।
নদী নলা ভাহি যায় সিও এটা বান ॥
খেতিয়ার লোকে পারিছে কঠিয়া।
এরি গল প্রাণ স্বামী আহির কেতিয়া ॥
আহকে রহকে স্বামী দেখোঁ চান্দ মুখ।
হেরা গুচক মোর জনমর দুখ ॥
শাওনর মাহত য়োবনর দিন।
খাব্র নাপালে পুরুষর রস হয় হীন ॥
কিবা থালো কিবা ললো কিবা করে মনে।
গলত কটারি দি তেজিম পরাণে ॥
ভাদর মাহত শীতর খরালি।
নদীনলা শুকাই গল পরিল ঢৌবা বালি ॥
কোঢ়া বারে কুটী বারে বারে রাজ হাঁহ।
হেলায় খোৱালো মই বারিষা ছয় মাহ ॥

আহিনর মাহত তুলসীর গোয়ে চাতি।
বিধবা ব্রাহ্মণী পূজে হাতে লৈয়া বাতি॥
আহিনর মাহতে দেবীর অষ্টমী।
হাঁহ কাটে পাঠা কাটে পার জাকে জাক।
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক॥
কাতির মাহত ওলাল ন শালীর থোর।
বার মাহর তের গীত গাই কৈলো ওর॥
বারে মাহর তের গীত লওরে গণিয়া।
তাকে বর্ণাই কান্দে মধুমতী কন্যা॥
বার মাহর তের গীত মাহে মাহে তিথি।
গাওঁ তার খণ্ডে পাপ, শুনু তার মুকুতি॥

কন্যা বারমাহী

আঘোণর মাহতে কন্যা সংসারে নবান ধান।
কতেক খাইতে মধু কতেক পুরাণ॥
যার সঙ্গে প্রিয়া আছে রান্ধি ভাত খায়।
আমার সঙ্গে প্রিয়া নাই (থাকিম) পরের মুখ চাই॥
আগ বাড়ি লোৱা কন্যা সাতসরি হার।
দুই বাহুত তুলি দিম সোণার ঝম্প টাব॥
কাণ চাই দিম কন্যা হীরার মদন কড়ি।
ককাল চাই দিম কন্যা কাঞ্চন পাতর সারি॥
ভরি চাই দিম কন্যা ভরিরে নেপুর।
কপাল চাই দিম কন্যা সিথার সেন্দুর॥
পৌষর মাসতে কন্যা পুষ্পে অধিকারী।
স্বামীত ভকতি করে ভাগ্যবতী নারী॥
ভাগ্যবতী নারী যিতো সাফল জীবন।
স্বামী হেন ধন নাই ই তিনি ভুবন॥

মাঘর মাসতে কন্যার হৈল চারি মাস।
তিনি দেশর সাউদ আহি লগাইলা মাত॥
চাউল দেওঁ পাত্তিল দেওঁ রান্ধি খোয়াঁ ভাত।
ভাল ভাল দাসী দেওঁ চুরা ফেলাইবাক।
টৌ দেওঁ জাস্তি দেওঁ বালুত মাজিয়া,
ভোগ ধানর চাউল দেওঁ দুধত পখালিয়া।
ভাত কঙ্গালী নহওঁ কন্যা ভাত রান্ধি খাম,
ধনর কঙ্গালী নহওঁ কন্যা ধন লৈয়া যাম।
ফাগুনর মাসতে কন্যা বসন্তরে কাল,
জাঁই যুতি ফুলে ফুল বেলি তরুয়াল।
জাঁই যুতি ফুটে ফুল তপত নয়ান,
জাঁই যুতি ফুলে ফুল খোপাতে ফুলাম।
ফাগুণর মাসতে পাই মনে বরি দুখ,
স্বামীর কটিত ভুকা কেনে ভথুরা কুকুর।
কুকুর ভুকিলেরে গিরস্থে পাইব সারি,
তেখনে বুলিব আমাক পুরুষবধা নারী।
চৈত্তর মাসতে কন্যা চতুর দিশে মন ;
বিলাওরে বিলাওরে কন্যা নয়ান যৌবন।
খাওরে কন্যা কর্পূর তাম্বুল বাঢ়োক পিরীতি।
গুচাও মনর কৈটব মাগিছোঁ স্বরতি।
কি বিলাইবো কি বিলাইবো সাউদর নন্দন,
কাঠেরে বান্ধিছো হিয়া হুতোলাইবো মন।
শাশুরী দুলালী কন্যা স্বামীত পরাণ ;
পর পুরুষক দেখোঁ বাপ ভাই সমান।
সাউদ বোলোঁ সদাগর বোলোঁ ভাই তোমাকে,
ধরমক চিন্তি তুমি যোয়াঁ রাজপথে।
বৈসাখর মাসতে কন্যা কন্যা পদুমিনী,
চন্দনে চিটিকা দিয়া ভৃঙ্গারর পানী।

ভৃঙ্গারর পানী নোহে উত্তম গঙ্গাজল,
বাড়ি ভরি আছে আমার ডাব নারিকেল,
লারিতে চারিতে দাসীর ককাল দুখাল।
গোহাল ভরি আছে আমার সাত পাঞ্চ গাই,
দৈ দুধ ঘৃত মধু ঘিণতে না খাই॥
সাউদ বোলোঁ সদাগর বোলোঁ ভাই তোমাকে,
ধরমক চিন্তি তুমি যোঁরা রাজপথে।
জেঠর মাসতে কন্যা ভরিয়া উঠে বান,
কোন দেশর সাউদ তুমি কিবা তোমার নাম।
কোন দেশে থাকা সাউদ কোন দেশে ঘর,
কি নাম তোমার মার আবুর কি নাম বাপর।
বাপর নাম বিস্মরণ মায়র নাম রায়াল,
জীর গুরু দিছে নাম নাম তার গারঁর।
আষাঢ় মাসতে কন্যা আহরুরা রাতি,
তোমার স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চন পুরুর ভাথি।
না যাইছে না যাইছে কাটা আমার টিকর পতি,
আউলিল হয় মাথার চুলি ছিঙ্গিল হয় বজ্রমুঠি।
হাতর দুই মুঠি শাঁখা ভাঙ্গি হল হয় চুর;
মোলান পরিল হয় মোর কপালর সিন্দুর।
শাওনর মাসতে কন্যা শাওনিয়া রাতি,
আজি রাতি কন্যা মই ভুঞ্জিবো স্বরতি।
আজি রাতি চোর মই যাকে লাগল পাওঁ,
হাতে গলে বান্ধি তাকে রাজঘরে পথাওঁ।
চারি ফালে রাখি থম পহরী চারিটি,
দুরার মুখত বান্ধি থম মত্ত গজহাতী।
শিথানে পৈথানে লগাম ঘৃতর পাঞ্চ বাতি।
তীক্ষ্ণ খাণ্ডা হাতে ধরি জাগিম চৌপর রাতি॥

দাবরি মারিব কন্যা মত্ত গজ হাতী,
থাপ দি হুমাম কন্যা ন্বত্তর পাঞ্চ বাত্তি।
চটকি মারিব কন্যা ই পালি প্রহরী,
তীক্ষ্ণ খাণ্ডা ভাঙ্গিম কন্যা মই টিপামারি।
ভাদর মাসতে কন্যা মাসর পরিল শেষ,
হাসি খেলি বিদায় দিয়া যাওঁ নিজ দেশ।
তুমি হলা ভিন পুরুষ আমি ভিন নারী,
বাপর শকতি নাই বিদায় দিতে পারি।
আমি ভিন নারী সাউদ না ভাবিবি আন,
আপোনার দোষে সাউদ হারাইবি প্রাণ।
বাপ বোলো ভাই বোলো সাউদ তোমাকে,
ধরমক চিন্তি তুমি যোরা রাজপথে।
আহিনর মাহতে কন্যা নিরমিল রাত্তি,
পর পুরুষ নো হোঁ কন্যা তোর টিকর পতি।
পর পুরুষ নো হোঁ যদি আপুন ঈশ্বরে,
খানিক রহিয়া থাকা ডিঙ্গার উপরে।
সোনার বাটায় গুরা পান জারি ভরা পানী,
ধীরে ধীরে গেল কন্যা বাপর বিগ্যমানি।
কার খাইছা গুরা পান কাক দিছা বিয়া,
তুই মুই তোমার জোঁরাই লওরে চিনিয়া।
সোনার বাটায় গুয়া পান জারিভরা পানী,
ধীরে ধীরে আসিল শ্বশুর জোঁরাই বিগ্যমানি।
কোন চহরে থাকা বাপু কোন চহরে ঘর;
আইর নাম কমল মালা বাপা ধনেশ্বর।
শিশু কালত বিয়া করাইছো মাণিক সদাগর,
নানান আড়ম্বরে আসিছিলোঁ তোমার ঘর।
ব্রাহ্মণ সজ্জনক আনি জিজ্ঞাস করি চারা,
প্রথম কাতিমাসে আমাক দিছাঁ বিয়া।

প্রদীপ লগাই কন্যা ঘাটর কূলে যাই,
স্বামী স্বামী বুলি কন্যা চরণ ধুৱাই।
চরণ ধুৱাই কন্যা মাগি লৈয়া বর,
স্বামীক বেড়িয়া নিলা মন্দির ভিতর।
কাতির মাসতে কন্যা কাতিয়ান ধানর থোর,
বার মাসর তের গীত গাইয়া না পাও ওর।
বার মাসর তের গীত লওরে গণিয়া,
ইতো গীত গাইছে কোন জয়ধন বনিয়া।
জয়ধন বনিয়া-নোহে শ্রীধরর বাপ।
গাওঁ তার মুকুতি হোরে শুনার খণ্ডে পাপ।

মধুমতীর গীত

অনুবাদ :—

অগ্রহায়ণ মাসে পাতাকাটা হ'লো না; এবং প্রভু নূতন ধানের ভাত খেতে পেলো না। অগ্রহায়ণ মাসে নারীর উৎপত্তি। তম্বুরাহস্তে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটলো।

পৌষমাসে প্রবীণ ভাগ্যবতী নারীরা সকলে স্বামীকে ভক্তি করে।

মাঘ মাসে ধর্মের তিথি। বিধি ডাক দালিম ও শ্রীফল খেতে দেয় না। তোষক ও বালিশ পেতে তার উপর বসে মধুমতী গান করে। তোষক পেতে, বালিশ পেতে, সোনার সিংহাসনের উপর বসে মধুমতী কাঁদে।

ফাল্গুন মাসের রাতে দেউলের উপর দেউল সাজিয়ে চিত্রবিচিত্র বস্ত্র দিয়ে চিত্রিত করে। তার উপরে দেয় নাগপাশ রজ্জু। ধরণীতলে লুটিয়ে পড়ে কন্যা সেই স্মৃতি মনে পড়ে কাঁদে। সকল বণিক ফাকু মারে, খায়; শুধু আমি অভাগিনী পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। বনের পাখী পর্যন্ত জোড় বেঁধে থাকে, শুধু আমি একা থাকি। বনের পাখীও বাসা বাঁধে, শুধু আমি একা থাকি।

চৈত্র মাসে বেল পেকে ঝরে পড়ে। সেই বেল সঙ্গে করে স্বামী বাণিজ্য করতে গেল। বাণিজ্য করতে গিয়ে স্বামী কি পেল? ডাক দালিম, শ্রীফল, বিধি খেতে দিল না।

বৈশাখ মাসে ডাউক কাঁদে। আমার হৃদয়ে ব্যথা জাগে। বৈশাখ মাসে কোকিল ডাকে; এবং কোকিলের ক্রন্দন শুনে আমি অস্বস্তি বোধ করি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ধানের সারা হয়। ডাউকের কান্না শুনে গায়ে জ্বর আসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড খরা। যাকেই আপন ব'লে ভাবি, সে-ই পর হয়ে পড়ে।

আষাঢ় মাসে আউস ধান কাটে। নদীনালা বানে ভেসে যায়। চাষীরা বীজ ছড়ায়। আমার প্রাণ-স্বামী আমায় ফেলে গেছে; কখন আসবে? আমার স্বামী আসুক ও থাকুক। তাঁর চাঁদমুখ দেখে আমার জন্মের দুঃখ ঘুচুক।

শ্রাবণ মাসে চারা রোয়ার সময়। খেতে না পেলে পুরুষেরা রসহীন হয়ে পড়ে। কি-ই বা খেলাম, কি-ই বা পেলাম, মন যেন কেমন করে। ইচ্ছে করে, গলায় ছুরি দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করি।

ভাদ্র মাসে শীতের শুষ্কতা দেখা দেয়। নদীনালা সব শুকিয়ে যায়—বালুময় হয়। কোড়ার (a kind of aquatic bird) ডাক শোনা যায়; রাজহংসের বংশবৃদ্ধি হয়, আর আমি বর্ষার ছমাস যেমন তেমন করে কাটালাম।

আশ্বিন মাসে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে বিধবা ব্রাহ্মণী পূজো করে। আশ্বিন মাসে দেবীর অষ্টমী—লোকে হাঁস, পাঁঠা আর পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে বলি দেয়। প্রাণ-স্বামী যেখানে আছে, যেখানে সুখে থাক।

কার্ত্তিক মাসে শালি ধানের শীষ বেরুল। বার মাসের তের গান গেয়ে শেষ করলাম। সকলে বার মাসের তের গান শুনে নাও। কন্যা মধুমতী তাকে বর্ণনা করে কাঁদে। বার মাসের তের গান, মাসে মাসে পার্বণ যে গায়, তার পাপ খণ্ডন হয়; আর যে শোনে তার মুক্তিলাভ হয়।

কন্যাবারমাসী

অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ধান পাওয়া যায়। কতক ধান খেতে ভাল, কতক মন্দ। যার সঙ্গে প্রিয়া আছে, সে ভাত রান্না করে খায়, আর আমার সঙ্গে প্রিয়া নাই, কাজেই আমি পরের মুখের দিকে তাকাই। বিদেশী পুরুষ বা বণিক বললো,—'কন্যা, তুমি এগিয়ে এসে সাতমুড়ি হার নাও। আমি তোমার বাহুর

মাপে দিব সোনার আর কানের মাপে দিব হীরার অলংকার; কোমরের মাপে দিব কাঞ্চন পাতার শাড়ী, পায়ে দিব নূপুর, আর সিঁথিতে দিব সিঁদুর।'

পৌষমাসে কন্যা পুষ্পের অধিকারী। ভাগ্যবতী নারী স্বামীকে ভক্তি করে। ভাগ্যবতী নারীর জীবন সার্থক। এই তিন ভুবনে স্বামীসম ধন নাই।

মাঘ মাসে কন্যার চার মাস হ'লো। তিন দেশের বণিক খবর করতে এল। ভাল করে রান্না-বান্না করে আমায় দিবে, আর ভাল ভাল দাসীরা খাওয়ার পরে পরিষ্কার করবে। রান্নার সকল আয়োজন করে দেবো, ভোগ ধানের চাল দেবো, দুধ দেবো। কন্যা, তুমি রান্না করে খাও। আমি ভাতের কাঙাল নই। ধনেরও কাঙাল নই। (বণিকের উক্তি)

ফাল্গুনের সঙ্গেই বসন্ত আসে। সকল রকমের ফুল ফোটে। মনে বড় দুঃখ হয়, স্বামীর বিরহের ক্ষুধায় ক্ষুধিত হই। কুকুর ভুকলে গৃহস্থ জেগে উঠবে, আর তখনই আমাকে পুরুষ-বধা নারী বলে হাসবে।

বণিকের উক্তি—'চৈত্র মাসে মন চতুর্দিকে যায়। কন্যা, নিজের যৌবন বিলিয়ে দাও। তুমি কর্পূর তাম্বুল খাও, পীরিতি বাড়ুক। মনের বাঁধ খুলে দাও।' কন্যা উত্তর দিল—'কি বিলিয়ে দেবো, বণিক-নন্দন? কাঠ দিয়ে হৃদয় বেঁধেছি—মন চঞ্চল ক'রব না।'

কন্যার উক্তি—'শাশুড়ীর দুলালী কন্যা স্বামিগত প্রাণ—পরপুরুষকে বাপ-ভাই-এর মত দেখি। বণিক, তুমি আমার ভাই—ধর্মচিন্তা করে তুমি রাজপথে চলে যাও।'

বণিকের উক্তি—'বৈশাখ মাসে কন্যা পদ্মিনী—ভৃঙ্গারে করে আমাকে জল দাও।'

কন্যার উক্তি—'ভৃঙ্গারের জল উত্তম গঙ্গাজল নয়। আমার ঘরে ডাব নারকেল আছে। কিন্তু আমি নড়চড় করতে পারি না, আমার কোমরে ব্যথা হয়েছে। সাত পাঁচ অর্থাৎ অনেকগুলি গাই (গরু) আছে। সেজন্যে ঘরে দই, দুধ, ঘৃতাদিও আছে। কিন্তু বণিক, তুমি চলে যাও। তোমাকে ভাই বলে ডেকেছি, ধর্মের নামে তুমি রাজপথে চলে যাও।

কন্যার উক্তি—'জ্যৈষ্ঠমাসে বান আসে। কিন্তু তুমি কে বণিক? তোমার দেশ কোথায়? তোমার মা বাবার নাম কি? বণিকের উক্তি—'আমার বাবার নাম বিস্মরণ—মার নাম রাখাল।'

কিন্তু কন্যা, আষাঢ় মাসে তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কন্যা বলছে—'না, তা কখন হ'তে পারে না। তাই যদি হ'তো, তা'হলে আমার হাতের শাঁখা, সিঁথির সিঁদুর কিছুই ঠিক জায়গায় থাকতো না।'

বণিকের উক্তি—'আজ শ্রাবণের রাত, আমি তোমাকে আপন করে পেতে চাই।' কন্যার উক্তি—'আজ রাতে আমি কাউকে দেখলেই ধরে রাজঘরে পাঠাবো। চারিদিকে প্রহরী বসাবো, দরজার সামনে রাখবো মত্ত হাতী। মাথার কাছে এবং পায়ের কাছে ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাবো, আর হাতে তরবারি নিয়ে সারারাত জেগে থাকবো।' বণিকের উক্তি—'মত্ত হাতীকে আমি বধ ক'রবো, প্রদীপ নিবিয়ে দেবো, প্রহরীকে হত্যা করবো এবং তরবারি ভেঙে ফেলবো।'

বণিকের উক্তি—'কন্যা, ভাদ্র মাসের শেষ, তুমি হেসে খেলে বিদায় দিয়ে নিজ দেশে চলে যাও।' কন্যার উক্তি—'তুমি ভিন-পুরুষ, আমি ভিন-নারী, কাজেই কেমন করে বিদায় দিতে পারি? হে বণিক, তুমি আমাকে ভিন-নারী ছাড়া অন্য রকমে ভেবো না। আপনার দোষে তুমি প্রাণ হারাবে। হে বণিক, তোমাকে আমি বাপ ও ভাই বলেছি; কাজেই তুমি ধর্মচিন্তা করে রাজপথে চলে যাও।'

বণিকের উক্তি—'কন্যা, আশ্বিন মাসের নির্মল রাত। আমি পর-পুরুষ নই। তোমার প্রিয় পতি।' কন্যার উক্তি—'তুমি যদি পর-পুরুষের পরিবর্তে আপনজন হ'য়ে থাকো, তাহ'লে ডিঙ্গার উপর কিছুক্ষণ থাকো। সোনার বাটায় গুয়া পান ও জারি ভরা জল নিয়ে কন্যা ধীরে ধীরে বাপের কাছে গেল। কন্যা বাপকে বললো, কার সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দিয়েছো; তুমি গিয়ে তোমার জামাইকে চিনে নাও।

সোনার বাটায় গুয়া পান ও জারিভরা জল নিয়ে ধীরে ধীরে শ্বশুর জামাইয়ের কাছে উপস্থিত হ'লো। বণিক, তুমি কোন্ শহরে থাকো? তোমার ঘর কোথায়? বণিক উত্তর করলো, আমার মাতার নাম কমলমালা, বাবার নাম ধনেশ্বর। শিশুকালে মাণিক সওদাগরের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ করিয়েছো, নানা আড়ম্বরে তোমার ঘরে এসেছিলাম। ব্রাহ্মণ সজ্জনকে এ বার্তা জিজ্ঞাসা কর। প্রথম কার্ত্তিক মাসে বিয়ে দিয়েছো। প্রদীপ ধরিয়ে কন্যা ঘাটের কূলে গিয়ে স্বামী বলে চরণ ধরেছে এবং এইভাবে স্বামীকে মন্দিরের ভিতর গ্রহণ করলো।

কাত্তিক মাসে কাতিয়ান ধানের খোঁড় হয়েছে। কন্যা, বারমাসের তের গীত শেষ হয় না। বারমাসের তের গীত গণনা করে নাও। জয়ধন বেণিয়া গীত গাইছে। জয়ধন বেণিয়া নয়, শ্রীধরের বাপ। তাঁর মুক্তি গাও, তাহলে পাপ খণ্ডিত হবে।

গুজরাতী বারমাস্যা

["নেমিনাথ চতুষ্পাদিকা"
রচনাকাল—ত্রয়োদশ শতক
লেখক—অজ্ঞাত]

ভাদ্র মাসের বর্ণনা

ভাদ্র বি ভরিয়া সর পিক্‌খেবি সকরুণ রোঅই রাজল দেবি।
হা একলড়ী মই নিরধার কিম উবেখিসি করুণা সার॥

ভণই সখী রাজল মন রোই নীঠুরু নেমি ন অপ্পণু হোই।
সিঞ্চিয় তরুবর পরিপলবন্তি গিরিবর পুণ কড ডেরা হুঁতি॥

সাচউ সখি বরি গিরি ভিজ্জন্তি কিমই ন ভিজ্জই সামলঁকান্তি।
ঘন বরিসন্তই সর ফুট্টন্তি সায়রু পুণ ঘণুওহ ডুলিন্তি॥

ভাবানুবাদ:—ভাদ্রমাসে জলাশয় জলপূর্ণ দেখে রাজলা (নায়িকা) কেঁদে বলছে: "হে করুণাময়! তুমি আমাকে একাকিনী ও অসহায় ফেলে গেছ কেন?" সখী বলছে: "রাজল, তুমি কেঁদো না, নেমিনাথ নিষ্ঠুর, সে কখনও তোমার হবে না। তা না হ'লে, গাছে জল দিয়ে কেহ তাতে আগুন লাগায়? তোমাকে সে পর্বতের মাথায় তুলে অবশেষে ছুঁড়ে দিয়েছে।" রাজলা বলছে: "সখী, তুমি ঠিকই বলেছ। এই বর্ষায় জলাশয় থৈ থৈ করছে, সমুদ্র পরিপূর্ণ, পর্বত পর্যন্ত সিক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই শ্যামল কান্তির হৃদয় গলিত হচ্ছে না।"

তামিল সাহিত্যে বারমাসী

বিভিন্ন গ্রন্থের নাম ও
শ্লোক সংখ্যা :—

১। কালোড্ড্ ওয়ন্দ কমঞ্জুল্ মামড়ৈ
আরলি ইলৈয়ো নিয়ে পেয়্বিচৈ
ই মৈয়মুম্ তুলকুম্ পন্বিনৈ
তু নৈয়্লির্ অলিয়্র্ পেণ্ডির্ ইত্তুএব নে !

'কুরুন্তোকৈ' শ্লোক—১৫৮

পরুবঞ্চেয়্ত করুবি মামড়ৈ
চাণ্ড্র্প্ পুরৈবতো অণ্ড্ ...
কনীয়া নেঞ্চুত্ তাহুম্
ইনিয় অল্লনিন্ ইডিনৰিল্ কুরলে।

'নাট্রিনৈ' শ্লোক—২৩৮

নড্ঙ্গল্ আনা নেঞ্জমোড্ ইডুম্পৈ
ইয়াঙ্গনম্ তঙ্গুবেন্ মট্রে...
মারি ইর্রিই মাণ্ডওাল্ মড়ৈয়ে।

ঐ শ্লোক—৩৮১

২। কামর বেনিল্
বেয়্লিল্রির্ পুরৈয়্যুম্ বীদদৈ মরা অত্তুক্
কুয়্লিড়ু পূচল্ এম্মোড়ু কেট্টপ
রুরুরেম্ এণ্ড পরুরম্ আণ্ডৈ
ইল্লৈ কোল্এন মেল্ল নোক্কী
নিনৈত্তনম্ ইরুন্দন মাক।

'অকনানুরু' শ্লোক—৩১৭

৩। এায়্রিরু এাণ্ডু 'কাত্তির্ মরুঙ্গিণ্ড্
এল্লিয়ুম্ পুরী কোর্ডিয়িন্ পুলম্ পডৈন্ তণ্ডে
ন্নারলুম্ বয়িন্ দোরুম্ পরকুম্ চেবলুম্
নকৈবায়ক্ কোলি-ইনগুতোরুম্ ন্নিলিকুম্
পয়ারৈ ন্নেম্পিন্ পড়ুকিনৈ ইরুন্দ
কুয়াঅল্ কুকৈয়্যুম্ ইয়া অ ই চৈকুম্

'নাট্রিনৈ' শ্লোক—২১৮

আনা নোয়ড ব্রুন্দি ইন্নুম্ — 'নাটি নৈ
তমিয়েন্ কেড্কুরেন্ কোল্লো — শ্লোক—
পরিয়(বৈপ্) পেয়্যে অণ্ড্রীর্ কুরলে। — ২১৮

মণ্ড্রপ্ পেয়্যে বাক্সুমডর্ কুডম্ পৈত্
তুনৈপুনর্ অণ্ড্রীল্ উয়বুক্কুরল্ কেট্টোরুম্ — 'নাট্রি নৈ'
তুপ্লাক্ কণ্ণল্ তুয়রডচ্ চা অয়্ — শ্লোক—
নম্বয়িন্ বরুন্দুম্ ননন্নুদল্ এনপত্ন — ৩০৩
উণ্ডুকোল বাড়ী তোড়ী···
নেডুনির্চ চেরপ্পন্ তন্ নেঞ্চৎ তানে।

পলুচেরিন্ তন্ন পল্কতির্ ই ডৈয়িডৈপ্ — 'নাটি নৈ'
পাল্মুকন্ তন্ন পণ্ডবেন্ নিলবিন্ — শ্লোক—
৪। মাল্বিডর্ অরিয়া নিরৈয়ুরু মতিয়ম্ — ১৯৬
চাল্পুম্ চেন্মৈয়ুম্ উডৈয়ে আতলিন্
নিন্করন্দু উরৈয়ুম্ উলকম্ ইন্মৈয়িন্
এন্করন্দু উরৈরোর্ উল্বড়ী কাট্টায়্
নরকবিন্ ইড়ন্দবেন্ তোল্বোর্চা অয়্চ্
চিরুকুপ্ চিরুকুপ্ চেরিই
অরিকরি পোয়ত্তলিন্ আকুমো অতুবে।

৫। পেরুন্দন্ ওয়াডৈ
নিনক্কুত্ তিতরিন্ তণ্ড্রো ইলমে ·· — 'নাট্রি নৈ
ইয়ারুমিল্ ওরুচিরৈ ইরুন্দু
পেরঞর্ উরুবিয়ৈ ব্রুত্তা তিমে।

কুরাল থেকে উদ্ধৃত

মালৈয়ো অল্লৈ মনন্দার্ উয়ির্ উন্নুম্ — শ্লোক—
বেলৈনি ওয়াড়ী পোড়ুদু। — ১২২১

পুন্‌কন্নৈ ওয়াড়ী মরুলমালৈ এম্‌কেল্‌ পোল্‌ — শ্লোক—
বন্‌কয় তোনিন্‌ তুণৈ। — ১২২২

মালৈনোয়্‌ চেয়্‌তল্‌ মণন্দার অকলাদ — শ্লোক—
কালৈ অরিন্দ (দু) ইলেন্‌। — ১২২৬

পদিমরুণ্ড পৈদল্‌ উড়কুম্‌ মদিমরুণ্ড — শ্লোক—
মালৈ পডবৃতরুম্‌ পোড়দু। — ১২২৯

পোরুল্‌ মালৈ ইয়ালরৈ উল্লি মরুল মালৈ — শ্লোক—
মায়ুম্‌এন্‌ মায়া উয়ির্‌। * — ১২৩০

ভাবানুবাদ :—

(১)

হে মেঘ, তুমি গম্ভীর গর্জনে আকাশ পথে চলেছ। তোমার গর্জনে হিমালয় পর্যন্ত কম্পিত হয়। অসহায় একাকিনী নারীর প্রতি তোমার কিছুমাত্র কৃপা নাই। তোমার এইরূপ ব্যবহার মোটেই মহৎ লোকের উপযুক্ত নয়।

আকাশ ব্যাপ্ত করে যখন মেঘ বিস্তার লাভ করে, তখন সেই বিরহিণী নারী নির্জন নৈরাশ্যে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—হায়! আমি এই বিরহ-ব্যথা কী করে সহ্য করি!

(২)

প্রথম গ্রীষ্মে কোকিল এসেছে তার বংশী-নিন্দিত কণ্ঠ নিয়ে। প্রিয় বলেছিল—এমন দিনে সে ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কোকিলের গান শুনবে। কিন্তু সে এলো না। তবে কি সেই দূর দেশে এমন ঋতু নেই যা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে তার প্রতিশ্রুতির কথা?

---

* উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি কোন একখানি গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিকভাবে গৃহীত নয়। বিভিন্ন গ্রন্থের একজাতীয় শ্লোকমালার কয়েকটি এখানে সুসজ্জিত-ভাবে প্রদত্ত হইল।

(৩)

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো ; সূর্যাস্তের পরে ধীরে ধীরে অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করছে। ইতস্ততঃ বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। নীম গাছে পেঁচা চীৎকার করছে। আচ্ছা সখি, তাল গাছ থেকে অণ্ড্রীল পাখীরও গান শুনতে হবে আমাকে ?…ঐ শোন, পাখীটা সাথীকে কাছে পেয়ে মনের আনন্দে ডাকছে, যেন আমারই দুঃখ বাড়াবার জন্যে। প্রিয় কি জানে না, আমি কী ব্যাকুলতা নিয়ে তার প্রতীক্ষা করছি ?

(৪)

হে চাঁদ, তুমি দুগ্ধ-শুভ্র জ্যোৎস্না সমগ্র ধরণীতে ছড়িয়ে দিচ্ছ ; তুমি উদার, তুমি মহৎ। তোমার কাছে তো পৃথিবীর কিছুই গোপন নেই। আচ্ছা, বলো তো, আমার প্রিয় বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে। সখি, চাঁদ জেনে শুনেও নীরব হয়ে আছে। স্বীয় মিথ্যাচারের স্বভাবের জন্যই চাঁদ দিনে দিনে ক্ষীণ ও মলিন হয়ে যায়।

(৫)

হে নিষ্ঠুর উত্তরে হাওয়া, আমি তো তোমার কোন অনিষ্টই করিনি। অনুগ্রহ করে তুমি এই অভাগিনীর দুঃখের মাত্রা আর বাড়িও না।

কুরাল থেকে উদ্ধৃত অংশের ভাবানুবাদ :—

হে সন্ধ্যা, কে তোমাকে সন্ধ্যা বলে ? তুমি তো বিরহী দম্পতীর জীবন-নাশক। হে সন্ধ্যা, তোমাকে এত মলিন দেখাচ্ছে কেন ? বলো না, তোমার প্রিয়তম কি আমার স্বামীর মতই নিষ্ঠুর ? হায়, যতদিন আমার প্রিয় কাছে ছিল, ততদিন সন্ধ্যার তীব্র দংশন উপলব্ধি করতে পারিনি। সন্ধ্যার আগমনে আমি তো ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে পড়েছি, যদি সে আরও অগ্রসর হয় (অর্থাৎ রাত্রি অধিক হয়) তবে আমার দেহে প্রাণ রাখা কষ্টকর। সন্ধ্যাকে দেখেই আমার মনে জাগে সেই ধনোপার্জনে উন্মত্ত আমার প্রবাসী স্বামীর মুখখানি।

তেলেগু সাহিত্যে বারমাস্যা

গ্রন্থ—'মনু চরিত্র'।

গ্রন্থকার—অল্লসম্ পেদ্দন
(Allasam Peddana)

নায়ক প্রবরাখ্যের বিরহে নায়িকা বরুথিনীর কাতরোক্তি। অন্যান্য সাহিত্যের বারমাস্যার মত মাস বা ঋতুক্রমিক বর্ণনার সূত্রটি অবিকল এক না হলেও অন্তর্নিহিত ভাব ও সুর অভিন্ন। ভাবানুবাদ সহ কিছু কিছু কাব্যাংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :—

তৃতীয় আশ্বাস

চম্পক মালা

ওকা পেনু বা পা-রেডু চালা মপ্পা রসাতল সীমকুম্, জকো
রকা মুলু ভূতধাত্রীকি, সুরল্ দিবিকিম্, বগাদী রুনাট্লুগা
মেকা মেকা পাটুতোড়া নিনু মৃঙ্গক পোরে পুড়ুম্ ত্রিলোককম্
টাকু ভাবু গানা নী য়ো ডালু ন জজু গা যে সি কুরঙ্গলাঙ্গুনা।

(৩৮ নং কবিতা)

[বিরহিণী নায়িকা বরুধিনী বিরহ জ্বালায় চন্দ্রকে তিরস্কার করে বলছে—'হে চন্দ্র, তোমার এই দুষ্ট ও নির্মম স্বভাবের জন্য ত্রিভুবনের সর্বত্রই তুমি উৎপীড়িত। মর্ত্যে চকোর পক্ষিসমূহ তোমার রশ্মি ভক্ষণ করে, স্বর্গে দেবগণের দ্বারা তুমি ভক্ষিত হও এবং পাতাল-লোকে তুমি রাহুগ্রস্ত]

উৎপল মালা

আক্কাটা! গন্ধবহ! তাগা বা হরি নাস্কুনি গূড়ি পান্থুলম্
বক্কাগা যে-য়া? বাওয়া কুনি পন্দন রিঞ্চি জগম্মু লেয়েরচুনীরি
য়ক্করগামী মা-না; বাদি য়ট্টিদা চুলকানি বৃত্তি দুর্জ্জনুম্
ডোক্কানি যোচ্চি ক্রিন্দু পড়ু নোঙ্গলকু গীডোন রিম্পাগল্গিনন্।

(৫০ নং কবিতা)।

[হে মন্দ মারুত, তুমি আমায় জর্জরিত ক'রবার মানসে চন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছ। যারা দুষ্ট-স্বভাব, তারা সর্বদাই একে অপরকে খোঁজে]

কন্দ পংভম্

নালু কলু রেণ্ডু নিন্হুম্, গ্রো-লনে কশ্নিঙ্কে ন লু-বা ঘো-ন্না হি কি না
ন্না লি গ্রহ মি পুড়ু দে গা দিনা, জলদ মৃদুপবন ! বিরহী জন দুরীতমূনন্ ।

(৫১ নং কবিতা)

[হে মলয় মারুত, যদি ভগবান্ ব্রহ্মা সর্পকে দ্বি-জিহ্ব করেছেন এবং সর্প পবন-পদ, তথাপি আমার পক্ষে এ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সর্প তোমাকে বিনষ্ট করেনি। এই জন্যই তুমি আমাকে বিরহ অবস্থায় এমন জর্জরিত করছো।]

লক্ষ্য করবার বিষয়, ক্রম অনুসারে মাস বা ঋতুর বর্ণনা এখানে না থাকলেও ঋতুপ্রভাবজনিত নায়িকার মনোবৃত্তি বা উক্তি অন্যান্য বারমাস্যার বিরহোক্তিরই সগোত্র।

Barhmasi (The Cycle of Months)

Folk—Culture Series
Snow Balls of Garhwal
Edited by D. N. Mazumdar

O sister, O' Ram Chait has come,
The flower-girls have busied themselves in the early
hours of morn,
Baisakh has come, consorts will particularly hear
Under wheat and barley-bundles, their waists are aching.
Jeth has come, it is suffocating,
In the absence of my lord, I take it death to be,
Asarh, the first month of rains has come,
I, a sinner, am dying worried, neither flesh nor blood
remains,
The second and real month of rains has come
Clouds and mists are hovering, it's heavily raining.
Bhado, has come, I consoled my heart,
Either O' my lord come home, or O' God its' for
death I yearn.

Asuj month has come, clouds have disappeared
Corn and songhum are ready, lemons thoroughly ripe,
Dewali of Kartik having come, sweets are being
prepared in every home
Whose hearts shall feel composed without husband
these days ?

O sister, O Ram ! Mangsir has come.
In the thought of my love, neither flesh nor blood
remains.

Cold of Push is bitter, body greatly shivers,
How lucky they are whose husbands give them company ?
Magh has come, cold has half way gone away,
Due to my husband's absence, my heart is broken,
Fagun has come, fields look full and green,
Like a solitary monkey, I, the sinner remain alone.

Man in India Vol. XXIII (1942) 233-37

Seasonal songs of Patna District

W. G. Archer

Asar

June is the month of parting, friend
The sky glowers with gloom.
Leaping and reeling the god rains
And my sweet budding breasts are wet
All my friends sleep with their husbands
But my own husband is a cloud in another land.
The whole night I sob
And cannot get still
The fish shine in the river
The sword shines in the hand
The husband dazzles on the bed
And at the thought I could fold myself round him
In the black clouds the lightning shimmers

How heavily it weighs
This parting from my husband
I care for nothing in his absence
I fold my hands and I pray
O God who made the world,
Listen to my prayer.

Sawan

July and the eager river leaps
The water streams
The paths vanish
Swamped are the fields and threshing floors
The insects murmur in the bushes
And I tremble at the sound
Happy is that woman's lot
Whose husband is at home
Wretched is my fate
Whose husband has gone away.
Absence with its flame
Tortures me each day
And my lotus heart is on fire
My husband tricked me
And ran to another land
He cares for me no more
And his heart is hard
How my breasts tingle
And burst at their slips !

Bhado

August and with my husband
I.am fast asleep on the bed
Of a sudden on my wrist he pounces
And tastes the savour of my lips
His syrup drips on the bed
Staining my petticoat

Torn are my silk slips
Broken my pearl necklace
Sprained my frail wrists
But I feel no pain
My Jhulani I lose and my jewelled nosepin.
And as he struggles with me
I sweat the whole night
All the fondling of my father's house
He has turned to dust
All my sixteen points
My husband has spoilt

Asin

September raised my hopes
I worshipped the sun night and day
But my husband never came from the strange land
I get on edge
I collect buds and adorn my bed
And make myself smart in all the sixteen ways
But my smartness is of no account
My hopes are shattered
Hard is the heart of my darling, O friend
He sends me not a word
With my husband far from me
I moan on my bed
When the papiha cries.
Absence burns me
When I fancy I hear my husband
My breast is split and I feel on fire
Oh the torment of a husband in another land
And the torment when I hear the shout of the bird

Kartik

October wakes the passions
And lack of love burns me the whole night
I get no rest
I sob hour after hour.

Morning comes weeping weeping
A mere seven years is my husband
And my own age is twentyfour
My husband is a little silly
Who does not know what to do
Lying on my bed at night
Sleep never comes to my eyes
Beyond all bearing is my lack of love
Madam is wearing me out
The naughty fellow and my naughty breasts
Burst at their ribbons
My body tingles
And despite myself my rapture comes.

Aghan

Pleasant is November, The fair lady
Sees the paddy all round
And writes to her lord
My husband left me
And went to another land
And he does not care for me any more
I was only twelve years old
When he had my marriage finished
And brought me here
Now in my full bloom
When I am like a pomegranate
My husband is a cloud in another land
Now when the lemons and oranges are ready
My husband forgets me
The garden is blossoming, O my heartless darling
And in it the bee hovers
Can not your heart see
That the garden withers for want of you*

---

*নিঃসন্দেহে এধারার বারমাস্যার প্রায় প্রত্যেকটিই সাহিত্য ধর্মে পরম সমৃদ্ধ।